মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয় ও এর উত্তরণের উপায়

(Current misfortune of the Muslim Ummah and ways to overcome)

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র জানুয়ারি-২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

শাহীনা আক্তার
এম. ফিল. গবেষক
রেজি. নং-৫৯/২০১১-২০১২
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয় ও এর উত্তরণের উপায়" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণাকর্ম। এম.ফিল.ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ গবেষণাপত্র বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

(শাহীনা আক্তার)
এম.ফিল.গবেষক
রেজি.নং-৫৯/২০১১-২০১২
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, শাহীনা আক্তার কর্তৃক উপস্থাপিত "মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয় ও এর উত্তরণের উপায়" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভটি কিংবা এর কোন অংশ অন্যের ডিগ্রী থেকে নেয়া হয়নি অথবা অন্য কোন প্রকাশনায় প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি। সুতরাং গবেষককে এম. ফিল. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

(ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীনের জন্য, যার অশেষ রহমতে মুসলিম উম্মাহ বিষয়ে আমার “মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয় ও এর উত্তরণের উপায়”শীর্ষক গবেষণা কর্মটি শেষ করতে পেরেছি। সালাত ও সালাম শেষ নবী মানবতার মুক্তির মহান দূত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর মহান সাহাবাগণ, তাবি’ঈনসহ মুসলিম উম্মাহর জন্য আত্ম নিবেদিত মহান ব্যক্তিগণের প্রতি, যাঁদের ত্যাগের বদৌলতে পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিমদের পদচারণা বিরাজ করছে। অতঃপর আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা শাখাওয়াত হোসাইন, মাতা রওশন আরা ও স্বামী আবদুল্লাহ শরীফের প্রতি যাদের দু’আ, উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতায় আমি এম. ফিল গবেষণা কর্মটি শেষ করি। আমি তাঁদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের মহান দরবারে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে বিভাগীয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন এর তত্ত্বাবধানে এম.ফিল. গবেষণায় যোগদান করি এবং আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের খাস রহমতে প্রথম পর্বের কোর্স সমাপ্ত করি। উক্ত কোর্সের দ্বিতীয় পর্বে অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রতিটি পর্যায়ে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় আন্তরিকতার সাথে আমাকে উপদেশ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছেন। তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রদান করে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা পুস্তকের প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নেয়ার পথ প্রশস্ত করেছেন। তিনি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পড়ে এর সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করছি। বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পরম স্নেহধন্য তুরস্কের আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সাইয়েদ রাশেদ হাছান চৌধুরীর প্রতি, যে আমাকে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ,অধ্যাপক ড. শামসুল আলম, বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আ.ন.ম রফিকুর রহমান মাদানী, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টারের সহকারী সম্পাদক শহীদুল ইসলামের প্রতি, যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছন। বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণের প্রতি সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আমার এম. ফিল. গবেষণায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই সন্তান আদিলা আফনান মাঈশা ও তাযকিয়া তাবাচ্ছুম লামিছার প্রতি। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ নাছের নাফিছের প্রতি।অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, আল-আরাফা ব্যাংক লাইব্রেরি, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সিটি ব্যাংক লাইব্রেরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা নিয়েছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গের বই থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি তাঁদের প্রতিও আমি অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

-গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশন

আ.	আলাইহিস্ সালাম
স.	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	রাদিয়াল্লাহু ‘আন্হু/‘আন্হুম/‘আন্হা/‘আন্হুমা/‘আন্হুন্না
রহ.	রাহ্মাতুল্লাহি ‘আলাইহি
ড.	ডক্টর
পৃ.	পৃষ্ঠা
হি.	হিজ্‌রী
বি. দ্র.	বিশেষ দ্রষ্টব্য
ঢা.বি.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ্রি.	খ্রিষ্টাব্দ
ইমাম বুখারী	আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন- নিশাপুরী
ইমাম তির্‌মিযী	আবূ ‘ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ‘ঈসা আত-তির্‌মিযী
ইব্ন কাছীর	আবূল ফিদা ‘ইমামুদ্দীন ইসমা‘ঈল ইব্ন কাছীর

Dhaka University Institutional Repository

ইব্ন জারীর	আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী
ই. ফা.বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

ভূমিকা		১
প্রথম অধ্যায়	**মুসলিম উম্মাহর পরিচয়**	৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	**মুসলিম উম্মাহর উত্থান**	১৩
২.১	**মুসলিম উত্থানপূর্ব ও সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি**	১৪
	খ্রিষ্ট ধর্ম	১৪
	রোম সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ	১৫
	সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অরাজকতা	১৫
	ইউরোপের উত্তর ও পশ্চিমের জাতিগোষ্ঠী	১৭
	ইয়াহুদী জাতিগোষ্ঠী	১৮
	ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান দ্বন্দ্ব	১৯
	ইরান ও সেখানকার ধ্বংসাত্মক আন্দোলনসমূহ	১৯

	ইরানের সম্রাটপূজা	২০
	বৌদ্ধ মতবাদ, এর পরিবর্তন ও বিকৃতি	২১
	মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী	২২
	ভারতবর্ষ : ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে	২২
	যৌন অরাজকতা	২৩
	শ্রেণীভেদ প্রথা	২৪
	ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা	২৫
	ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগের আরবদের অবস্থা	২৬
	জাহিলী যুগে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা	২৬
	মূর্তিপূজা	২৬
	দেবদেবীর পূজা	২৭
	কাবাগৃহে প্রতিমা	২৭
	নবীদের প্রতিকৃতি	২৭
	জাহিলী যুগে আরবদের সামাজিক অবস্থা	২৭
	নারীদের অবস্থা	২৮
	কন্যা সন্তানের জীবন্ত সমাধি	৩০
	দাসদাসীদের অবস্থা	৩১
	অভিশপ্ত সুদ প্রথা	৩১
	জাহিলী যুগের রাজনৈতিক অবস্থা	৩১
	নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র	৩১
	গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থা	৩২
	রাজনৈতিক অনৈক্য	৩২
	গোত্রে গোত্রে সংঘাত	৩২
	আরবদের অর্থনৈতিক অবস্থা	৩৩
	মক্কাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড	৩৪
	তায়েফকেন্দ্রিক ব্যবসা কেন্দ্র	৩৪
	ব্যবসা সম্পর্কিত নীতিমালা	৩৪
	যাযাবর বেদুঈন	৩৪
	বহির্বাণিজ্যে মদিনার অবস্থান	৩৪
	জাহিলী যুগে আরবদের সাংস্কৃতিক অবস্থা	৩৪
	গীতিকাব্য ও সাহিত্য চর্চা	৩৫
	কাব্যপ্রীতি	৩৫

Dhaka University Institutional Repository

	উকায মেলা	৩৫
	স্থাপত্যকলা	৩৫
	বিশ্বব্যাপী অন্ধকার	৩৫
২.২	**মুসলিম জাতির উত্থান**	৩৬
	রাসূলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাব	৩৬
	মানবতার সমস্যার সঠিক সমাধান	৩৮
	প্রথম দিককার মুসলিমগণ	৩৮
	সাহাবায়ে কিরাম (রা) এর ঈমানী প্রশিক্ষণ	৩৯
	মদীনাতুর রাসূলুল্লাহ (স.)	৪০
	সাহাবায়ে কিরামের (রা.) এর ঈমানী পূর্ণতা	৪১
	ইতিহাসের আশ্চর্যতম বিপ্লব ও এর কারণ	৪২
	ঈমান ও এর প্রভাব	৪২
	নতুন মানুষ নতুন উম্মাহ	৪৩
২.৩	**মুসলিম জাতির যোগ্যতাসমূহ**	৪৫
	আমানত ও দিয়ানত	৪৫
	সৃষ্টিকুল ও প্রদর্শনীর প্রতি নিস্পৃহতা ও নিঃশঙ্কচিত্ততা	৪৬
	নযিরবিহীন বীরত্ব ও জীবনের প্রতি নিস্পৃহতা	৪৭
	বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ	৪৮
	পরিবারভিত্তিক	৪৮
	অনুরাগ ও আত্মোৎসর্গ	৪৯
	আনুগত্য ও তাঁবেদারি	৫০
	সম্পদ আত্মসাৎ নিষিদ্ধ	৫১
	সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বসুলভ	৫১
	অপরাধমুক্ত	৫১
	ধর্মীয় স্বাধীনতা	৫২
	কর্মমুখী	৫২
	প্রেম ও ভালোবাসার সঠিক স্থান	৫৩
	উৎকোচ গ্রহণ থেকে দূরে থাকা	৫৪
	পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ	৫৪
	অভাবগ্রস্তদের সাথে সদাচরণ	৫৫
	আদল প্রতিষ্ঠা	৫৫
	ইহসান প্রতিষ্ঠা	৫৬

	সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ	৫৬
	অপচয়-অপব্যয় নিষিদ্ধ	৫৭
	সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করণ	৫৭
	সুদ বর্জন	৫৮
	আখলাকে হামিদাভিত্তিক	৫৮
	হালাল উপার্জন	৫৯
	পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ	৫৯
	আত্মীয়তা রক্ষা	৬০
২.৪	**মুসলিম জাতির নেতৃত্ব ও এর প্রভাব**	৬১
	মুসলিমগণের নেতাসূলভ বৈশিষ্ট্যাবলী	৬১
	অতীত মুসলিম নেতৃত্বের প্রভাব	৬৪
	সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর বৈশিষ্ট্য	৬৫
	ইসলামী শাসন ও সভ্যতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল	৬৬
তৃতীয় অধ্যায়	**বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম উম্মাহর অবদান**	৬৮
	বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুসলিমগণের অবদান	৬৮
	রসায়ন বিজ্ঞানে মুসলিমগণের অবদান	৬৮
	পদার্থ বিজ্ঞানে মুসলিমগণের অবদান	৭০
	চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলিমগণের অবদান	৭১
	জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলিমগণের অবদান	৭৩
	দর্শনে মুসলিমগণের অবদান	৭৪
	ইতিহাসে ও সমাজবিজ্ঞানে মুসলিমগণের অবদান	৭৫
	প্রত্নতত্ত্বে কুর'আনে কারীমের অবদান	৭৭
	ভূগোল শাস্ত্রে মুসলিমগণের অবদান	৭৯
	প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির উন্নয়নে মুসলিম	৮২
	শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমগণের অবদান	৮২
	প্রযুক্তির উন্নয়নে মুসলিমগণের অবদান	৮৫
	স্থাপত্য শিল্পে মুসলিমগণের অবদান	৮৬
	সংগীতে মুসলিমগণের অবদান	৮৮
	হস্তলিপিতে মুসলিমগণের অবদান	৮৯
	চিত্র শিল্পে মুসলিমগণের অবদান	৮৯
	শিল্পে মুসলিম স্পেন	৯০

	ভারতীয় সংস্কৃতি ও মুসলিম	৯১
চতুর্থ অধ্যায়	**মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের সূচনা**	৯২
৪.১	**পতন যুগের সূচনা**	৯২
	গ্যালিপ্পলি অভিযান	৯৪
	বাগদাদ এর পতন	৯৫
	জেরুজালেমের পতন	৯৫
	দামেস্কের পতন	৯৬
	ইস্তাম্বুলের পতন	৯৬
	মধ্যপ্রাচ্য এর ভাগ	৯৬
৪.২	**মুসলিম উম্মাহর পতনের কারণসমূহ**	৯৮
	জিহাদ ও ইজতিহাদের অভাব	৯৮
	উমাইয়া ও আব্বাসী খলিফা বৃন্দ	১০০
	রাজতন্ত্রের প্রভাব ও পরিণতি	১০০
	ধর্ম ও রাজনীতির বিভাজন	১০১
	রাষ্ট্র পরিচালকদের মধ্যে জাহিলিয়াতের প্রবণতা সৃষ্টি	১০১
	ইসলামের অপপ্রতিনিধিত্ব	১০২
	দার্শনিক জটিলতা নিয়ে মেতে থাকা	১০২
	শিরক ও বিদ'আত	১০৩
	দাওয়াত ও তাজদীদের অব্যাহত ধারা	১০৩
	ক্রুসেড ও জঙ্গি খান্দান	১০৪
	জাহিলিয়াতের জন্য প্রতিবন্ধকতা	১০৫
	তাতারী ফেতনা	১০৬
	মিসরীয় সেনাবাহিনীর মুকাবিলায় তাতারীদের পরাজয়	১০৭
	মুসলিম জাহানে তাতারী হামলার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া	১০৮
	নেতৃত্বের ময়দানে উসমানী তুর্কীদের আগমন	১০৮
	তুর্কীদের অধঃপতন	১১০
	তুর্কি জাতির স্থবিরতা ও পশ্চাৎপদতা	১১১
	মুসলিম বিশ্বের সাধারণ বুদ্ধিভিত্তিক ও জ্ঞানগত অধঃগতি	১১২
	ইউরোপের শিল্প বিপ্লব, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও মুসলিম বিশ্ব	১১৪
পঞ্চম	**মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয়**	১১৭

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়		
	বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি	১১৭
	মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা	১১৯
	পরিস্থিতির গুরুত্ব	১২২
	পাশ্চাত্যনেতৃত্ব ও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া	১২৩
	বিশ্বব্যাপী জাহিলিয়াত	১২৪
	মুসলিমগণ জাহিলিয়াতের মিত্র	১২৫
	দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতিবন্ধকতা	১২৬
	সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জ	১২৭
	অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ	১২৭
	বুদ্ধিভিত্তিক চ্যালেঞ্জ	১২৮
	সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ	১২৮
	সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদের চ্যালেঞ্জ	১২৮
	জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমা জগতের কর্তৃত্ব	১২৯
	প্রচার মিডিয়ার ওপর পশ্চিমা কর্তৃত্বের চ্যালেঞ্জ	১২৯
	অশ্লীল শিল্পকলার প্রসার	১২৯
	বিশ্বব্যাপী বাজার দখল ও পুঁজিবাদের আধিপত্য বিস্তার	১৩০
	শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা	১৩০
	চরমপন্থার সমস্যা	১৩০
	অপব্যাখ্যার সমস্যা	১৩১
	গণতন্ত্রের অভাব	১৩১
	নারীকে ভোগপণ্য হিসেবে উপস্থাপন ও নারীর ক্ষমতায়ন	১৩১
	অশ্লীল আকাশ সংস্কৃতির বিস্তার	১৩২
	প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ভাস্কর্য সংস্কৃতির বিস্তার	১৩২
	সৌন্দর্যের বাণিজ্যিক প্রদর্শনী	১৩২
	ফ্যাশন শো সংস্কৃতি	১৩৩
	বিজ্ঞাপন সংস্কৃতি	১৩৩
	পারিবারিক বন্ধন ছিন্নকরণ	১৩৩
	পশ্চিমা গণতন্ত্রের বিকাশ	১৩৩
	বিভিন্ন দিবস পালন	১৩৪
	জাতিসংস্থা ও বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার ভূমিকা	১৩৪

	মুসলিমগণের আত্মমূল্যায়ন	১৩৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	**মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের কারণ**	১৩৫
	বিশ্বব্যাপী ইসলামের জাগরণকে স্তব্ধ করে দেয়ার নানামুখী ষড়যন্ত্র ও মুসলিম বিশ্বের অজ্ঞতা	১৩৫
	বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া	১৩৭
	মুসলিম উম্মাহর যুবসমাজের মেধা ও শ্রমকে অকল্যাণে ব্যবহার করা	১৩৯
	নব্য সাম্রাজ্যবাদ	১৪০
	জেন্ডার ইস্যু	১৪৪
	গণতন্ত্রের অভাব	১৪৪
	কুর'আন এবং সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা	১৪৫
	চরমপন্থা বা উগ্রতা	১৪৬
	যুদ্ধ ও সংঘাতের মাধ্যমে অস্ত্র ব্যসায়ীদের অস্ত্রের বাজার সৃষ্টি করা ও মুসলিম বিশ্বের অপরিপক্কতা	১৪৬
	ছোটখাট বিষয় নিয়ে মেতে থাকা	১৪৮
	নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বাড়াবাড়ি	১৪৯
	ভ্রান্ত ধারণা	১৫০
	রূপকের উপর গুরুত্ব প্রদান	১৫০
	বিশেষজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন না হওয়া	১৫২
	ইতিহাস, বাস্তবতা ও আল্লাহর সুনান সম্পর্কে সচেতনতার অভাব	১৫২
	মুসলিম দেশসমূহ থেকে ইসলামের নির্বাসন	১৫৩
	ইসলামী দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা	১৫৪
	ধর্মীয় অনুভূতির অভাব	১৫৬
	আল্লাহ–অনুসন্ধানী মানসিকতার বিশ্বব্যাপী অভাব	১৫৭
	দুনিয়া কামনার রোগ	১৫৮
	নৈতিক অধঃপতন	১৬০
	হীনমন্যতা	১৬১
	গোঁড়ামি ও চরমপন্থা অনুসরণ	১৬২
	কুর'আন না বুঝা	১৬২
	দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানের অভাব	১৬৩

	শরীয়ত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা	১৬৩
	সুস্পষ্ট দলিল বর্জন করে দ্ব্যর্থবোধক দলিলের অনুসরণ	১৬৪
	প্রবৃত্তির অনুসরণ করা	১৬৪
	যথার্থ ইসলামি পরিবেশের অনুপস্থিতি	১৬৫
	ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা	১৬৫
	মুসলিমগণের বিশেষ করে মুসলিম রাজা-বাদশাহগণের বিলাসিতায় ডুবে থাকা	১৬৬
	জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ছেড়ে দেয়া	১৬৬
	অন্দর মহল নিয়ে আমোদ প্রমোদে ব্যাস্ত থাকা	১৬৭
সপ্তম অধ্যায়	**মুসলিম উম্মাহর বির্পযয় হতে উত্তরণের উপায়**	১৬৯
	শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ গঠন	১৬৯
	ঈমানই মুসলিম বিশ্বের শক্তি	১৭১
	মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা	১৭২
	চরমপন্থার প্রতিকার	১৭৪
	শ্রেণী বৈষম্য ও অপচয়ের মুকাবিলা	১৭৫
	ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন	১৭৬
	মুসলিম বিশ্বের পয়গাম	১৭৮
	প্রতিপক্ষের দিন শেষ হয়ে এসেছে	১৮০
	ইসলামের প্রতি হতে হবে নিষ্ঠাবান	১৮১
	জাতিগতভাবে সুবিধাবাদ ত্যাগ করতে হবে	১৮২
	অনৈসলামিক চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা	১৮৩
	ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ	১৮৪
	নবতর ঈমান	১৮৫
	অর্থপূর্ণ প্রস্তুতি	১৮৬
	চেতনা বোধের প্রশিক্ষণ	১৮৭
	মুসলিম জাতির ঐক্যকে আরো জোরদার	১৮৮
	স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তি পূজার অবকাশ নেই	১৮৯
	জিহাদ ও ইজতিহাদের ঝাণ্ডাকে সমুন্নতকরণ	১৯০
	জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তি ও সামরিক প্রস্তুতি	১৯০
	শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন	১৯২
	দাওয়াতি কার্যক্রমের প্রসার	১৯৪

	ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করা ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার	১৯৪
	স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন	১৯৫
	সমাজ ও রাষ্ট্রে ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠা	১৯৫
	ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা	১৯৬
	চরমপন্থীদের সাথে সংলাপ ও বাস্তবতার বিশ্লেষণ	১৯৬
	প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ	১৯৭
	নিজস্ব তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা ও বিশুদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের প্রচার ও প্রসার	১৯৮
	ও.আই.সি.কে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদান ও আধুনিক অস্ত্র তৈরীর সামর্থ্য অর্জন	১৯৯
	রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ও সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদ বিরোধী জনমত সৃষ্টি	১৯৯
	গোটা জীবনে ইসলামের অনুসরণ	২০০
	অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া	২০০
	ইসলামি চিন্তাবিদ, প্রশাসক ও নাগরিকদের মধ্যকার দূরত্ব প্রশমন	২০১
	পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধ্বংস ও বিলুপ্তি এবং স্বকীয় সংস্কৃতির বিকাশ	২০১
	মুসলিম উম্মাহর সংকট উত্তরণে আরো কিছু পদক্ষেপ	২০২
	মুসলিম তরুণদের প্রতি উপদেশ	২০৩
উপসংহার		২০৪
গ্রন্থপঞ্জী		২০৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই মহান আল্লাহ তাঁর মনোনীত জীবনব্যবস্থা ইসলামের পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূল (স.) ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এ অর্থে ইসলামী বিশ্বের বিকাশ সূচিত হয়েছিল মানব সভ্যতার আদিকাল থেকেই। বর্তমান পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভূখণ্ড জুড়ে ইসলামী বিশ্বের অবস্থান। পৃথিবীব্যাপী মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের ভৌগলিক অবস্থান, গোটা মানবজাতির এক পঞ্চমাংশেরও বেশি মুসলিমগণের রাজনৈতিক ঐক্য এবং সর্বোপরি মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের অর্থনৈতিক শক্তি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান মুসলিম বিশ্ব ইসলামবিরোধী শক্তির অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু উগ্রবাদী শক্তি একজোট হয়েছে। বেসামাল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাঁর সহযোগীরা ইসলামের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য জঙ্গীবাদ, ইসলাম ফোবিয়া ইত্যাদি মুখরোচক সিন্ডিকেটেড সংবাদ মিডিয়ার মাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুসলিম রাষ্ট্র গুলোকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করছে। বিশেষ করে বেশ কিছু দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর চালানো নির্মম নির্যাতন এবং সে ব্যাপারে তথাকথিত বিশ্ব বিবেকের নিশ্চুপ ও অনৈতিক ভূমিকায় প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে দুঃখ ও ক্ষোভের আগুন ধূমায়িত হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও শক্তি না থাকায় এর প্রতিরোধ বা প্রতিকারের উপায় তাঁরা খুঁজে পাচ্ছে না। অন্যদিকে মুসলিম শাসকগণও প্রায় সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হীন স্বার্থে এ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে টু'শব্দটি পর্যন্ত করছেন না। এমতাবস্থায় মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধভাবে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষের এ লড়াইয়ে বিজয় লাভ করতে হবে।

কোন মহান আদর্শের সফল বাস্তবায়ন, কোন জাতির পুনর্গঠন ও তাঁর সার্বিক সমৃদ্ধি অর্জনে যে পরিমাণ বৈষয়িক শক্তির প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসিক শক্তির। যে জাতির কাছে প্রয়োজনীয় সকল বৈষয়িক উপকরণ বিদ্যমান, কিন্তু আদর্শ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প, অটল সিদ্ধান্ত ও অপরাজেয় মনোবল নেই, সভ্যতার সংঘাত ও আদর্শিক সংগ্রামে কুপোকাতই তাদের ললাট লিখন। পক্ষান্তরে যে জাতির বৈষয়িক আসবাবের যথেষ্ট অভাব রয়েছে বটে, কিন্তু সাহস-মনোবলে কোনরূপ ঘাটতি নেই, কালের ইতিহাসে তারাই বিজয়ী, তারাই শ্রেষ্ঠ। প্রথম যুগের মুসলিমগণের কৃতিত্ব গাঁথা সোনালী ইতিহাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

শীর্ণ বদন, জীর্ণ বসন, উদরশূন্য মুসলিম পক্ষ। পর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র নেই। অথচ প্রতিপক্ষ সব ধরনের সমরাস্ত্রে সজ্জিত। সৈন্য সংখ্যায়ও মুসলিমগণের কয়েকগুণ। তথাপি বিজয়ের বরমাল্য মুসলিমগণের কণ্ঠলগ্ন হয়। যুদ্ধ জয়ের প্রয়োজনীয় উপকরণের মধ্যে ঈমান, তাওয়াক্কুল, দৃঢ় প্রত্যয় ও আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের অদম্য স্পৃহা ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও মুসলিমগণের দুরন্ত সাহস, আকাশ ছোঁয়া মনোবলের সামনে সকল বাতিল পরাশক্তি মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। ফলে কুফ্‌র-শির্‌কের নিশ্চিদ্র আঁধার চিরে উদিত হয় ইসলামের দীপ্ত সূর্য। বর্বরতা ও পাশবিকতার ধ্বংসস্তুপের উপর নির্মিত হয় মানবতার নতুন মিনার। কায়েম হয় আল্লাহর দ্বীন, মুক্ত হয় মানবতা, প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যায়-ইনসাফ, উঁচু হয় আল্লাহর কালেমা।

কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, মাত্র চৌদ্দটি শতকের ব্যবধানে অনুসারীদের গাফলতির কারণে ইসলামের আলো নিস্প্রভ হয়ে পড়েছে। এত কালের বিশ্বজয়ী মুসলিম জাতি ঈমান-আমলের দুর্বলতা, কর্ম বিমুখতা, জ্ঞানের স্বল্পতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের এক কলঙ্কময় ইতিহাস রচনা করে চলছে। তারা ভুলে গেছে নিজেদের সোনালী ইতিহাস, হারিয়ে ফেলেছে গৌরবময় ঐতিহ্য, খুইয়ে ফেলেছে আকাশ ছোঁয়া মনোবল, দৃঢ়চেতা মন ও সতেজ ঈমান। হতাশা ও আত্মবিস্মৃতি আজ পুরো জাতিকে অবশ করে দিয়েছে। এক সময়কার সিংহ-শার্দূলের এখন আকৃতিই অবশিষ্ট রয়েছে-প্রকৃতি নেই; দেহটাই আছে, আত্মা নেই। দুনিয়া জুড়ে ইসলামের বিজয় কেতন ওড়ানোর মহৎ উদ্যোগ তাদের নেই। নেই তাদের হৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কোন শুভ চিন্তা। অধিকন্তু বেশীরভাগ মুসলিমই ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা নিয়ে দারুন সন্দিহান ও চরম হতাশ। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তাঁরা যেন এ ধারণা বদ্ধমূল করে নিয়েছে যে, এ যুগ ফিৎনা-ফাসাদের যুগ, মুসলিমগণের পতনের যুগ, ইমাম মাহদি বা ঈসার (আ.) আগমনের পূর্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়। অথচ এ ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুত: বর্তমান মুসলিম উম্মাহর যে অবনতি ও অধঃপতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে মূলতঃ তা মুসলিম উম্মাহর ঈমানী দুর্বলতা, হীনমন্যতা, হতাশা, সংশয়, সন্দেহ তথা মানসিক বিপর্যয় থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। নচেৎ প্রথম যুগের মুসলিমগণের চেয়ে বর্তমানে বাহ্যিক শক্তি-উপকরণ বহু গুণে বেশী। মুসলিম উম্মাহর রয়েছে ৫৭টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, প্রায় ১৮০ কোটি জনগণ, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিশ্বের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ তেল সম্পদ, যার উপর নির্ভর করে আধুনিক বিশ্ব চরম উৎকর্ষতা লাভ করছে। তা সত্ত্বেও মুসলিমগণের এ চরম বিপর্যয়ের কী কারণ থাকতে পারে? উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির এতগুলো বাহ্যিক উপকরণের সাথে যদি মুসলিমগণ সহীহ ঈমান, বিশুদ্ধ আমল, পূর্ণ ইয়াক্বীন ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হয়; হতাশা, হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে, তাহলে অবশ্যই মুসলিমগণ পৃথিবীতে ইসলামের বিজয়ী ঝান্ডা উড্ডীন করতে সক্ষম হবে। কাজেই এ মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন হতাশা, হীনমন্যতা ও মানসিক বিপর্যয়ের কারণ ও লক্ষণ চিহ্নিত করে এমন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করা যার মাধ্যমে মুসলিমগণ মরণ ব্যাধি এ মানসিক বিপর্যয় উত্তরণ করে একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং সমগ্র দুনিয়ায় ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করার মাধ্যমে উভয় জাহানের কল্যাণ লাভ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য থিসিস বা গবেষণা কর্মটিতে বিস্তারিতভাবে **"মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয় ও এর উত্তরণের উপায়"** বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হবে। এ গবেষণা কর্মটি ৭ (সাত) টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

১ম অধায়ে মুসলিম উম্মাহর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। ভাষা, বর্ণ, জাতিসত্তা, গোত্র নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহ এক ও অভিন্ন আদর্শ, ধর্ম, আইন, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার ভিত্তিতে সুসমন্বিত, সংঘবদ্ধ জাতি। মহানবী (স.) তাঁর অনুসারীদের উম্মাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই নব উত্থিত সমাজের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

২য় অধ্যায়ে মুসলিমের উত্থানের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়টিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১ম ভাগে মুসলিম উত্থানপূর্ব ও সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়েছে। ২য় ভাগে মুসলিমদের উত্থানের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাব এবং দ্রুত বিস্তার মানবজাতির ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব, বিস্ময়কর ঘটনা যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে ইচ্ছাশক্তি এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে একটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীও কিভাবে সকল প্রকার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে দ্রুত উন্নতির উচ্চপর্যায়ে পৌঁছতে পারে। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে নবুয়ত লাভের পর রাসূলুল্লাহ (স.) ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন। বহু কষ্টের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (স.) শেষ পর্যন্ত মদীনাকে কেন্দ্র করে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন যেখানে আল্লাহর ধর্ম সম্পূর্ণরুপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৩য় ভাগে মুসলিমদের বিভিন্ন যোগ্যতাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। আমানতদারিতা থেকে শুরু করে সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক, আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা, সুদ বর্জন, হালাল উপার্জন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। ৪র্থ ভাগে মুসলিমদের নেতৃত্ব ও এর প্রভাব সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

৩য় অধ্যায়ে বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিমদের অবদান সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিমরা শুধু ধর্ম বিস্তার আর রাজ্য জয়ই করেনি-জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, বীজগণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, হস্তলিপি, চিত্র শিল্প, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে তারা আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। ইউরোপীয় রেনেসাঁর পূর্ব পর্যন্ত মুসলিমগণ বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে ছিল। কালক্রমে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা এবং অন্যান্য কারণে এই জ্ঞানচর্চার পশ্চাদপদতা শুরু হয়। মধ্যযুগে এক সময় মুসলিমগণ ব্যাপকভাবে দর্শনশাস্ত্রের চর্চা করেছিল। একাজ করতে গিয়ে অনেকেই বিজাতীয় দর্শনে প্রভাবিত হয়ে নিজের ধর্ম বিকৃত করেছে। মুসলিমগণের সমস্যা হচ্ছে, তারা তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কোনটা নিয়েই মাথা ঘামায় না। অথচ ইউরোপের খ্রিস্টানরা মুসলিমদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়ে মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের সূচনা আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম পূর্ণরুপে প্রতিষ্ঠিত ছিল মাত্র ৪০ বছর। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনের শেষ দশ বছর এবং প্রথম চার খলিফার আমলের ৩০ বছর। এর পর থেকেই বিপর্যয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এখন পর্যন্ত তা অব্যাহত। বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামের নামে যেসব বিষয়ের অনুসরণ করা হয় তা প্রকৃত ও পূর্ণ ইসলাম নয়। ইসলাম বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমদের সার্বিক অধঃপতন ঘটেছে। ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় দিক দিয়েই তারা এখন চরমভাবে অধঃপতিত। মুসলিমদের পতনের বহু কারণের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হচ্ছে- ধর্মবিদ্রোহ, ধর্ম বিকৃতি, খেলাফত উৎখাত, দলাদলি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবহেলা এবং ধর্ম পরিত্যাগ।

৫ম অধ্যায়ে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পশ্চিমাদের কূটচালে মুসলিমরা পর্যুদস্ত। আরবের পেটের ভিতর বিষফোঁড়া ইসরাইল ছড়ি ঘোরাচ্ছে। পাশাপাশি আদর্শিক দিক দিয়ে মুসিলমগণের মাঝে, উম্মাহর অবস্থান এবং ইসলাম সম্পর্কে অনেক অজ্ঞতা রয়েছে। পৃথিবীর সব মুসলিম দেশ ইসলামের বিধি-বিধান সমূহ বাদ দিয়ে খুশি মনে মানবরচিত বিধান ব্যবহার করে যাচ্ছে। বহু লোক জানেই না ইসলামে শাসন পদ্ধতি ও দন্ড-বিধি বলে দুটি জিনিস বিদ্যমান। পাশ্চাত্যের প্রধান দুটি শাসন পদ্ধতি গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ ইসলামী শাসন পদ্ধতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এ মর্মে কোন প্রমাণ নেই। আসল সমস্যা হচ্ছে, ইসলামী পদ্ধতি ব্যবহার করার যোগ্যতা মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে এবং এটি মুসলিম শাসকদের স্বার্থের অনুকূল নয়। একথাও সত্য নয় যে, পাশ্চাত্যের উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করলেই দ্রুত জাগতিক উন্নতি অর্জন করা যায়। যদি তাই হতো তবে সব মুসলিম দেশ এতদিনে উন্নত হয়ে যেতো। মুসলিমদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেন, ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা জিনিস যেমন প্রথমটি মৌলভীদের কাজ ও দ্বিতীয়টি রাজনীতিবিদদের, তারা চরম বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। বিকৃতির কারণেই অধিকাংশ মুসলিম বর্তমানে এ ধারণা পোষণ করেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের কারণসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামকে পৃথিবীতে আদর্শ ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এবং তাঁর সাহাবীগণ অবর্ণনীয় কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। পরবর্তীতে মুসলিমরা এসে কুর'আন এবং সুন্নাহ থেকে নিজেদেরকে দূরে ঠেলে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন শুরু হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভাজনের কারণ ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ। এখন পর্যন্ত এ জাতীয় ফেতনা অব্যাহত আছে। বিভিন্ন দেশের বহু জনপ্রিয় পীর, মুফতি, আলেম, শায়খুল হাদীস ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতা জাগতিক স্বার্থে নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন। যেসব অজুহাত ব্যবহার করে বিভিন্ন যুগে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিপর্যয়, বিভেদ, ধর্মবিদ্রোহ, ধর্মবিকৃতির ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মের সঠিক আকিদা থেকে বিচ্যুতি, শাসক শ্রেণীর স্বার্থে ধর্মীয় বিধানের অপব্যাখ্যা, অজ্ঞতার কারণে কুর'আনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা, শাসক শ্রেণী কর্তৃক ইসলাম বিরোধী বিধি-বিধান প্রবর্তন, জাল হাদিস তৈরি ও অনুসরণ, নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে জাগতিক স্বার্থ ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং ধর্মের অনুশাসন পরিত্যাগ ইত্যাদি।

৭ম অধ্যায়ে মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয় হতে উত্তরণের উপায় সমূহ আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমানে কায়েমী স্বার্থবাদী কাফেররা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বাধাদান প্রদান এবং মুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠনের সর্বাত্মক চেষ্টায় লিপ্ত। তারা মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন অজুহাতে বিভেদ বা সংঘাত উসকে দেয়ার চেষ্টা করছে। তাই এই যুগে ইসলামী ঐক্য অতীতের চেয়েও বেশী জরুরী হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে মুসলিমদেরকে গুণগতভাবে সমৃদ্ধশালী হতে হবে। হতে হবে ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ। পাশাপাশি একটি শক্তিশালী উম্মাহ গড়ে তুলতে অবশ্যই তাদেরকে শিক্ষা, অর্থনীতি এবং প্রতিরক্ষাকে গড়ে তুলতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর পরিচয়

মুসলিম উম্মাহ শব্দটি 'উম্মাহ মুসলিমাহ' শব্দ দ্বয়ের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি কুর'আন মাজীদে একটি অনন্য সাধারণ পরিভাষা। কুর'আনে উম্মাহ শব্দটি মোট ৬৫ বার এসেছে। একবচনে ৫২ বার এবং বহুবচনে ১৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। পশ্চিমা ভাষায় এর কোন প্রতিশব্দ নেই। গোষ্ঠী ও জাতি অর্থে কুর'আনে শব্দটি ব্যাপক ব্যাপ্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ মূলত জাতিসত্তা, বর্ণ, ইত্যাদি নির্বিশেষে ঈমানদারদের দল বা গোষ্ঠী কে বুঝানো হয়ে থাকে। এ বিষয়ে কুর'আনে বলা হয়েছে:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থাৎ, " হে পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াময়।"[১]

এ প্রসঙ্গে Encyclopedia Of Islam এ বলা হয়েছে, The word Ummah refers to "the people" in Arabic, more specifically to Muslim people with a common ideology and culture. "Ummah" is also said in the Quran by Allah referring to Muslims. It is more commonly used in Islamic countries. Muslim Ummah refers to the unity of Muslims all over the world. The Muslim Ummah is responsible for upholding the religion and therefore benefiting the Community regardless whether the community is Muslim or non-Muslim. Apart from its strict religious connotation, the word "Ummah" (أمة) is used in Arabic in the general sense of "Community", as in الأمم والشعوب ("community of peoples"). The Arabic term for the United Nations in Arabic is الأمم المتحدة ("The United Ummahs"). In its Islamic sense of the community of Muslims, the word is usually preceded in Arabic by the definite

১. আল-কুর'আন, ০২ : ১২৮

article. الأمة ("The Ummah"). অর্থ্যাৎ, "উম্মাহ (আরবি: أمة) একটি আরবি শব্দ ও ইসলামি পরিভাষা যা দ্বারা মুসলিম জাতি বা সম্প্রদায় বোঝানো হয়। তবে এর সাথে নৃতাত্ত্বিক বা ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ণীত জাতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ দ্বারা অনুরূপ বহুসংখ্যক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সামগ্রিক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। ইসলাম অনুযায়ী যেকোনো নৃতাত্ত্বিক, ভৌগলিক বা ভাষাভাষীর মুসলিম ব্যক্তি উম্মাহর সদস্য হিসেবে গণ্য হয়।"[২]

ভাষা, বর্ণ, জাতিসত্তা, গোত্র নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহ এক ও অভিন্ন আদর্শ, ধর্ম, আইন, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার ভিত্তিতে সুসমন্বিত, সংঘবদ্ধ জাতি। মহানবী (স.) তাঁর অনুসারীদের উম্মাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এ নব উত্থিত সমাজের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ড. ইব্রাহিম মাদকুরি বলেন,

و جماعة من الناس اكثرهم من اصل واحد - و تجمعهم صفات موروثة - و مصالح و اماني واحدة - اويجمعهم امر واحد من دين او مكان او زم

আর মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ গোষ্ঠীর লোকজন একই সুত্রে গাঁথা। তাঁদের সম্মিলিত হওয়ার গুণাগুণ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এবং তাঁদের স্বার্থ, রুচি ও চাহিদা সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। আর তাঁরা সম্মিলিত হয়ে কাজ করতে পারে যেকোন দ্বীন, সময় অথবা স্থানের ভিত্তিতে।"[৩]

ড. হামিদুল্লাহর মতে, "উম্মাহ ধারণাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে মদীনার লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদে' শব্দটি উল্লেখের মাধ্যমে। উম্মাহ সে দলকে বলা হয়, যারা একটি সর্বসম্মত বিষয়ে বা উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। যেসব লোকের মধ্যে কোন অভিন্ন মৌলিক বিষয় থাকে, তাদেরকে উক্ত মৌলিক বিষয়ের বিচারেই 'উম্মাহ' বলা হয়। মুসলিমগণকে যে অভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ভিত্তিতে উম্মাহ বলা হয়েছে তা বংশ, ভৌগলিক বাসভূমি বা

২. Reuven Firestone Jihad, *The Origin of Holy War in Islam* (New York: Oxford University Press, 1999), p. 118

৩. ড. ইব্রাহিম মাদকুরি, *আল মুজামুল ওয়াসীত* (ঢাকা: আল মাকতাবা আল ইসলামিয়া, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৩), পৃ. ২৭

অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে নয় বরং তা হচ্ছে তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ও তাঁদের দলের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে।"[৪]

যেদিন থেকে মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বমানবকে এক আল্লাহকে নিজেদের প্রভু এবং অন্যান্য প্রচলিত মানুষ আবিষ্কৃত সব প্রভুত্বকে বাতিল বলে মেনে নেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের মুসলিমগণ নিজদের যেমন একজাতি, বিশ্বাসী জাতি বলে মনে করে যাচ্ছেন তেমনি অমুসলিমগণও মুসলিম জাতিকে একজাতি বলে জ্ঞান করে আসছে, যেমন, যেখানেই আরব, তুর্কি তাতার, মোগল,আফগান জাতীর কেউ ইসলাম প্রচার করতে এসেছেন বা রাজ্য জয় করতে এসেছিল বা ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসেছিল সেখানেই তাদেরকে স্থানীয়রা তাদের আঞ্চলিক পরিচয়ে কেউ পরিচিত করে নাই বা সে ইসলাম প্রচারকারী, রাজ্য জয়কারী বা ব্যবসায়ীকে তাঁর মাতৃভাষা দিয়ে পরিচয় করে নাই, ভাষা এবং অঞ্চল যা হোকনা কেন। শুধুমাত্র মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত করা হয়েছে।

অভিধানগত ভাবে উম্মাহ শব্দটি দ্বারা কি বুঝায়। উম্মাহ শব্দটির মূল বলে প্রাচীন আরবি একাধিক শব্দের কথা জানা যায়, যেমন- আম্মা, ইমামা, উমুমা এবং উম্ম।

আম্মা শব্দ দ্বারা- যাওয়া, গ্রহণকরা, অবলম্বন করা, সংশোধন করা, দেখতে যাওয়া ইত্যাদি বুঝায়।

ইমামা শব্দটি দ্বারা- পথ দেখিয়ে দেওয়া, নেতৃত্ব করা,

উমুমা শব্দটি দ্বারা- মা হওয়া, রাষ্ট্র,

উম্ম শব্দটি দ্বারা মা, উৎস, মূল, ভিত্তি সারকথা ইত্যাদি বুঝায়।

সে সব শব্দ থেকে উম্মাহ আর উম্মাহ যে জাতি হিসাবে বুঝায় তাঁর প্রমাণ আজকের পৃথিবীর জাতিসংঘ তথা ইউনাইটেড নেশনকে আরবিতে আল উমাম আল মুত্তাহিদাহা বা সংযুক্ত জাতি বলা হয়ে থাকে। এই শব্দটিকে বিশ্বের সকল আরবি ভাষীরা এ ভাবেই ব্যবহার করে আসছেন। গত দুশো বছর যাবত যে ভাবে ভৌগলিক বা ভাষা বা রাষ্ট্র ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ চালু হয়েছে ইসলামী জাতীয়তাবাদ তত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নয়। সাধারণভাবে একই ভাষাভাষী, সংস্কৃতি, ইতিহাস, বর্ণ, জীবনাচরণ বিশিষ্ট লোক সমষ্টিকে জাতি হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ইসলাম যে উম্মাহ বা জাতির কথা উল্লেখ করেছে, তা নির্দিষ্ট কোন ভাষা, বর্ণ, গোত্র, এমনকি কোন সীমানার বন্ধনে আবদ্ধ নয়। বরং সমগ্র পৃথিবীর যে

৪. ড. মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ, *The First Written Constitution in the world* (লাহোরঃ আশরাফ পাবলিকেশন্স, ১৯৭৫), পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

কোন স্থানে বসবাসকারী তাওহীদে বিশ্বাসী পবিত্র কুর'আনের অনুসারী, ইসলামের পতাকা তলে সমবেত জাতিই মুসলিম জাতি বা মুসলিম উম্মাহ। পবিত্র কুরআনে উম্মাহ ওয়াহিদা বলতে আল্লাহ তা'আলা এই মুসলিম উম্মাহকেই বুঝিয়েছেন।[৫] পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

অর্থাৎ, "তোমাদের এ উম্মত আসলে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। কাজেই তোমরা আমার ইবাদত করো"।[৬] পৃথিবী জুড়ে প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের মাঝে ২০০ কোটি মুসলিম। বর্তমানে তারা বিভিন্ন দেশ-জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তাদের জীবনাচরণও ভিন্ন ভিন্ন। অথচ ইসলামের বিধান অনুযায়ী দুনিয়ার সব মুসলিম এক জাতি বা উম্মাতুন ওয়াহিদা। বিশ্বব্যাপী আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের জন্যেই মুসলিম উম্মাহর উদ্ভব। এই মুসলিম উম্মাহ বিশ্বের যে অঞ্চলে বাস করেন না কেন, তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পরবর্তী সব কার্যক্রম আল কুর'আন এবং রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ অনুসারে প্রতিপালন করা হয়। এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে কোন শ্রেণী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিয়ে সাদির বন্ধনে আবদ্ধ হতেও কোন মানা নেই। অথচ এক ভাষা ভাষী এক রাষ্ট্রে বসবাস করলেও মুসলিম উম্মাহ অন্য ধর্মীদেরকে বিয়ে করতে পারে না। এই উম্মাহর লক্ষ্য যেমন বড়, তেমনি এর আদর্শ, অবস্থান ও কর্মনীতিও সকল দূর্বলতা, নেতিবাচকতা, সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে। ভাষার পার্থক্য তাদেরকে বিভক্ত করে না। অবস্থানের দূরত্ব তাদের ভালোবাসার কাছে পরাস্ত হয়। বর্ণের বৈচিত্র বা গঠনের তারতম্য তাদের ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বে কোনও খাদ তৈরি করতে পারে না।

ড. আব্দুল রশিদ মতিনের মতে, Ummah is a universal order enclosing the entire collectivity of Muslims inhabiting the globe, united by the bond of one strong and comprehensive ideology of Islam. It is indispensible for the actualization of the divine will in space time and for the achievement of happiness in this world and salvation in the hereafter.

অর্থাৎ, "উম্মাহ হচ্ছে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যত মুসলিম বাস করে তাদের সমন্বয়ে এবং ইসলামী দর্শন ও চেতনার ঐক্যবন্ধনে গঠিত একটি সামগ্রিক ধারণা। স্থানকালের পরিসীমা অতিক্রম

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
৬. আল-কুর'আন, ২১ : ৯২

Dhaka University Institutional Repository

করে ঐশী ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য এ ধরনের সামগ্রিক মানবগোষ্ঠী হচ্ছে উম্মাহ, যার লক্ষ্য ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি।"[৭]

উম্মাহর কতকগুলো বৈশিষ্ট রয়েছে। যেমন

১. মুসলিম উম্মাহর ধারণা উম্মাহর প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে।

২.শরীয়াহকে বৈধতার চূড়ান্ত উৎস বলে মনে করে।

৩. আল্লাহ তা'আলার একত্ব ও সার্বভৌমত্বের ধারণা তাওহীদের ভিত্তিতে গঠিত।

৪. সকল কৃত্রিম ভূখণ্ডগত সীমান্ত বিলুপ্ত করে।

৫. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে।

৬. সমস্ত বিশ্ব মুসলিমকে একই উম্মাহে পরিণত করে।[৮]

মোদ্দাকথা, তাওহীদের ভিত্তিতে সংস্থাপিত মুসলিম উম্মাহ সার্বজনীন, সর্বব্যাপ্ত ও সুসংগঠিতভাবে সমন্বিত। মুসলিম উম্মাহর পরিচয়ে কুর'আনের দুটি আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। একটি হলো:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ

অর্থাৎ, "দুনিয়ার সর্বোত্তম জাতি তোমরা। মানুষের হেদায়াত ও কল্যাণ বিধানের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা উত্তম কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলবে। আহলে কিতাব ঈমান আনলে তা তাদের পক্ষেই কল্যাণকর হত, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদার ও পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই সীমালঙ্গনকারী।"[৯]

এ আয়াতে প্রথমত মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে, তাদের তৈরি করা হয়েছে গোটা বিশ্ব-মানব সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন করা, বিশ্ববাসীকে সৎপথে পরিচালিত করা, অসৎপথে বাধা দেয়া এবং সর্বোপুরী আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য। মূলত আল্লাহর প্রতি ঈমানের অনিবার্য

৭. আবদুল রশিদ মতিন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৫), পৃ. ৪৫

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

৯. আল-কুর'আন, ৩ : ১১০

Dhaka University Institutional Repository

দাবি হলো– মুমিন ব্যক্তি বিশ্বের সকল মানুষকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে। কাউকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবে না, কাউকে গোলাম ও বানাবে না। আল্লাহর প্রতি ঈমান বা তাওহীদ বিশ্বাসের অনিবার্য দাবি হলো– মানুষ এক আল্লাহ ছাড়া কারো সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব মানবে না। এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব মেনে নেয়ার পর সব মানুষ পরস্পরের ভাই। কেউ কারো প্রভু নয়, কেউ কারো গোলাম ও নয়। আল্লাহর প্রতি এ বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়ার পর এ বিশ্বাসে যারা বলিয়ান হয় তাদেরকে স্রষ্টার ইবাদতের পাশাপাশি সৃষ্টির খেদমত করতে হবে। এটাই ঈমানের অনিবার্য দাবি। এ জন্যই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে রাসূলের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে তাদেরকে মানবতা-মনুষ্যত্বের পতাকাবাহী হিসেবে জাতী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত থাকতে বলা হয়েছে। মানুষের কল্যাণের পথ আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সকল হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দানের সংকল্পের অধিকারী হওয়াই মুসলিম উম্মাহর এ পরিচয়ের অনিবার্য দাবি। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় আয়াতটি হলো:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً

অর্থাৎ, "এভাবে তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী জাতিতে পরিণত করা হয়েছে, যাতে করে তোমরা সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা হতে পারো, আর তোমাদের জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা আল্লাহর রাসূল।"[১০]

পশ্চিমা গোষ্ঠী আধুনিক বিশ্বে মধ্যমপন্থী বা মডারেট শব্দটি বেশি বেশী ব্যবহার করে আসছে। এর আড়ালে-আবডালে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আর মুসলিম জাতিকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার অপকৌশল চালাচ্ছে। অথচ, ইসলামই একমাত্র আদর্শ যার সাথে চরমপন্থার কোন সম্পর্ক বা সংশ্রব নেই। জাতি হিসেবে মুসলিমগণ সর্বযুগেই কমবেশি শান্তি নিরাপত্তার প্রতীক এবং মানবতা-মনুষ্যত্বের ধারক বাহক হিসেবে ভূমিকা রেখে আসছে। সত্যিকার অর্থে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে কোন প্রকারের উগ্রবাদ বা চরমপন্থার অভিযোগ আনার সুযোগ নেই। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘঠিত যেসব ঘটনাকে পুজি করে মহল বিশেষ ইসলাম ও মুসলিমগণের ব্যাপারে উপরিউক্ত অভিযোগের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে তা ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকভাবে চলে আসা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রেরই অংশ।

দ্বিতীয় আয়াতটিতে মুসলিম উম্মাহর যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তাঁর অনিবার্য দাবি হলো মুসলিম উম্মাহকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্যে সার্বিকভাবে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হতে হবে।

---

১০. আল-কুর'আন, ২ : ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সার্বিকভাবে মানুষের সমাজে শান্তি, কল্যাণ, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে তাদের সক্ষম হতে হবে। বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত মিশন। এটা শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মুসলিমগণ সাম্প্রদায়িক নয়, তারা শুধু নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি- কল্যাণ ও ইনসাফ নিশ্চিত করাই তাদের পবিত্র দায়িত্ব। বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর মধ্যে এ আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে, আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তির প্রচার, প্রসারের পথে ইসলামী আদর্শ কোন প্রতিবন্ধকতা নয়ই বরং সহায়ক-এটাও বাস্তব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর উত্থান

আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আর ইসলামের অনুসারীদের বলা হয় মুসলিম। মানুষের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। এর উদ্ভাবক, প্রবর্তক ও প্রণয়নকারী কোন মানুষ নয়। আল্লাহ একে একমাত্র এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় একে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আঞ্জাম দিয়েছেন। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এ কারণে যে, মানুষের জীবনের সম্ভাব্য সকল সমস্যার সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত সমাধান আছে ইসলামে। মানুষের এমন কোনো সমস্যা নেই, জীবনের এমন কোন বিভাগ নেই, যে সম্পর্কে ইসলাম তাঁর কল্যাণময় বিধান প্রবর্তন করেনি। আর ইসলাম নিছক কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতও নয় যা আদায় করলে আর কিছু করার থাকে না। বরং ইসলাম হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গীণ জীবনব্যবস্থা। হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রচারিত ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থাকে ইসলাম আখ্যা দেয়া হলেও আল্লাহ প্রেরিত সকল ধর্মই ইসলাম ধর্ম। পৃথিবীর সকল নবী-রাসূল যে জীবনব্যবস্থা বা ধর্ম প্রচার করেছেন তাঁর প্রতিটিরই অভিন্ন নাম হলো ইসলাম। ঈমানের একটি উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য এই যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পূর্ববর্তী সকল নবী- রাসূলের প্রতি দ্বিধাহীন বিশ্বাস ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধ প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানের অনিবার্য অঙ্গ। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে মহানবী (স.) পর্যন্ত নবী রাসুলগণের মধ্য থেকে কোনো একজনকে অবিশ্বাস করে বা কারো প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করে মুসলিম হওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে কুর'আন মাজীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা বিষয়টিকে প্রামাণ্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন-

شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

অর্থাৎ, "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছো তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে

ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন।"[১১]

২.১ মুসলিম উত্থানপূর্ব ও সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দি ছিল মানব ইতিহাসের সর্বাধিক অন্ধকারময় ও অধঃপতিত যুগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানবতা যেভাবে অধঃপতন ও অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল এ সময় সে তাঁর চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। পয়গাম্বরদের দাওয়াতের আওয়াজ বহুকাল চাপা পড়ে গিয়েছিল। দ্বীনদার লোকেরা দীনের আমানত নিজেদের বুকের ভেতর আগলে রেখে জীবন ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মঠ, গির্জা ও প্রান্তরের এক কোনে ঠাঁই নিয়েছিল এবং জীবন সংগ্রাম, এর দাবি ও রাজনীতি এবং আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে বসেছিল। মুসলিম জাতির উত্থানের ইতিহাস আলোচনার পূর্বে মুসলিমগণের উত্থানের পূর্বে ও সমসাময়িক বিশ্বে কি পরিবেশ বিরাজমান ছিল সে বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

২.১.১ খ্রিষ্ট ধর্ম

খ্রিষ্ট ৪র্থ শতাব্দীতেই খ্রিষ্ট ধর্ম একটি জগাখিচূড়ীতে পরিণত হয় যার ভিতর গ্রীক পৌরণিক কাহিনী, রোমান পৌত্তলিকতা, মিসরীয় নব্য-প্লেটোবাদ ও বৈরাগ্যবাদ যোগ হয়ে ছিল। হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) এর সহজ সরল শিক্ষামালার উপাদান এই জগাখিচূড়ির ভেতর এইভাবে হারিয়ে গিয়েছিল যেভাবে বারিবিন্দু বিশাল সমুদ্র বক্ষে পতিত হয়ে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে বসে। শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্ট ধর্ম কতিপয় নিষ্প্রাণ প্রথা ও নিরানন্দ আকীদা-বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যায় যা না পারত আত্মার মাঝে উত্তাপ সঞ্চার করতে আর না পারত জ্ঞান-বুদ্ধির কারণ হতে। আবেগ-উদ্দীপনাকে তা সচল ও সক্রিয় করে তুলতে পারত না। তার মধ্যে এ যোগ্যতা ও ছিল না, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সঙ্কটে মানব কাফেলা নেতৃত্ব দিবে। এর উপর ধর্মের বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছিল এর অতিরিক্ত যার পরিণতি হলো এই, খ্রিষ্ট ধর্ম জ্ঞান-গবেষণা ও চিন্তা-চেতনার দ্বার উন্মুক্ত করার পরিবর্তে সে নিজেই এ পথে বাধার বিন্ধ্যাচল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং শতাব্দীর অব্যাহত অধঃপতনের দরুন কেবলই পৌত্তলিকতার ধর্মে পরিণত হলো।

ইংরেজী ভাষায় কুর'আন কারীমের অন্যতম বিখ্যাত অনুবাদক জর্জ সেল (Sale) খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে বলেন, The worship of saints and images, in particular, was then arrived at such a scandalous pitch that it even

১১. আল-কুর'আন, ৪২ : ১৩

surpassed whatever is no practiced among the Romanists. অর্থাৎ, "খ্রিষ্টানরা সাধু-সন্ত ও হযরত ঈসা মাসীহ (আ) এর মূর্তির পূজার ক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়ি করেছিল যে, এ যুগের রোমান ক্যাথলিকরাও সেই সীমায় পৌছতে পারেনি।"[১২]

২.১.২ রোম সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ

স্বয়ং ধর্ম নিয়েই কালাম শাস্ত্রীয় বাহাছ তথা তর্ক-বিতর্কের ঝড় শুরু হয়ে যায় এবং নিষ্ফল মতানৈক্য ও বৈষম্যের হাঙ্গামা খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে জড়িয়ে ফেলে। এই দ্বন্দ্বে তাদের মেধা ও প্রতিভার অপচয় ঘটে এবং তাদের কর্মশক্তি স্থবির হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ঘরোয়া বিবাদই বিরাট আকারের রক্তাক্ত সংঘর্ষের রূপ নেয়। শিক্ষাঙ্গন, গির্জা ও মানুষের বাড়ি ঘর প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হয় এবং গোটা দেশই হয়ে পড়ে গৃহযুদ্ধের শিকার। তাদের বিতর্কের বিষয় ছিল এই যে, হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) এর ফিতরাত তথা প্রকৃতি কি এবং এর মধ্যে খোদায়ী ও মানবীয় অংশের আনুপাতিক হার কত? রোম ও সিরিয়ার মালকানী (Malkite) খ্রিষ্টানদের আকিদা ছিল এই, হযরত মাসীহ (আ.) এর প্রকৃতি হলো মিশ্রিত। তন্মধ্যে একটি অংশ হলো খোদায়ী এবং আরেকটি অংশ হলো মানবীয়।

কিন্তু মিসরের মনোফিসীয় (Monophysites) খ্রিষ্টানদের জিদ ছিল, মাসীহ (আ.)-র প্রকৃতি নির্ভেজাল খোদায়ী। এর মধ্যে তাঁর মানবীয় প্রকৃতি এমনভাবে বিলীন হয়ে গেছে যেভাবে সির্কার একটি ফোটা সমুদ্রে পতিত হয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। প্রথমোক্ত মত ছিল সরকারী মত। বায়যান্টাইন সম্রাটরা ও শাসক মহল একে ব্যাপকতর করতে এবং গোটা সাম্রাজ্যের একমাত্র ধর্মে পরিণত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং এ মতের বিরোধীদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দেয় যা ভাবতে গেলেও লোম খাড়া হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মতানৈক্য ও ধর্মীয় সংঘাত-সংঘর্ষ বেড়েই চলে। উভয় দল একে অপরকে এমন ধর্ম বহির্ভূত ও বেদ্বীন মনে করত, দেখে মনে হতো, এরা বুঝি বা পরস্পর বিরোধী দুই স্বতন্ত্র ধর্মের অনুসারী।[১৩]

২.১.৩ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অরাজকতা

রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা চুড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। রাজ্যের প্রজা সাধারণগণ অসংখ্য বিপদের শিকার হওয়া সত্ত্বেও গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত তাদের উপর দ্বিগুণ-চতুর্গুণ ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ফলে রাষ্ট্রের অধিবাসীরা ছিল

---

১২. Abdul Hameed Siddiqu, *The Life of Muhammad: Arabia Before Islam* (Sale's Translation: 1896), p. 62

১৩. Alfred J. Butler, *Arabs' conquest of Egypt and last thirty years of the Roman Dominion* (Egypt: E World Inc, 1992), p. 29-30

সরকারের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট ও এ ধরনের সীমাহীন যুলুম-নিপীড়নের দরুন তারা স্বদেশী শাসনের মুকাবিলায় বিদেশী শাসনকেই অগ্রাধিকার দিত। ইজারাদারী (Monopolies) ও জোর-যবরদস্তিপূর্বক ধন-সম্পদ ছিনতাই ছিল যেন বোঝার উপর শাকের আটি। এ সমস্ত কারণে বিরাট আকারে বিক্ষোভ ও হৈ-হাঙ্গামা দেখা দেয়। ৫৩২ খ্রিষ্টাব্দের হাঙ্গামায় একমাত্র রাজধানীতেই ত্রিশ হাজার মানুষের জীবনাবসান ঘটে।[১৪]

তখনকার সময় ও সুযোগের দাবি ছিল ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ। কিন্তু লোকে অপচয়-অপব্যয়ে এমনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, কোনক্রমেই তা থেকে বিরত হতে রাজি হচ্ছিল না। তারা নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত ধাপে উপনীত হয়েছিল। সবার মধ্যে কেবল একটা ধান্ধাই বিরাজ করছিল এবং সকলকে একই ভূতে পেয়ে বসেছিল যেনতেন প্রকারে সম্পদ আহরণ করতে হবে এবং সেই সম্পদ নিত্যনতুন ফ্যাশন, আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাস এবং আপন প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার পিছনে ব্যয় করতে হবে। মানবতা, ভদ্রতা ও সৌজন্যের ভিত্তি স্থান থেকে সরে গিয়েছিল। সভ্যতা ও নৈতিকতা বিদায় নিয়েছিল। পরিস্থিতি এত দূর গড়িয়েছিল যে, লোকে পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনের উপর চিরকুমার জীবনকে প্রাধান্য দিত যাতে সে স্বাধীন ও বল্গাহীন জীবন যাপনের সুযোগ পায়।[১৫]

ন্যায় ও সুবিচারের অবস্থা ছিল এই, সেল-এর ভাষায়, যেভাবে বিবিধ দ্রব্য ও বস্তুসামগ্রী বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে এবং সে সবের মূল্য নির্ণীত ও নির্ধারিত হয় ঠিক সেভাবেই অন্যায় ও আত্মসাতকে স্বয়ং জাতির পক্ষ থেকে উৎসাহিত করা হতো।[১৬] ঐতিহাসিক গীবন বলেন, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের অবনতি ও অধঃপতন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়ে ছিল। এর উদাহরণ হলো শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত ও পত্রপুষ্পে সজ্জিত সেই ফলবান বৃক্ষ যার ছায়াতলে পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠী এককালে আশ্রয় নিত। আর এখন সেই বৃক্ষের কেবল কাণ্ডটাই দাঁড়িয়ে আছে এবং শুকোতে শুকোতে শেষ দশায় এসে পৌছেছে।[১৭]

---

১৪. Justin Bieber, *Britannica Online for Kids* (http: kids.britannica.com/eb/art-151049, 6 Aug, 2016), p. 122

১৫. Edward Gibbon, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire* (W. Strahan and T, 3rd edition, Cadel. 1776) , p. 327

১৬. The Life of Muhammad, *Arabia Before Islam (Sale's Translation),* Ibid, p. 62

১৭. *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. Ibid, p. 327

Historian's History of the world-এর লেখক বলেন, That it (Byzantine Empire) had nevertheless suffered very severely in the general decline caused by over taxation, and by reduced commerce, neglected agriculture and diminished population. is attested by the magnificent rules of cities which had already fallen to decay, and which never regained their ancient prosperity.

অর্থাৎ, "বড় বড় শহরে দ্রুততার সাথে ধ্বংস ও অধঃপতন নেমে এল। এরপর যেসব শহর সেই ধ্বংসের ধাক্কা আর সামলাতে পারেনি, তাদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। সেগুলো সাক্ষ্য দেয়, বাইজান্টাইন হুকুমত সে সময় চরম অধঃপতিত অবস্থায় ছিল আর এই অধঃপতন অতিরিক্ত করের চাপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা, কৃষিক্ষেত্রে স্থবিরতা ও উদাসিনতা এবং শহরগুলোতে জনসংখ্যার ক্রমিক হ্রাসের ফলেই ঘটেছিল।"[১৮]

২.১.৪ ইউরোপের উত্তর ও পশ্চিমের জাতিগোষ্ঠী

সব পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠী যারা উত্তর ও পশ্চিমে বসবাস করত তারা ছিল অজ্ঞতা ও মূর্খতার শিকার, ছিল রক্তাক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মারামারি-হানাহানিতে ক্ষতবিক্ষত। তারা যুদ্ধবিগ্রহ ও অজ্ঞতা-মূর্খতা থেকে সৃষ্ট ঘোর অন্ধকারে হাত-পা ছুড়ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা দ্বারা আলোকিত করে তুলতে তখনো ও সব দেশের ভাগ্যাকাশে মুসলিম স্পেনের অভ্যুদয় ঘটেনি। তাছাড়া বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকও তাদের চোখ খুলতে সাহায্য করেনি। মোটকথা, এসব জাতিগোষ্ঠী মানব সভ্যতার কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে এসব জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান ছিল নবীন অভিজ্ঞতাহীন খ্রিষ্ট ধর্ম ও প্রাচীন মূর্তি পূজার মাঝামাঝি।

এইচ. জি. ওয়েলস (H. G wells) বলেন, তাদের কাছে না দ্বীনের কোন পয়গাম আর না রাজনীতির ময়দানে তাদের কোন উচ্চ আসন ছিল। তৎকালে পশ্চিম ইউরোপে ঐক্য-সংহতি ও আইন-শৃঙ্খলার কোন চিহ্ন মাত্র ছিল না।[১৯]

রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন, From the fifth to the earth century Europe lay sunk in a night of barbarism which grew darker and darker. It was a barbarism far more awful and horrible than that of the primitive

---

১৮. J.M. Roberts, *History of the World* (The United States: The Amazon Book Review, 1907), Vol. vii- p. 175

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

savage, for it was the decomposing body of what had once been a great civilization. The features and impress of that civilization were all but completely effaced. Where its development had been fullest, e.g., in Italy and Gaul, all was ruin, squalor, dissolution.

অর্থাৎ, "খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে নিয়ে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে গভীর অন্ধকার ছেয়ে ছিল এবং তা ক্রমশ অধিক গভীর ও ভয়াবহ হয়েই চলছিল। তখনকার ভয়-ভীতি ও বর্বরতা ছিল প্রাচীনকালের ভয়-ভীতি ও বর্বরতার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি। কেননা এর উদারতা ছিল এক বিরাট সভ্যতার লাশের যে লাশ পচে ও গলে গিয়েছিল। সেই সভ্যতার চিহ্নাদি লোপ পাচ্ছিল এবং তার উপর ধ্বংসের মোহর লেগেছিল। সে সমস্ত দেশ যেখানে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল যেমন ইটালী, ফ্রান্স, সেখানে ধ্বংসের তাণ্ডব, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলারই রাজত্ব চলছিল।"[২০]

২.১.৫ ইয়াহুদী জাতিগোষ্ঠী

ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বসতি স্থাপনকারী ইয়াহুদী নামক জাতিগোষ্ঠী দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর ভিতর এদিক দিয়েও অনন্য ছিল, তাদের নিকট দ্বীন (ধর্ম) এর এক বিরাট বড় পুজি ছিল এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় ব্যখ্যা বিশ্লেষণ ও পরিভাষা সমূহ অনুধাবনের সর্বাধিক যোগ্যতা ছিল কিন্তু এই ইয়াহুদীরা ধর্ম, সভ্যতা সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই মর্যাদার অধিকারী ছিল না যাতে তারা অন্যদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, বরং অন্যরা তাদেরকে শাসন করবে, সর্বদা তারা অন্যের যুলুম-নিপীড়ন সইবে নানা রকম শাস্তি ও নির্যাতন ভোগ করবে, বিবিধ প্রকারে কঠোরতা ও ভয়-ভীতির শিকার হবে, এটাই ছিল তাদের ভাগ্যলিপি। দীর্ঘকাল ধরেই গোলামির জীবন যাপন এবং নানা ধরনের কঠোরতা ও শাস্তি ভোগের দরুন তাদের মধ্যে এক বিশেষ ধরণের মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, জাতিগত অহমিকা, গোত্রীয় ও বংশগত অহংকার, ধন-সম্পদের প্রতি সীমাতিরিক্ত লোভ-লালসা, অব্যাহত সুদী কারবারের দরুন বিশেষ ধরনের চরিত্র ও মানসিকতা, জাতিগত অভ্যাস ও স্বভাব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে তাদের কোন জুড়ি ছিল না।

দুর্বল ও বিজিত অবস্থায় লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হওয়া ও বিজয়ী জাতিকে খোসামোদ-তোষামোদ করা আর বিজয়ী হতেই বিজিত জাতির সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ এবং সাধারণ অবস্থায় প্রতারণা, শঠতা, মুনাফেকী, সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ও স্বার্থপরতা, বিনা পয়সায় অপরের শ্রমের ফসল ভোগ, হারামখোরি, সত্যের পথে লোকদের বাধা প্রদান তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে

---

২০. Robert Brifoult, *The Making of Humanity* (New York: The Modern Library, 1931), p. 164

দাঁড়িয়েছিল। কুর'আনুল কারিম ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে তাদের এ অবস্থার খুবই খোলাখুলি ও পূর্ণাঙ্গ ছবি এঁকেছে এবং বলেছে, নৈতিক অবনতি, মানবিক অধঃপতন ও সামাজিক অনাচার-অরাজকতার মধ্যে তারা কোন স্তরে অবস্থান করেছিল এবং কোন ও কী কারণে তারা চিরদিনের জন্য বিশ্বের নেতৃত্ব ও পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর উপর কর্তৃত্ব করবার অধিকার হারাল।

২.১.৬ ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান দ্বন্দ্ব

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল যে, এদের এক পক্ষ অপর পক্ষকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও হেনস্থা করতে, প্রতিপক্ষ থেকে আপন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিশোধ নিতে ও বিজিত পক্ষের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করতে কোন রকম কসুর করত না। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহুদীরা এন্টিয়কে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সম্রাট ফোকাস এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশে বিখ্যাত সমর অধিনায়ক বোনোসূস (Bonosus) কে প্রেরণ করেন। তিনি গোঁটা ইয়াহুদী বসতিকে এইভাবে উচ্ছেদ করেন যে, হাজার হাজার ইয়াহুদীকে তলোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করে, শত শত লোককে নদীবক্ষে ডুবিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে এবং আরো বহু লোককে হিংস্র পশুর মুখে নিক্ষেপ করে শেষ করেন।

৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরানিরা যখন শামদেশ জয় করে তখন ইয়াহুদীদের পরামর্শ ও প্ররোচনায় সম্রাট খসরু খ্রিষ্টানদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার চালান ও অধিকাংশ খ্রিষ্টানকে হত্যা করেন। ইরানীদের ওপর বিজয় লাভের পর সম্রাট হেরাক্লিয়াস আহত ও নিপীড়িত খ্রিষ্টানদের পরামর্শে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহুদীদের থেকে ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে এমনভাবে কচুকাটা করেন যে, গোটা রোমক সাম্রাজ্যে কেবল সেই সব ইয়াহুদীই প্রাণরক্ষায় সমর্থ হয়েছিল যারা দেশ থেকে পালাতে কিংবা কোথাও আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছিল।[২১]

২.১.৭ ইরান ও সেখানকার ধ্বংসাত্মক আন্দোলনসমূহ

সভ্য দুনিয়ার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ব্যাপারে ইরান ছিল রোম সাম্রাজের অংশীদার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে ছিল মানবতার শত্রুগোষ্ঠীর তৎপরতার পুরনো লীলাভূমি। সেখানে নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি বহুকাল থেকেই নড়বড়ে অবস্থায় চলে আসছিল। যে সব আত্মীয়ের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকে পৃথিবীর সভ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাগণ সর্বদাই

২১. Alfred J. Butler. *The Arabs' Conquest of Egypt and the last thirty years of the Roman Dominion* (New York: Oxford University press, Second Edition, 1978), Pp. 133-34

অননুমোদিত ও বেআইনী মনে করে এসেছে এবং প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণা করে থাকে-ইরানিরা সেসব সম্পর্ককে ঘৃণা ও অবৈধ বলে স্বীকার করত না। সম্রাট ২য় ইয়াযদাগির্দ, যিনি ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজত্ব করেছিলেন, আপন কন্যাকে বিবাহ করেন, অতঃপর তাকে হত্যা করেন।[২২]

খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শাসক বাহরাম চূবীন আপন বোনের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। অধ্যাপক আর্থার ক্রিস্টিন্সেন এর বর্ণনা মোতাবেক ইরানে এ জাতীয় সম্পর্ককে কোন রকম অবৈধ কাজ বলে মনে করা হতো না, বরং একে ইবাদত ও পূণ্য কর্ম মনে করা হতো। বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্গ বর্ণনা করেন, ইরানী আইনে ও সমাজে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোন প্রকার সম্পর্কের বাচ-বিচার ছিল না।[২৩]

খ্রি. ৩য় শতাব্দীতে দুনিয়ার বুকে মানীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর আন্দোলন ছিল বস্তুতপক্ষে দেশের ক্রমবর্ধমান তীব্র যৌনপ্রবণতার বিরুদ্ধে এক অস্বাভাবিক ও প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া এবং আলো ও আঁধারের মনগড়া দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিস্বরূপ। অনন্তর মানী চিরকুমার জীবন অবলম্বনের আহবান জানান যাতে দুনিয়া থেকে মন্দ ও অন্যায় অনাচারের জীবাণু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তিনি এই দার্শনিক ঘোষণা দিয়েছিলেন, আলো ও আধারের মিশ্রণই যাবতীয় অনাসৃষ্টির কারণ। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। এই ভিত্তিতে তিনি বিবাহকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, যাতে করে মানুষ যথাসত্তর নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এভাবে মানব জাতির অবলুপ্তির মাধ্যমে আলো অন্ধকারের ওপর চিরস্থায়ী বিজয় লাভ করেন। বাহরাম ২৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মানীকে এই বলে হত্যা করেন, এই লোকটির বিশ্বের ধ্বংসের আহবান জানাচ্ছে। এই জন্য দুনিয়া খতম হওয়ার আগে এবং তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার পূর্বে তার নিজেরই ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু মানী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নিহত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রচারিত শিক্ষা বহুদিন যাবত বেঁচে ছিল এবং মুসলিম বিজয়ের পরেও এর প্রভাব অবশিষ্ট ছিল।

২.১.৮ ইরানের সম্রাটপূজা

ইরানের রাজা-বাদশাহগণ, যাদের উপাধি ছিল কিসরা, দাবি করত, তাদের শিরা-উপশিরায় খোদায়ী রক্ত প্রবাহিত। ইরানের জনগণ ও তাদেরকে সেই নযরেই দেখত যেন তাদের সম্রাট তাদের খোদা। তাদের বিশ্বাস ছিল, তাদের ঐসব সম্রাটের প্রকৃতিতে একটি পবিত্র আসমানী বস্তু রয়েছে। অনন্তর এসব লোক তাদের সম্রাটকে সিজদা করত এবং তাদের উপর

---

২২. J.M. Roberts, *History of the World* (The United States: The Amazon Book Review, 1907), Vol. vii- p. 175

২৩. আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী, *তাফসীরে তাবারী শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৩), খ. ৩, পৃ. ১৩৮

উলূহিয়াত তথা ঈশ্বরত্ব আরোপ করে তাদের জয়গান গাইত। তাঁরা তাদেরকে আইনের কোন প্রকার সমালোচনার, এমন কি মানবত্বের ঊর্ধ্বে বলে জ্ঞান করত।

ইরানের জনগণের বিশ্বাস ছিল, ঐসব সম্রাটের প্রত্যেক মানুষের উপর জন্মগত অধিকার রয়েছে, কিন্তু অন্য কারো সম্রাটের উপর অধিকার নেই। ইরানের জনগণ মনে করত, ঐ পরিবারের লোকেরাই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং সাম্রাজ্যের কেবল তারাই মালিক হতে পারেন। আর এই অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা থেকে পুত্রে পর্যায়ক্রমে হস্তান্তরিত হতে থাকবে। এতে কারোর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। যদি ঐ পরিবারে কোন প্রবীণ ও বয়স্ক লোক না পাওয়া যেত তাহলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন শিশুকেই নিজেদের সম্রাট হিসেবে মেনে নিত। যদি কোন পুরুষ না পাওয়া যেত তাহলে কোন মহিলাকেই রাজমুকুট পরিধান করানো হতো।

২.১.৯ বৌদ্ধ মতবাদ, এর পরিবর্তন ও বিকৃতি

বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে এবং তার অবতার ও দেবতাসমূহকে আত্তীকরণ করে নিজের অস্তিত্বকেই হারিয়ে ফেলেছিল। বৌদ্ধ ধর্মবাদ মূর্তি পূজার ধর্মের রূপ গ্রহণ করে। যেসব দেশেই এই ধর্মের অনুসারীরা গেছে সেখানেই তারা মূর্তি সাথে নিয়ে গেছে এবং যেখানেই যেত সেখানেই যে কাজটি তারা সর্বপ্রথম করত তা হলো গৌতম বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন এবং তার প্রতিকৃতি ও প্রতিমূর্তি তৈরিকরণ। তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন ঐসব প্রতিমূর্তি ও প্রতিকৃতি দ্বারা ঢাকা দেখতে পাওয়া যায়।[২৪]

অধ্যাপক ঈশ্বর টোপা তদীয় ভারতীয় সংস্কৃতি নামক গ্রন্থে বলেন, "বৌদ্ধ মতবাদ-এর ছত্রছায়ায় এমন রাজত্ব কায়েম হয় যার ভিতর অবতারের ছড়াছড়ি, মূর্তি পূজার অবাধ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দেখা যেতে লাগল। সংঘসমূহের পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে তার ভেতর ধর্মের নামে নিত্য-নতুন প্রথা-পদ্ধতি একের পর এক দৃষ্টিগোচর হতে থাকলো।"[২৫]

পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু তাঁর Discovery of India গ্রন্থে বৌদ্ধ মতবাদের বিকৃতি ও ক্রমাবনতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদ বুদ্ধকে অবতার বানিয়েছিল। বৌদ্ধ মতবাদ ও তাই করল। সংঘ খুবই সম্পদশালী হয়ে উঠে এবং গোষ্ঠীর বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির আখড়ায় পরিণত হয়। সংঘের ভেতর নিয়ম শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না। উপাসনা

---

২৪. বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন রাজধানী তক্ষশীলার যাদুঘর পরিদর্শনকারী একজন দর্শক ঐসব মূর্তি ও প্রতিমূর্তি পরিদর্শনের পর বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন যা বৌদ্ধ ধর্মের মাটির নিচে চাপাপড়া শহর সমূহ খননের পর আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, এ ধর্ম ও সভ্যতা নির্ভেজাল মূর্তি পূজার ধর্ম ও সভ্যতায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রাহুল সাংকৃতায়ন, *বৌদ্ধ দর্শন* (কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ১২০

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭

পদ্ধতির মধ্যে যাদু ও নানারূপ অলীক কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ভারতবর্ষের সহস্র বর্ষব্যাপী নিয়ম মাফিক চালু থাকার পর বৌদ্ধ মতবাদের অবনতি শুরু হয়।[২৬]

মোদ্দাকথা, চীনসহ বৌদ্ধ মতবাদের অনুসারীদের কাছে বিশ্বের জন্য দেবার মত কোন পয়গাম ছিল না যার আলোকে গোটা বিশ্ব তাঁর সমস্যাবলীর সমাধান খুজতে পারে এবং আল্লাহ প্রদত্ত সহজ-সরল রাস্তা পেতে পারে।

২.১.১০ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী

পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার অপরাপর জাতিগোষ্ঠী বিকৃত বৌদ্ধ মতবাদ ও বর্বরতাপূর্ণ মূর্তি পূজার মাঝে অবস্থান করছিল। তাদের কাছে না ছিল জ্ঞান গত কোন সম্পদ আর না ছিল কোন উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নীতিমালা। আসলে এসব জাতিগোষ্ঠী একটি মধ্যবর্তী কাল অতিক্রম করছিল। তারা মূর্খতা সর্বস্ব মূর্তিপূজা থেকে বেরিয়ে সবেমাত্র সভ্যতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং কয়েকটি জাতিগোষ্ঠী এমনও ছিল যারা সে সময় পর্যন্ত নগর সভ্যতা ও নগর জীবনের একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করছিল।

২.১.১১ ভারতবর্ষঃ ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত, খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে যে যুগ শুরু হলো তা ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দিক দিয়ে এ দেশের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত ও অন্ধকারতম যুগ ছিল। পার্শ্ববর্তী দেশ গুলোতে বিরাজমান সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে এ দেশটি কারোর চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। এ ছাড়া এ দেশটির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্য। এ বৈশিষ্ট্য গুলোর সর্বাধিক উল্লখেযোগ্য হলো: ১. দেব দেবীর সংখ্যাধিক্য ২. যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ৩. জাতিবেদ ও শ্রেণী বৈষম্য।

খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মূর্তিপূজার ছিল রমরমা অবস্থা। বেদে দেবতাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩, ঐ শতাব্দীতে এ সংখ্য ক্রমান্বয়ে ৩৩ কোটিতে উন্নীত হয়। এ যুগে পছন্দনীয় বস্তু, আকর্ষণীয় জিনিস, প্রয়োজন পূরণে সক্ষম বস্তু মাত্রই পূজ্য দেবতায় পরিণত হয়। ফলে তাদের পূজ্য মূর্তি, প্রতিকৃতি, দেবতা ও দেবদেবীর সংখ্যার কোন ইয়ত্তা ছিল না। এ সব দেবতা ও পূজ্য বস্তুর মধ্যে খনিজ দ্রব্য, জড় বস্তু, বৃক্ষাদি, উদ্ভিদরাজি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, জীব-জন্তু, এমনকি যৌনাঙ্গ ও শামিল ছিল। আর এভাবে এ প্রাচীন ধর্ম গল্পলোকের কল্প কাহিণী, আকিদা-বিশ্বাস ও পূজা-অর্চনার একটি দেব উপাক্ষনে পরিণত হয়।

---

২৬. Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India* (Delhi: Oxford University Press, 2003), p. 201- 203.

W. Gustave le Bon তাঁর les Civilizations De la India নামক গ্রন্থে লিখেছেন, The Hindu, of all people, stands most unavoidably in the need of visible objects for religious worship, and although at different times religious reformers have tried to prove monotheism in the Hindu faith, it has been an availing effort. From the Vedic age to the present day, the Hindu has been worshiping all sorts of things. Whatever he cannot understand or control is worthy of being adored as divine in his eyes. All attempts of Brahmans and other Hindu reformers in the direction of monotheism or in limiting the number of Gods two three have been utterly unsuccessful. The Hindus listened to them, and sometime even accepted their teaching in principle, but in practice the three Gods went on multiplying till they began to see a god in every article and phenomenon of nature.

অর্থাৎ, "দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু এমন একটি জাতি যাদের পূজায় বাহ্যিক একটা না একটা অবয়ব থাকতেই হবে। যদিও বিভিন্ন যুগে ধর্মীয় সংস্কারকগণ হিন্দু ধর্মে একত্ববাদ রয়েছে বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাদের এ প্রয়াস একেবারেই নিষ্ফল। হিন্দুদের নিকট বৈদিক যুগেই হোক আর বর্তমানকালেই হোক, প্রতিটি বস্তুই অবোধ্য ও অপ্রতিরোধ্য আরাধ্য উপাস্য। ব্রাহ্মণ ও দার্শনিক পণ্ডিতদের কেবল একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার সকল প্রয়াসই নয়, বরং তাদের সেই সমস্ত প্রয়াসই যা তারা দেবদেবীর সংখ্যা কমিয়ে তিনে আনার জন্য চালিয়েছে তা পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের শেখানো কথা শুনেছে এবং কবুল করেছে, কিন্তু কার্যত এতে করে তাদের দেবতার সংখ্যা হ্রাস পায় নি, বরং তা বৃদ্ধিই পেয়েছে এবং প্রতিটি রঙ, রুপ, বর্ণ ও গন্ধের মধ্যে তারা তাদের অবতার দেখতে পেয়েছে।"[২৭]

২.১.১২ যৌন অরাজকতা

যৌন আবেগ ও যৌন প্রবণতাকে উস্কানী দানকারী উপাদান ধর্মীয় রূপে যতটা ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে দেখতে পাওয়া যায় ততটা পৃথিবীর আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। দেশের পবিত্র গ্রন্থসমুহ ও ধর্মীয় মহলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং সৃষ্টি ও জন্মের কার্যকারণ বিশ্লেষণ, দেবতা ও দেব-দেবীদের সঙ্গম, সহবাস এবং কোন কোন সম্ভ্রান্ত

২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪০-৪১

পরিবারের এমন সব ঘটনা ও বর্ণনা বিবৃত করেছে যা শুনলে লজ্জায় মাথা নীচু ও কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে। বড়ই নিষ্ঠা ও ভক্তিসুলভ আবেগের সাথে উল্লেখিত কাহিনীগুলো পুনরাবৃত্তিকারীর সহজ-সরল ধর্মপরায়ণ লোকেদের উপর যে প্রভাব পড়ে তা সহজে অনুমেয়। তাদের মধ্যে অজান্তে তাদের স্নায়ু ও আবেগের উপর এসব বর্ণিত কাহিনীর যে প্রভাব পড়ে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। এতদ্ভিন্ন বড় দেবতা শিবের লিঙ্গের পূজা হতো এবং শিশু-যুবা ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এতে অংশগ্রহণ করত।

ড. গুস্তাব লী বন এ প্রসঙ্গে বলেন, "মূর্তি ও বাহ্যিক প্রতীকের প্রতি হিন্দুদের আকর্ষণ ও অনুরাগ সীমাহীন। তাদের ধর্ম যাই হোক, তাঁর অনুষ্ঠানাদি তারা অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে। তাদের মন্দিরগুলো আরাধ্য ও সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। এসবের মধ্যে সর্বাগ্র গণ্য হলো লিঙ্গ ও যোনী যা প্রজন্মেরই ইঙ্গিতবহ। অশোক স্তম্বকেও সাধারণ হিন্দুরা লিঙ্গের প্রতীক মনে করে থাকে। ঊর্ধ্বমুখী শঙ্কু আকৃতির বস্তু মাত্রই তাদের কাছে সম্মানযোগ্য।"[২৮]

২.১.১৩ শ্রেণীভেদ প্রথা

পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাস এত সুস্পষ্ট শ্রেণী বৈষম্য, পেশা ও জীবনের কর্মের এমনতর অনড় ও অটল বিভক্তি কমই দেখা গেছে, যেমনটা ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-বিধানের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। জাতপাতের ভেদ বৈষম্য ও একই পেশার যাঁতাকালে বন্দি হবার সূচনা বৈদিক যুগের শেষ দিকে শুরু হয়। আর্যরা তাদের বংশ ও বংশীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে, এদেশে বিজেতা হিসেবে তাদের অবস্থানগত মর্যাদা কায়েম রাখতে এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য অব্যাহত রাখার স্বার্থে শ্রেণীভেদ প্রথা ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য অপরিহার্যভাবে ঘোষণা করে।

ড. Gustave le Bon–এর ভাষায়, We have seen that, towards the close of the Vedic age, occupation had started become more or less hereditary, and the germ of the caste system had been sown. The Vedic Aryans were alive to the need of maintaining the purity of their race by not mixing with the conquered peoples and they advanced towards the east and subjugated vast populations, this need became still more manifest and the law-givers had to pay due regard to it. The Aryans understood the problems of race

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪১

well; they had come to realize if a ruling minority did not take proper care of itself, it was rapidly assimilated wit5h the servile population and deprived of its identity.

অর্থাৎ, "বৈদিক যুগের শেষ দিকে আমরা দেখেছি, বিভিন্ন পেশা কমবেশি পৈতৃক রূপ পরিগ্রহ করতে যাচ্ছিল এবং বর্ণভিত্তিক বিভাজন শুরু হয়ে গিয়েছিল যদিও তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেনি। বৈদিক আর্যদের এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, তারা তাদের প্রাচীন বংশধারাকে বিজিত জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রিত হবার হাত থেকে রক্ষা করবে। এবং যেই মুহূর্তে এই স্বল্পসংখ্যক বিজেতা পূর্বদিকে অগ্রসর হলো এবং তারা এ দেশীয় জাতি গোষ্ঠীর এক বিরাট দলকে তারা পরাভূত করল এখন এর প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি পেল এবং বিধায়কদের এর প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিল। বংশধারার সমস্যা আর্যরা বেশ ভালো বুঝেছিল। তারা আগেভাগে জেনেছিল, যদি স্বল্প সংখ্যক বিজেতা কম জাতিগোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র রক্ষা না করে তবে তারা যথাসত্তর বিজিত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হারিয়ে যায় এবং তাদের নাম নিশানও আর অবশিষ্ট থাকে না।"[২৯]

২.১.১৪ ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা

ব্রাহ্মণী যুগে নারীর সে মর্যাদা ছিল না যা বৈদিক যুগে ছিল। মনুর সংহিতায় নারী সর্বদাই দুর্বল ও অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নারী ঘৃণা ও অবজ্ঞার সঙ্গেই উল্লেখিত হয়েছে। স্বামী মারা গেলে স্ত্রী জীবন্মৃতের ন্যায় হয়ে যেত এবং জীবিত থাকতে মৃতের দশায় উপনীত হতো। সে আর দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারত না। তার ভাগ্যে জুটত তীব্র লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ঘৃণা ও অবজ্ঞা। বিধবা হবার পর তাকে তার মৃত স্বামীর ঘরের চাকরানী ও দেবরের সেবা দাসী হয়ে থাকতে হতো।[৩০]

মোটকথা, এই সবুজ শ্যামল দেশ যা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ছিল, সত্যিকার আসমানী ধর্মের শিক্ষামালা থেকে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত বঞ্চিত থাকায় ও ধর্মের নির্ভর যোগ্য উৎসের বিলুপ্তির দরূন কষ্ট-কল্পনা ও বিকৃতির শিকার এবং রসম-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতির পূজারীতে পরিণত হয়েছিল। সে সময়কার পৃথিবী তো অজ্ঞতা, মূর্খতা, কল্পনা-পুজা, নীচু স্তরের মূর্তিপূজা, প্রবৃত্তি পূজা, শ্রেণীগত বৈষম্যের ব্যাপারে ছিল অগ্রগামী এবং পৃথিবীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দেবার পরিবর্তে নিজেই ছিল অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য ও নৈতিক বিশৃঙ্খলার মাঝে নিমজ্জিত।

---

২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১
৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬

২.১.১৫ ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগের আরবদের অবস্থা

জাহিলী যুগে আরব কিছু কিছু আপন প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত যোগ্যতা এবং কতকগুলো গুণে ও চারিত্রিক বৈশিষ্টে ছিল অনন্য। ভাষার অলংকার, বাকচাতুর্যে ও ছন্দে প্রকরণে তাদের কোন জুড়ি ছিল না। স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধকে তারা নিজেদের চাইতেও বেশি ভালবাসত। শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শনে এবং অশ্বারোহণেও তাদের কোন বিকল্প ছিল না। তারা বিশ্বাসে দৃঢ়, স্পষ্টভাষী, সাহসী, তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী, সাম্যবাদী, লৌকিকতামুক্ত ও কষ্ট সহিষ্ণু, প্রবল ইচ্ছা শক্তির অধিকারী, সত্যবাদী, প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অনড় এবং বিশ্বস্ততা রক্ষায় ও আমানতদারীতে ছিল প্রবাদতুল্য।

কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.) ও তাদের শিক্ষামালা থেকে দূরে অবস্থান, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই উপদ্বীপে আবদ্ধ থাকা এবং বাপ-দাদার ধর্ম, জাতীয় ঐতিহ্য ও প্রথা-পদ্ধতি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকার দরুন তারা ধর্মীয় ও নৈতিক দিক দিয়েই খুবই নিচে নেমে গিয়েছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তারা অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছিল। প্রকাশ্যে মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল তারা এবং এ ব্যাপারে তারাই ছিল নাটের গুরু। নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি তাদের সমাজকে ঘুণের ন্যায় কুরে কুরে খাচ্ছিল। মোটকথা, ধর্ম মিশ্রিত জীবনের অধিকাংশ সৌন্দর্য থেকেই তারা ছিল বঞ্চিত এবং জাহিলী জীবনের নিকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্য ও দোষত্রুটিতে ছিল নিমজ্জিত।

২.১.১৬ জাহিলী যুগে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা

ইসলামের পূর্বেকার আরবদের অবস্থা ছিল বিকৃত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নীতিগর্হিত। তাদের অধিকাংশ লোকই ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, ঘৃণ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, দেবদেবী ও পাহাড় পর্বতের পূজায় লিপ্ত ছিল। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন- The religion of the Arabs as well as their political life was an a thoroughly primitive level।"[৩১]

(১) মূর্তিপূজা: অজ্ঞতা ও মূর্খতার উন্নতির সাথে সাথে গায়রুল্লাহর পূজার আকীদাও ব্যাপক ও জনপ্রিয় এবং আল্লাহ তা'আলার ওয়াহদানিয়াত ও রবূবিয়াত এর ধারণা দুর্বল ও বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। এমন কি ক্রমান্বয়ে সমগ্র জাতিগোষ্ঠী মূর্তি ও পুতুলের পরিষ্কার ও খোলাখুলি পূজায় লিপ্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা থেকে কার্যত ও অন্তর-মন

---

৩১. Tor Andrae, Mohammed: *The man and his faith, 19*36, translated by Theophil Menzel (Kolkata: Cirayot publication, 1960), p. 13

থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে অন্যন্য উপাস্য দেবদেবী ও মূর্তির সঙ্গে কায়েম হয়ে গিয়েছিল এবং বন্দেগী ও দাসত্বের প্রকাশের পন্থা ও আমলসমূহ সেগুলোর সঙ্গেই সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং দেশে প্রকাশ্যে মূর্তি পূজা, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ও সুস্পষ্ট শিরক–এর রাজত্ব চলছিল।

(২) দেবদেবীর পূজা: সর্বকালে সর্বযুগে ও সবদেশে কাফির-মুশরিকদের যেই অবস্থা আরবদের অবস্থা ও তাঁর থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। তাদের উপাস্য দেব-দেবী ছিল বহু। এসবের ভিতর ফেরেশতা, জিন ও নক্ষত্রপুঞ্জ সবই শামিল ছিল। ফেরেশতাদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল, তারা আল্লাহর কন্যা সন্তান। এজন্য তারা ফেরেশতাদের নিকট সুপারিশ কামনা করত, তাদের পূজা করত এবং তাদেরকে ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করত। জিনদেরকে আল্লাহর শরীক জ্ঞান করত, তাদের শক্তি ও প্রভাবের ব্যাপারে বিশ্বাস করত এবং তাদের পূজা করত। হযরত সা'দ (র.) বর্ণনা করেন, হিময়ার গোত্র সূর্যের পূজা করত। কিনানা গোত্র চাঁদের পূজারী ছিল। বনু তামীম ওয়াবরানের, লাখম ও জুযাম বৃহস্পতির, তাঈ গোত্র সুহায়ল-এর, বনু কায়স শে'রা নক্ষত্রের ও বনু আসাদ বুধ গ্রহের পূজা করত।[৩২]

(৩) কাবাগৃহে প্রতিমা: তৎকালীন আরবদের ধর্মীয় কুসংস্কার এতটাই ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল যে, বর্বর আরবরা পবিত্র কাবা গৃহে লাত, মানাত, উযযা, হোবল সহ ৩৬০ টি প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করে ছিল। হোবল ছিল এদের মধ্যে সবার প্রধান। এদের অধিকাংশ ছিল নারী আকৃতির, এসব দেব-দেবীকে আল্লাহর কন্যারূপে কল্পনা করত। যেমন-আল কুরআনে এসেছে:

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا অর্থাৎ, "তারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে।"[৩৩]

(৪) নবীদের প্রতিকৃতি: জাহিলী আরবের লোকেরা মূর্তি পূজার পাশাপাশি কয়েকজন নবীর প্রতিকৃতি তৈরি করে পূজা করত। তাঁরা হযরত ইবরাহীম, ঈসা, ইসমাইল, মারয়াম (আ.) প্রমূখের মূর্তি কাবা ঘরে স্থাপন করে ছিল।

২.১.১৭ জাহিলী যুগে আরবদের সামাজিক অবস্থা

আরবদের ভেতর বহু নৈতিক ব্যধি বাসা বেঁধেছিল এবং তাঁর কারণও সুস্পষ্ট। তাদের মদ পান এতই সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল যে, এর আলোচনা তাদের সাহিত্যে ও কাব্যের

---

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

৩৩. আল-কুর'আন, ৪ : ১১৭

একটি বিরাট অংশ জুড়ে বসেছিল। আরবী ভাষায় মদের যে বিপুল সংখ্যক নাম পাওয়া যায় এবং এসব নামের ভেতর যেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা থেকেই এর গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যাপকতার পরিমাপ করা যায়।"[৩৪] মদের দোকান ছিল প্রকাশ্য রাস্তার উপর এবং চেনার সুবিধার্থে এসব দোকানের উপর পতাকা উড়ানো হতো। জাহিলী যুগে জুয়া ছিল গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় এবং এতে অংশ গ্রহণ না করা ছিল কাপুরুষতা ও নিস্তেজতার পরিচায়ক।"[৩৫]

প্রসিদ্ধ তাবিঈ হযরত কাতাদা (র.) বলেন, জাহিলী যুগে একজন তাঁর ঘর-বাড়ি জুয়ার বাজি হিসেবে ধরত। এরপর জুয়ায় তা হারিয়ে ব্যথা-ভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে তা দেখত। এর ফলে ঘৃণা ও শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠত এবং পরিণতি যুদ্ধ-বিগ্রহে গিয়ে গড়াত।"[৩৬] হেজাযের আরব অধিবাসী ও ইয়াহুদীরা সুদী লেন-দেন করত এবং চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালাত। এ ব্যাপারে বড়ই নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার অভিব্যক্তি ঘটত।"[৩৭] ব্যভিচারকে খুব একটা দূষণীয় মনে করা হতো না এবং আরবদের জীবনে এ ধরনের ঘটনার অভাব ছিল না। এরও আবার রকমারি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এ জন্য পেশাদারী মহিলাও ছিল এবং স্বতন্ত্র বেশ্যালয় ছিল। শুঁড়ীখানা গুলোতেও এর ব্যবস্থা ছিল।

(১) নারীদের অবস্থা: জাহিলী সমাজে সাধারণত মহিলাদের প্রতি নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা ছিল একটি সাধারণ ও বৈধ ব্যাপার। তাদের অধিকারকে পদদলিত করা হতো। তাদের সম্পদকে পুরুষেরা নিজেদের সম্পদ মনে করত। ওয়ারিশ হিসেবে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাঁরা কোন অংশ পেত না। স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে পছন্দ মাফিক দ্বিতীয় বিয়েরও অধিকার ছিল না।"[৩৮] অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ও জীবজন্তুর মতই নারীও ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত ও হস্তান্তরিত হতো।"[৩৯] পুরুষ তো তাঁর অধিকার কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিত, কিন্তু মহিলারা তাদের অধিকার নিতে পারত না। এমন অনেক খাদ্য দ্রব্য ছিল যেগুলো কেবল পুরুষদের জন্য নিদিষ্ট ছিল, মহিলারা তা খেতে পেতো না।"[৪০] পুরুষরা যত সংখ্যক ইচ্ছে নারীকে বিয়ে করতে পারত। কন্যা সন্তানের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাদের জীবন্ত প্রোথিত করার ও রেওয়াজ ছিল।

---

৩৪. ইবনে সায়্যিদা, *কিতাবুল মুখাসসাস আল-খুমুর* (বৈরত: দারু ইয়াহিয়াতুরাছুল আরাবী, ১৪ তম সংস্করণ ২০১০), খ. ১১, পৃ. ৭২
৩৫. হিজর ইবনে খালিদ, *দিওয়ান আল- হামাসা* (বৈরত : দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ, ১৯৯৮), পৃ. ৮৮

৩৬. *তাফসীরে তাবারী শরীফ*, খণ্ড-০৮, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮
৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬৯
৩৮. আল-কুর'আন, ২ : ২৩২
৩৯. আল-কুর'আন, ৪ : ১৯
৪০. আল-কুর'আন, ৬ : ১৪০

আরবের জনগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতো। প্রতিটি শ্রেণীর অবস্থা ছিল অন্য শ্রেণীর চেয়ে আলাদা। অভিজাত শ্রেণীতে নারী পুরুষের সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট উন্নত। এ শ্রেণীর মহিলাদের স্বাধীনতা ছিল অনেক। এদের কথার মূল্য দেয়া হতো। তাদের এতোটা সম্মান করা হতো এবং নিরাপত্তা দেয়া হতো যে, এরা পথে বেরোলে এদের রক্ষের জন্য তলোয়ার বেরিয়ে পড়তো এবং রক্তপাত হতো। কেউ যখন নিজের দানশীলতা এবং বীরত্ব প্রসঙ্গ নিজের প্রশংসা করতো তখন সাধারণত মহিলাদের সম্বোধন করতো। মহিলা ইচ্ছে করলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ এবং রক্তপাতের আগুন জ্বালিয়ে দিতো। এসব কিছু সত্ত্বেও পুরুষদেরই মনে করা হতো পরিবারের প্রধান এবং তাদের কথা গুরুত্বের সাথে মান্য করা হতো। এ শ্রেণীর মধ্যে নারী পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক বিয়ের মাধ্যমে নির্ণীত হতো এবং মহিলাদের অভিভাবকদের মাধ্যমে এ বিয়ে সম্পন্ন হতো। অভিভাবক ছাড়া নিজের বিয়ে করার মতো কোন অধিকার নারীদের ছিল না। অভিজাত শ্রেণীর অবস্থা এরকম হলেও অন্যদিকে অন্যান্য শ্রেণীর অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। সে সব শ্রেণীর মধ্যে নারী পুরুষের যে সম্পর্ক ছিল সেটাকে পাপাচার, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা এবং ব্যভিচার ছাড়া কিছু বলা যায় না। হযরত আয়েশা (র.) বলেন: আইয়ামে জাহিলিয়াতে বিয়ে ছিল চার প্রকার।

প্রথমটা ছিল বর্তমান কালের অনুরূপ। যেমন একজন মানুষ অন্য একজনকে অধীনস্থ মেয়ের বিয়ের জন্য পয়গাম পাঠাতো। সে পয়গাম মঞ্জুর হওয়ার পর মোহরানা আদায়ের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হতো।

দ্বিতীয়টা ছিল এমন, বিবাহিত মহিলা রক্তস্রাব থেকে পাক সাফ হওয়ার পর তার স্বামী তাকে বলতো, অমুক লোকের কাছে পয়গাম পাঠিয়ে তার নিকট থেকে তার লজ্জাস্থান অধিকার করো। অর্থাৎ তার সাথে ব্যভিচার করো, এসময় স্বামী নিজ স্ত্রীর নিকট থেকে দুরে থাকতো, স্ত্রীর কাছে যেতোনা। যে লোকটাকে দিয়ে ব্যভিচার করানো হচ্ছিল তার দ্বারা নিজ স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীর কাছে যেতো না। গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর স্বামী ইচ্ছে করলে স্ত্রীর কাছে যেতো। এরূপ করার কারণ ছিল যাতে সন্তান অভিজাত এবং পরিপূর্ণ হতে পারে। এ ধরণের বিয়েকে বলাহয় 'এসতেবজা' বিবাহ। ভারতেও এ বিয়ে প্রচলিত আছে।

তৃতীয়ত, দশজন মানুষের চেয়ে কম সংখ্যক মানুষ কোন এক জায়গায় একজন মহিলার সাথে ব্যভিচার করতো। সেই মহিলা গর্ভবতী হওয়ার পর সেই মহিলা সে সব পুরুষকে কাছে ডেকে আনতো। এ সময় কারো অনুপস্থিত থাকার উপায় ছিল না। সকলে উপস্থিত হলে সেই মহিলা বলতো, তোমার যা করেছো সে তো তোমরা জান, এখন আমার গর্ভে থেকে এ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। হে অমুক, এ সন্তান তোমার। সেই মহিলা ইচ্ছেমতো যে

কারো নাম নিতে পারতো এবং যার নাম নেয়া হতো নবজাতক শিশুকে তান সন্তান হিসাবে সবাই মেনে নিতো।

চতুর্থত, বহুলোক একত্রিত হয়ে একজন মহিলার কাছে যেতো। সেই মহিলা কোন ইচ্ছুক পুরুষকেই বিমুখ করতো না বা ফিরিয়ে দিতো না। এরা ছিল পতিতা। এরা নিজেদের ঘরের সামনে একটা পতাকা স্থাপন করে রাখতো। এর ফলে ইচ্ছে মতো যে বিনা বাধায় তাদের কাছে যেতে পারতো। এ ধরনের মহিলা গর্ভবতী হলে এবং সন্তান প্রসব করলে যারা তার সাথে মিলিত হয়েছিল তারা সবাই হাযির হতো এবং একজন বিশেষজ্ঞকে ডাকা হতো। সেই বিশেষজ্ঞ তার অভিমত অনুযায়ী সন্তানটিকে কারো নামে ঘোষণা করতো। পরবর্তী সময়ে সেই শিশু ঘোষিত ব্যক্তির সন্তান হিসাবে বড় হতো এবং কখনো সে ব্যক্তি সন্তানটিকে অস্বীকার করতে পারতো না। রাসুলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের পর আল্লাহ তা'আলা জাহেলি সমাজের সকল প্রকার বিবাহ প্রথা বাতিল করে দিলেন এবং বর্তমানে প্রচলিত ইসলামী বিবাহ প্রথা প্রচলন করলেন।[৪১]

মোটকথা সামগ্রিক অবস্থা ছিল চরম অবনতিশীল। মূর্খতা ছিল সর্বব্যাপী। নোংরামী, পাপাচার ছিল চরমে। মানুষ পশুর মতো জীবন যাপন করতা। মহিলাদের বেচাকেনার নিয়ম প্রচলিত ছিল। মহিলাদের সাথে অনেক সময় এমন আচরণ করা হতো যেন তারা মাটি অথবা পাথর। পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল দুর্বল। সরকার বা প্রশাসন নামে যা কিছু ছিল তা প্রজাদের নিকট থেকে অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করে কোষাগার পূর্ণ করার কাজে এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশের কাজে নিয়োজিত থাকতো।

(২) কন্যা সন্তানের জীবন্ত সমাধি: প্রাক ইসলামী যুগে আরবরা কন্যা সন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্য ও লজ্জাকর মনে করত। কখনো কখনো নিষ্ঠুরতার বশবর্তী হয়ে এ সকল নিস্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। তাদের এ নীতিজ্ঞান বর্জিত ও গর্হিত কাজের উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

অর্থাৎ, "যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্য করা হল?।"[৪২] আল্লাহ তা'আলা অপর আয়াতে বলেন:

---

৪১. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু ওজনু নিকাহ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), খ. ২, পৃ. ৭৬৯

৪২. আল-কুর'আন, ৮১ : ৯

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

অর্থাৎ, "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।"[৪৩]

(৩) দাসদাসীদের অবস্থা: স্মরণাতীতকাল থেকেই আরবে দাসত্বপ্রথা চালু ছিল। দাসদাসীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। মনিবরা তাদেরকে পণ্য-দ্রব্যের মতো বাজারে কেনা-বেচা করতো। দাসদাসীকে নির্মমভাবে কাজে খাটাত ও নির্যাতন করত। তদের জীবন মৃত্যু প্রভুর মর্জির ওপর নির্ভর করত। বিয়ে শাদীর অধিকারটুকুও তাদের জন্য ছিল না।

(৪) অভিশপ্ত সুদ প্রথা: শোষণের অন্যতম হাতিয়ার সুদ প্রথাও আরবে চালু ছিল। লোকেরা মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর চক্র বৃদ্ধি সুদের যাতাকালে নিষ্পেষিত হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্বে পরিণত হতো। সুদ পরিশোধ করতে না পারলে ঋণ গ্রহিতার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে তাঁর স্ত্রী পুত্রকেও দখল করা হতো।

২.১.১৮ জাহিলী যুগের রাজনৈতিক অবস্থা

আরব ভূখণ্ডের উপর তদানীন্তন বিশ্বের দু' সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রোমের বাইজেন্টাইন ও পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। উত্তর আরব রোমানদের এবং দক্ষিণ আরব ছিল পারসিকদের প্রভাব বলয়ে। ইয়েমেনের হিমাইরী রাজ্য দখলাকারী আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টান শাসক আবরাহা মহানবী (স.) এর জন্মের কিছুদিন আগে এক বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমণ করে, কুর'আনুল কারীমে সুরা আল ফিলে আবরাহা বাহিনীর করুণ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে।"[৪৪]

(১) নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র: ইসলাম-পূর্ব জাহিলী যুগটি ছিল নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগ। এই রাজতন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল নির্দিষ্ট বংশ বা পরিবারভিত্তিক যেমনটি ছিল ইরানে। সেখানে সাসানী পরিবারের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল, হুকূমতের ওপর তাদের অধিকার জন্মগত এবং তা খোদায়ী সমর্থনপুষ্ট। সার্বিক প্রয়াসের দ্বারা প্রজা সাধারণের মনেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তারাও নির্বিবাদে তা মেনে নিয়েছিল এবং হুকুমত সম্পর্কে তাদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যাতে কখনই ফাটল ধরত না।

---

৪৩. আল-কুর'আন, ১৭ : ৩১

৪৪. আল-কুর'আন, ১০৫ : ১-৫

(২) গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থা: গোত্রীয় শাসনের কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি তাদের মধ্যে ছিল না। তবে শূরা বা পরামর্শ সভার মতানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা সে যুগে অপরিহার্য ছিলো। বিচার, সমর, এবং অন্যান্য বিষয়ে গোত্রপ্রধান গোত্রের সর্বময় কর্তা ছিলেন না। গোত্রীয় প্রধানগণ যেমন শূরার সাহায্যে শাসনকার্য চালাতেন তেমনি মক্কার প্রধানগণ পরামর্শের সাহায্য নিয়ে শাসনকার্য চালাতেন। ছোট-খাট সমস্যাগুলো দারুন নদওয়াতে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হতো।

(৩) রাজনৈতিক অনৈক্য: জাহিলী যুগে আরবদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য বলতে কিছুই ছিল না। রাজনৈতিকভাবে গোটা আরব ছিল শতধা বিভক্ত। রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ছিল তাদের নিত্যসাথী। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুপস্থিতিতে দক্ষিণ আরবে সাবা, মিনীয়, কাতাবনীয়, উত্তর আরবে নেবাতীয়, পালমীরা, হিরা, গাসসান, লাখমিদ এবং মধ্য আরবের কিন্দা রাজ্য সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করে।

(৪) গোত্রে গোত্রে সংঘাত: স্বগোত্রীয় সদস্যদের প্রতি আরবরা যেমন ছিল সহানুভূতিশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন ঠিক তেমনি শত্রুপক্ষের প্রতিও তাঁরা অনুরূপ শত্রুতা পোষণ করতো। ঐ সময়ে আরবদের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা চীন ও রোম রাজ্যের সাথে তুলনা করা যায়। চীনারা তাদের সম্রাটকে ঈশ্বর-পুত্র বা স্বর্গ বলত। লোকে সম্রাটকে বলত আপনি আমাদের মা-বাপ। সার্বভৌম ক্ষমতা বা শাসন ক্ষমতাকে কখনো বা কোন বিশেষ গ্রুপ, দল বা নির্দিষ্ট দেশের অধিকার মনে করা হতো। সেখানে রোমকরা নিজেদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আর অন্যদেরকে দাস মনে করত। তদ্রূপ আরবরাও নিজেদের সম্রাটকে প্রভু বলত, আর অন্য কোন সম্রাটকে তোয়াক্কা করত না। আর এ বিশ্বাস ছিল তাদের মজ্জাগত। রোম সাম্রাজ্য ও চিন সাম্রাজ্য ঐ সময়ে পৃথিবীর নেতৃত্বদানকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। কিন্তু অধিক অহংকারের কারণে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে আরবদের মতো বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয়। রবার্ট ব্রিফল্ট রোমক সাম্রাজ্য সম্পর্কে বলেন,

The intrinsic cause that doomed and condemned the Roman Empoire was not any growing corruption, but the corruption, the evil, the inadaptation to fact in its very origin and being. No system of human organization that is false in its very principle. in its very foundation, can save itselp by any amount of cleverness and efficiency in the means by which that falsehood is carried out and maintained , by anyamount of superficial adjustment and tinkering. it is doomed root and branch as long as the root remains what it was. the Roman Empire was, as we have seen,a device for

the enrichment of a small class of people by the explotation of mankind. that business enterprise was carried out with all honesty. all the fairness and justice compatible with its very nature, and with admirable judgement and ability. But all those virtues could not save the fundamental falsehood, the foundamental wrong from its consequence.

অর্থাৎ, "রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও পতনের কারণ কেবল সেখানকার ক্রমবর্ধমান অন্যায় ও দুর্নীতির সয়লাবই ছিল না, বরং এর মৌলিক কারণ ছিল ফিতনা-ফাসাদ, অন্যায়-অরাজকতা ও বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া ও উপেক্ষা করার প্রবণতা যা এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও লালন-পালনের পয়লা দিন থেকেই বিদ্যমান ছিল। আর এই খারাবীটা সাম্রাজ্যের ভিতর গভীরভাবে শেকড় গেড়ে বসেছিল। কোন মানব সমাজ ও মনুষ্য দলের বিনির্মাণ যখন এ ধরনের দুর্বল ভিত্তির উপর করা হয় তখন কেবল মেধা ও কর্মতৎপরতা এর পতন রোধ করতে পারে না। যেহেতু মন্দের উপরই এই সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ ছিল সেজন্য এর অবসান ও অধঃপতন ও ছিল অনিবার্য। কেননা আমরা জানি, রোমক সাম্রাজ্য কেবল একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আরাম-আয়েশ ও বিলাশ-ব্যসনের মাধ্যম ছিল। প্রজাসাধারণ থেকে অবৈধ স্বার্থ হাসিল এবং তাদের রক্ত চুষে রাজতন্ত্রের প্রতিপালনই ছিল এই হুকুমতের কাজ। নিঃসন্দেহে রোমান সাম্রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ইনসাফ, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথেই চলছিল এবং এই সাথেই চলছিল এবং এই বিষয়টিকে হুকুমতের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বলে মনে করা হতো। আর একথাও অনস্বীকার্য, হুকুমত তাঁর শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যাতার ক্ষেত্রে, অধিকন্তু তাঁর প্রশংসনীয় বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ছিল অনন্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই সব গুণ হুকুমতকে না পারত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে আর না পারত বুনিয়াদী গলদগুলোর কঠোর কঠিন পরিণতি থেকে রক্ষা করতে।"[৪৫]

২.১.১৯ আরবদের অর্থনৈতিক অবস্থা

আরব উপদ্বীপের ভূপ্রকৃতি দেশবাসীর অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছিলঃ কৃষি, পশু পালন। মরুময় আরবের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা তাদের অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল ছিল।

---

৪৫. Robert Brifault, *The making of Humanity* (London : G.Allen & Unwin ltd, 2001), p. 159

(১) মক্কাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড: মক্কায় প্রাক-ইসলামি যুগে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করে। জাহিলী যুগে মক্কা আরব ভূখণ্ডের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। মক্কা অর্থনৈতিক বাণিজ্যর ক্যারাভান রুট হওয়ায় এখানকার অধিবাসীরা সিরিয়া, ভারত, চীন, ও পারস্যের সাথে বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো। মক্কার সন্নিকটে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত উকাজ মেলায় বিপুল পরিমাণ পণ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হতো। আর এতে বেশির ভাগ লাভবান হতো মক্কাবাসীরা। হজ্জ মওসুমের বেচা-কেনার সুফল ও মক্কাবাসীরাই পেতো। এসব কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে মক্কা বিশেষ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে।

(২) তায়েফকেন্দ্রিক ব্যবসা কেন্দ্র: সে সময় তায়েফ শহরও যথেষ্ট উন্নত ছিল। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য তায়েফে খাদ্যশস্য, ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। এখানকার আতর ছিল বিশ্ববিখ্যাত এবং এ আতর বিপুল পরিমাণ রপ্তানি হতো। ছয় হাজার ফুট উচূতে অবস্থিত তায়েফ আরবের বিত্তশালীদের গ্রীষ্মকালীন আবাসে পরিণত হতো।

(৩) ব্যবসা সম্পর্কিত নীতিমালা: প্রাক-ইসলামি আরবে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কতকগুলো আদর্শ আইন-কানূন প্রচলিত ছিলো। মুদারাবা ও মুশারাকা কারবার তখন চালু ছিল। আরবরা সমবায়ের ভিত্তিতে বাণিজ্য করতো। মাল তালিকা করে মক্কার দারুন নদওয়া গোত্র বাণিজ্য কাফেলা যাত্রা শুরু করতো। বাণিজ্য শেষে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় দারুন নদওয়াতে হাজির হয়ে লভ্যাংশ সকল অংশীদার হিসেব মতো ভাগ করে নিত।

(৪) যাযাবর বেদুঈন: বেদুঈন আরবদের অর্থনৈতিক জীবন ছিল অনিশ্চিত ও দুর্দশাগ্রস্ত। পশু চরিয়ে অতি কষ্টে যাযাবর বেদুঈনরা জীবিকা নির্বাহ করত। দারিদ্র্যই তাদেরকে যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। তাদের অর্থনৈতিক জীবন ছিল নীতি বহির্ভূত। লুটতরাজ, ডাকাতি, পশু পালনের মাধ্যেমে তাদের জীবিকা নির্বাহ হতো।

(৫) বহির্বাণিজ্যে মদিনার অবস্থান: মদিনার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এর বাণিজ্যিক গুরুত্বকে বৃদ্ধি করেছিল। কারণ, মক্কার প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত মদিনা ইয়েমেন হতে সিরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত বাণিজ্যপথের সাথে সংযুক্ত ছিলো। ভূমির উর্বরতার জন্য মদীনার প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। সে সময় খেজুর এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকারী ফসল ছিল।

২.১.২০ জাহিলী যুগে আরবদের সাংস্কৃতিক অবস্থা

প্রাক ইসলামী যুগে আরবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি অথবা সুরুচিপূর্ণ ও মার্জিত জীবনধারা গড়ে উঠেনি। মক্কা, মদিনা, তায়েফে কয়েকটি বর্ধিষ্ণু শহর ব্যতীত আরবের অধিকাংশ লোকই ছিল মূর্খ ও নিরক্ষর। তা সত্ত্বেও তাদের অসাধারণ সৃজনশীল শক্তির প্রভাবে লোকগাথা, প্রবাদ ও লোকশ্রুতি সংরক্ষিত হয়েছিল। প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অপূর্ব বাগ্মিতার জন্য তাঁরা ইতিহাসে সুখ্যাতি অর্জন করে।

(১) গীতিকাব্য ও সাহিত্য চর্চা: শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাক ইসলাম যুগে আরবগণ আধুনিক যুগের ন্যায় উন্নত, মার্জিত ও সুরুচিপূরণ না হলেও তাঁরা এ কার্যকলাপ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল না। গীতিকাব্য রচনা ও সাহিত্য চর্চায় আরবদের অসাধারণ সৃজনশীল মেধাশক্তির পরিচয় মেলে। এ প্রসঙ্গে P. K. Hitti বলেন, সম্ভবত পৃথিবীতে অন্য কোনো জাতি আরবদের ন্যায় সাহিত্য চর্চায় এত স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ প্রকাশ করেনি।[৪৬]

(২) কাব্যপ্রীতি: ভাষা চর্চা, কবিতা রচনা ও সাহিত্যে তৎকালীন আরবদের বিশেষ প্রতিভা ছিল। নারী-পুরুষ সকলেরই প্রবল ভাষাপ্রীতি ও কাব্যপ্রীতি ছিল। এ প্রসঙ্গে P.K Hitti বলেন, কাব্যপ্রীতিই ছিল আরব বেদুইনদের সাংস্কৃতিক সম্পদ।"[৪৭]

(৩) উকায মেলা: ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনে উকায মেলা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান। প্রতিবছরই এ মেলা অনুষ্ঠিত হতো এবং সেখানে কাব্য প্রতিযোগিতা চলত। এর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতা নির্বাচন করা হতো এবং পুরষ্কৃত করা হতো শ্রেষ্ঠ কবিদের। এ মেলাকে ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি Accademic Francaise of Arabos বলে অভিহিত করেছেন।

(৪) স্থাপত্যকলা, শিলালিপি ও মুদ্রা: প্রাক-ইসলাম যুগে আরব দেশের উত্তর ও দক্ষিণাংশের কতিপয় সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল স্থাপত্যশৈলীর চরম নিদর্শন। সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বিভিন্ন শিলালিপি এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়।

২.১.২১ বিশ্বব্যাপী অন্ধকার

মোদ্দাকথা, এই ঈসায়ী ৭ম শতাব্দীতে সমগ্র পৃথীবিতে এমন কোন জাতিগোষ্ঠী দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না যাদেরকে সুরুচিসম্পন্ন বলা যায়। সে যুগে না ছিল কোন কোন উচ্চ মূল্যবোধের ধারক-বাহক কোন সমাজ, না ছিল এমন কোন হুকুমত যার বুনিয়াদ ন্যায় নীতি ও প্রেম প্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এমন প্রতিভাবান কোন নেতৃত্ব ছিল না এবং এমন কোন ধর্ম ছিল না যা সহীহশুদ্ধ এবং আম্বিয়া-ই কিরাম এর দিকে সহীহভাবে সম্বন্ধযুক্ত আর তাঁদের শিক্ষামালা ও সমূহ বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক। এই ঘনঘোর অন্ধকার মাঝে কোথাও কোন ইবাদাতগাহ ও খানকাহর মাঝে কখনো যদিও বা যৎসামান্য আলোক-রশ্মি চোখে পড়ত তার অবস্থাও ছিল এমন যেন বর্ষাঘন অন্ধকার রাত্রে জোনাকির আলো। সহীহ ইলম ও বিশুদ্ধ আমল এত দুর্লভ ও দুস্পাপ্য ছিল এবং আল্লাহর সোজা-সরল রাস্তার সন্ধান দানকারীর

---

৪৬. Philip Khuri Hitti, *History of the Arabs* (London: Palgrave Macmillan, 10th Edition, 2002), p. 17

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

সাক্ষাৎ কদাচিৎ মিলত যে, ইরানের বুলন্দ হিম্মত, অস্থির ও চঞ্চল প্রকৃতির যুবক সালমান ফারেসী যিনি আপন জাতিগোষ্ঠী ও বংশীয় ধর্ম থেকে অতৃপ্ত ও নিরাশ হয়ে সত্যের সন্ধানে ইরান থেকে শুরু করে সিরিয়ার শেষ সীমান্ত অবধি দীর্ঘ ও বিস্তৃত ভূভাগ চষে ফিরে মাত্র চারজন মানুষ এমন পেয়েছিলেন যাঁদের থেকে তাঁর অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্ত ও অশান্ত হৃদয় প্রশান্তি লাভ করেছিল এবং যারা তাঁদের নবী-রাসূলদের কথিত ও প্রদর্শিত পথের ওপর কায়েম ছিলেন।"[৪৮]

বিশ্বব্যাপী এই অন্ধকার ও অরাজকতার যেই চিত্র কুরআন মাজীদ এঁকেছে এর থেকে সুন্দর চিত্র আঁকা আদৌ সম্ভব নয়।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থাৎ, "মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে ওদেরকে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে ওরা ফিরে আসে।"[৪৯]

২.২ মুসলিম জাতির উত্থান

প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তাঁর আনীত দ্বীনই ছিল ইসলাম এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দ্বীনে মুহাম্মদীই ইসলাম নামে পরিচিত হয়েছে যা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। মূলত, মুসলিম জাতির উত্থান রাসূলুল্লাহ (স.) কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। মুসলিম জাতির উত্থান সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

২.২.১ রাসূলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাব

মানবতা যখন মরণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল, দুনিয়া তার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ধ্বংসের ভীতিপ্রদ ও গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হতে চলছিল ঠিক তখনই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (স.) কে ওহী ও রেসালাত সহ প্রেরণ করেন যাতে করে তিনি এই মুমূর্ষু মানবতাকে নব জীবন দান করেন এবং লোকদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন;

---

৪৮. হযরত সালমান ফারেসী (রা.) এর কাহিনী ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় এবং বর্ণনাকারীদের নিরিখে উৎরে যাবার দরুন তা ইতিহাসের এক অমুল্য সম্পদ ও দলীল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইমাম আহমেদ-এর মুসনাদ ও হাকেমের মুসতাদরাকে এর বিস্তৃত বিবরণ মিলবে।

৪৯. আল-কুর'আন, ৩০ : ৪১

الر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

অর্থাৎ, "আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি-যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন–পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে।"[৫০]

তিনি মানব জাতিকে কেবল এক আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহ্বান জানান এবং দুনিয়ার যাবতীয় বন্দেগী ও দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি দেন। তিনি জীবনের প্রকৃত নেয়ামতরাজি পুনর্বার তাদেরকে দান করেন এবং সেই লৌহ শৃঙ্খল ও বেড়ি থেকে তাদের মুক্ত করেছিলেন যা তারা অপ্রয়োজনে নিজের উপর ফেলে রেখেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন;

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ, "তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল।"[৫১]

তাঁর আবির্ভাব মানব জাতিকে নব জীবন, নতুন আলোক-রশ্মি, নবতর শক্তি, নতুন উত্তাপ, নতুন ঈমান, নবতর প্রত্যয়, নতুন বংশধারা, নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতি, নতুন সমাজ দান করে। তাঁর আগমনে দুনিয়ার নতুন ইতিহাস ও মানব জাতির কর্মের নব জীবনের সূত্রপাত হয়। কেননা আত্মবিস্মৃতি ও আত্মহত্যার ভেতর যেই যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে তা ধর্তব্য নয়। চক্ষুষ্মান ও অন্ধ এবং জীবিত ও মৃতকে এক পাল্লায় রাখা চলে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (٢٠) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (٢١) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ

অর্থাৎ, "দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়। সমান নয় অন্ধকার ও আলো। সমান নয় ছায়া ও তপ্তরোদ। আরও সমান নয় জীবিত ও মৃত।"[৫২]

---

৫০. আল-কুর'আন, ১৪ : ১
৫১. আল-কুর'আন, ৭ : ১৫৭
৫২. আল-কুর'আন, ৩৫ : ১৯-২২

২.২.২ মানবতার সমস্যার সঠিক সমাধান

নবী কারীম (স.) আল্লাহ তা'আলার পথ-নির্দেশনাধীনে দাওয়াত ও সংস্কার সংশোধনের কাজ সহীহ রাস্তায় শুরু করেন। তিনি মানব স্বভাবের তালায় সঠিক চাবি লাগান। এ ছিল সেই তালা যা খুলতে সে যুগের সমস্ত সংস্কারক ছিলেন ব্যর্থ। তিনি মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহর ওপর ঈমান আনার, তাঁর সত্তায় বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন এবং বাতিল তথা মিথ্যা উপাস্য দেবদেবী সমূহকে প্রত্যাখ্যান করতে বললেন। সেই সঙ্গে তাগুত অমান্য করতে নির্দেশ দান করেন। লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে সজোরে উচ্চ কণ্ঠে তিনি বলেন, يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا অর্থাৎ, "হে লোকসকল! তোমরা বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতিরেকে কোন ইলাহ নেই)–সফলতা লাভ করবে।" [৫৩]

২.২.৩ প্রথম দিককার মুসলিমগণ

কুরায়শরা এই দাওয়াত ও আহ্বানের মুকাবিলায় হাঁটু গেড়ে বসে এবং জাহিলিয়াতের পতাকাতলে সমবেত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তারা তাঁর বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে আগুন জালিয়ে দেয় এবং ইসলামের রাস্তা আটকে দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন তথা বিশ্বাস স্থাপন সেইসব সিংহদল পুরুষ সিংহরই কাজ ছিল যারা মৃত্যু ভয়ে ভীত নন, যারা আপন ঈমান ও আকীদার নিমিত্তে অগ্নিকাণ্ডের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং জলন্ত অঙ্গারের ওপর শুয়ে পড়তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যারা দুনিয়ার সর্বপ্রকার লোভ-লালসা থকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং সারা দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। কুরায়শদের কতিপয় যুবক সামনে অগ্রসর হলো। এ তড়িঘড়ির ফয়সালা ছিল না এবং যুবকসুলভ ঝোঁকের মাথায় গৃহীত পদক্ষেপও ছিল না। তারা মনে করতেন, তাঁরা তাঁদের জীবনকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করেছেন এবং জীবনের দরজা নিজেদের জন্য বন্ধ করে দিচ্ছেন। পার্থিব কোন প্রলোভন এর পেছেন ক্রিয়াশীল ছিল না, বরং এই ফয়সালা ছিল কেবল বিপদের দরজা খোলার সমর্থক এবং এর ফলে সর্ব প্রকার পার্থিব স্বার্থ ও আরাম-আয়েশের দরজা বন্ধ করার নামান্তর। এখানে ছিল কেবল ইয়াকীন ও প্রত্যয়ের এক শক্তি এবং পরকালীন জীবনের লোভ। তাঁরা ঈমানের দিকে আহ্বানকারীদের এই বলে আহ্বান করতে শুনতে পেয়েছিলেন: তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের ওপর ঈমান আন।

এই আহ্বান শুনতেই বিশাল পৃথিবী তাঁদের জন্য সংকীর্ণ ও সঙ্কুচিত হয়ে গেল। স্বভাব-তবিয়ত পিষ্ট হতে থাকল। রাতের ঘুম গেল উঠে। নরম-কোমল বিছানা কণ্টক শয্যার ন্যায় খচখচ করে বিধতে লাগল। তাঁরা দেখল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা ও

---

৫৩. জাহের ইবনে তাহির ইবনে মুহাম্মদ আশ-সাহামী, *আস-সাবায়িয়াতুল আলাফ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১) হাদীস নং, ১৫৪, পৃ. ৮৬

নিজের ঈমানের সাথী হওয়া তাঁদের জন্য অপরিহার্য হয়ে গেছে। তাঁরা তাঁদের দিল ও দিমাগের তথা মন-মস্তিষ্কের ফয়সালা এবং আপন বিশ্বাসের বিরোধিতা করে সন্তুষ্ট থাকতে পারত না। প্রকৃত সত্য কোনটি তা তাঁদের সামনে দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল। এখন আর তারা সেই সত্য এড়িয়ে যেতে পারত না। সিরিয়া ও ইয়ামেনে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যাওয়া এতটা কঠিন ও কষ্টসাধ্য ছিল না যতটা মক্কার ভেতর মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত পৌছা ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করা ছিল কষ্টকর। কিন্তু তাঁরা তাঁর কাছে গেল, তাঁর হাতে হাত মেলালো এবং নিজেদের জীবন তাঁর হাতে তুলে দিল, তাঁকে সোপর্দ করল। তাদের জীবনের ভয় ছিল, ভয় ছিল পরীক্ষার সম্মুখীন ও কষ্টের মুখোমুখী হবার। কিন্তু তাঁরা কুরআন শরীফের এই আয়াত শুনেছিল:

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

অর্থাৎ, "মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাঁদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।"[৫৪]

শেষ পর্যন্ত কুরায়শদের কাছ থেকে যা আশংকা করা গিয়েছিল তাই সামনে এসে দেখা দিল। কিন্তু সাহাবীদের ঈমানী দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের মজবুতী এতে আরও বৃদ্ধিই পায়। তাঁরা বলতে থাকে, এই ওয়াদাই তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল আমাদের সঙ্গে করেছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) সত্যিই বলেছিলেন, এতে তাঁদের ঈমান ও আনুগত্য বৃদ্ধিই পেল। এসব পরীক্ষার ফলে তাঁদের বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ়, তাঁদের প্রত্যয় আরও মজবুত, তাঁদের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতি আরও উন্নত হয় এবং তাঁদের ঈমানে অধিকতর স্বাদ ও মিষ্টতা সৃষ্টি হয়। তাঁদের স্বভাব-চরিত্রে আরও পরিচ্ছন্নতা ও ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা এই অগ্নিকুণ্ড থেকে খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে আসেন।

২.২.৪ সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর ঈমানী প্রশিক্ষণ

এরই সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁদের কুরআন পাকের রূহানি খোরাক সরবরাহ করে যাচ্ছিলেন এবং ঈমানের মাধ্যমে তাঁদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের দৈহিক পাক-পবিত্রতা ও অন্তরের ভয়-ভক্তিমিশ্রিত বিনয় শেখাতেন এবং আল্লাহ্‌কে সর্বত্র হাজির-নাজির জ্ঞানে প্রত্যহ পাঁচবার তাঁরই সমীপে মাথা ঝোকাতেন। তাঁদের মধ্যে উত্তরোত্তর রূহানিয়াত

৫৪. আল-কুর'আন, ২৯ : ২-৩

তথা আধ্যাত্মিকতার সমুন্নতি, দিলের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি, প্রবৃত্তি পূজা থেকে মুক্তি লাভ ইত্যাদি অর্জিত হচ্ছিল। আসমান-যমীনের মালিকের প্রতি ইশক ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি তাঁদেরকে দুখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ, ক্ষমাশীলতা ও আত্মসংযমের শিক্ষা দিতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁদের অস্থিমজ্জায় মিশে ছিল। তলোয়ারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁদের মজ্জাগত। তাঁরা ছিলেন সে সব গোত্র ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত যাঁদের ইতিহাস 'বসূস', 'দাহিস', 'গাবিয়া' প্রভৃতি রক্তাক্ত কাহিনী দ্বারা ভরপুর। 'ইয়াওমুল ফিজার'–এর রক্তাক্ত যুদ্ধের স্মৃতি তখনো অম্লান রয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁদের সেই সামরিক স্বভাব প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন এবং তাঁদের আরবীয় অহংবোধকে ঈমানি শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছিলেন। তিনি তাঁদের বলতেন, كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ অর্থাৎ, "তোমাদের হাত সংবরণ কর, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাকো।"[৫৫] তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর হুকুমে মোমের মত হয়ে গিয়েছিলেন। সামান্যতম কাপুরুষতা না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা সব কিছুই বরদাশত করেছিলেন দুনিয়ার কোন সম্প্রদায় কিংবা জাতিগোষ্ঠী যা বরদাশত করেনি। ইতিহাস এমন একটি ঘটনাও পেশ করেনি যেখানে কোন মুসলিম নিজের পক্ষ থেকে আক্রমণ করেছে কিংবা জিঘাংসার আশ্রয় নিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এ এক অনন্য উদাহরণ!

২.২.৫ মদীনাতুর রাসূল (স.)

কুরায়শরা যখন সীমা অতিক্রম করল তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও তাঁর সাহাবাদেরকে হিজরত তথা দেশত্যাগের অনুমতি দিলেন। তাঁরা ইয়াসরিবে হিজরত করলেন যেখানে ইসলাম ইতিপূর্বেই পৌছে গিয়েছিল।

মক্কা থকে আগত মুহাজিররা ইয়াসরিবের লোকদের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিলন, অথচ এদের মধ্যে কেবল এই নতুন ধর্ম ছাড়া অন্য কোন যোগসূত্র ছিল না। ইতিহাসে ধর্মের শক্তি ও প্রভাবের এটিই একক ও অসাধারণ দৃষ্টান্ত। ইয়াসরিবের আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে রাসূল (স.) প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি করলেন। এই সন্ধি-সমঝোতার জন্য যদি কোন লোক দুনিয়ার তাবৎ সম্পদও ব্যয় করত তবুও তাঁর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। নবী (স.) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এই ভ্রাতৃ-সম্পর্ক এমনই মজবুত সম্পর্কের রূপ নেয় যার সামনে রক্তের সম্পর্ক ও নিস্প্রভ এবং দুনিয়ার তাবত বন্ধুত্বই তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। ইতিহাসে এ ধরনের নিঃস্বার্থ প্রীতি ও ভালোবাসার দ্বিতীয় নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না।

---

৫৫. আল-কুর'আন, ৪ : ৭৭

মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারসম্বলিত এই নবোত্থিত জামাতটি ছিল এক বিশাল ইসলামী উম্মাহর বুনিয়াদ। এই জামাতের আবির্ভাব এমন এক কঠিন সংকট সন্ধিক্ষণে হয় যখন দুনিয়া জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোল খাচ্ছিল। এই জামাত একত্রিত হয়ে সেই সব বিপদ দূর করতে সাহায্য করলো যা রাসূল (স.) এর সামনে ছিল। এই জামাতের আবির্ভাব পুনরায় মানব জাতির দৃঢ় অস্তিত্বের স্বার্থে অপরিহার্য ছিল। এজন্যই আল্লাহ আ'আলা যখন আনসার ও মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির ওপর জোর দিলেন তখন বলেছিলেন;

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

অর্থাৎ, "যদি তা না কর তাহলে ধরাপৃষ্ঠে বিরাট ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় দেখা দেবে।"[৫৬]

২.২.৬ সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর ঈমানী পূর্ণতা

এদিকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নেতৃত্বে ও দিক নির্দেশনায় সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর ঈমানী প্রশিক্ষণ ও পূর্ণতার সিলসিলা অব্যাহত থাকে। কুরআনুল কারীম অব্যাহতভাবে তাঁদের হৃদয়ে উত্তাপ সঞ্চার করতে ও শক্তি জোগাতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর বৈঠক থেকে তাঁদের দৃঢ়তা ও সংহতি, প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেযামন্দীর সত্যিকার কামনা এবং এ পথে নিজেদের মিটিয়ে দেবার অভ্যাস, জান্নাতের প্রতি অনুরাগ, ইলম তথা জ্ঞানের প্রতি লোভ ও আকর্ষণ এবং দীনের সমঝ ও আত্মজিজ্ঞাসার ন্যায় সম্পদ লাভ ঘটে। তাঁরা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.) এর আনুগত্য করতেন। যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

এসব লোক রাসুল (স.) এর সাথে দশ বছরে সাতাশ বার জিহাদের জন্য বেরিয়েছেন এবং তাঁর হুকুমে শতাধিক অভিযানে গমন করেছেন। তাঁদের পক্ষে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীনতা খুবই সহজসাধ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। পরিবার-পরিজনের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ সহ্য করায় তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

কোন বিষয়ে রাসূল (স.) যখন কোন সিদ্ধান্ত দিতেন, তখন তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য পর্যন্ত হত না। এঁরা ছিলেন সেই সব লোক যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের গোপন ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা অকপটে স্বীকার করেছেন এবং কখনো হদযোগ্য পদস্খলনে লিপ্ত হলে নিজেদের দেহকে হদ ও শাস্তির জন্য পেশ করে দিয়েছেন। তাঁরা বিপদ-আপদে যেমন ঘাবড়িয়ে যেতেন না, তেমনি কোন নেয়ামত বা অনুগ্রহ পেয়েও ফুলে উঠতেন না। দারিদ্র্য তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। সম্পদ তাঁদের ভেতর নাফরমানীকে উসকে দিতে পারত না। ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁদের গাফিল বা অলস বানাতে পারত না। কোন

৫৬. আল-কুর'আন, ৮: ৭৩

শক্তিকেই তাঁরা ভয় পেতেন না। প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালীই হোক তাতে দমে যেতেন না। ইনসাফের ছিলেন তাঁরা পতাকাবাহী। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সাক্ষী ছিলেন আর সাক্ষ্য স্বয়ং তাঁদের নিজেদের বিরুদ্ধে গেলেও, এমন কি পিতামাতা ও আত্মীয়-বান্ধবের বিপক্ষে হলে ও তাঁরা বিন্দুমাত্রা পরওয়া করতেন না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর গোটা যমিনকেই তাঁদের পদতলে নিক্ষেপ করলেন এবং সমগ্র পৃথিবী তাঁদের করতলে সমর্পণ করলেন। তারা তখন গোটা পৃথিবীরই মুহাফিজ ও আল্লাহর দীনের দাঈ-তে পরিণত হলেন। আল্লাহর রাসূল (স.) তাঁদেরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত বানালেন এবং নিজে তৃপ্তি ও প্রশান্তির সঙ্গে রিসালাত ও উম্মতের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর রফীকে আ'লা তথা পরম বন্ধুর ডাকে সাড়া দিলেন।

২.২.৭ ইতিহাসের আশ্চর্যতম বিপ্লব ও এর কারণ

মুসলমানদের স্বভাবুচরিত্রে এই যে বিরাট বিপ্লব যা রাসূলুল্লাহ (স.) এর বরকতময় হাতে সাধিত হলো এবং মুসলমানদের দ্বারা মানব সমাজে সংঘটিত হলো–ইতিহাসের বুকে এ ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই বিপ্লবের প্রতিটি বস্তুই ছিল একক ও অনন্য। এর দ্রুততা, এর গভীরতা, এর বিশালতা ও সর্বজনীনতা, এর বিস্তৃতি ও মানবীয় উপলব্ধির কাছাকাছি হওয়া–এসবই ছিল সেই বিস্ময়কর ঘটনার অনন্য দিকসমূহ। এই বিপ্লব অপরাপর অলৌকিক ঘটনার ন্যায় কোন জটিল বিষয় ও দুর্বোধ্য হেঁয়ালি ছিল না। জ্ঞানগত পন্থায় এই বিপ্লব সম্পর্কে গবেষণা করা যায়। মানব ইতিহাসে ও মানব সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কে অধ্যয়ন করা উচিত।

২.২.৮ ঈমান ও এর প্রভাব

আরব-অনারব নির্বিশেষে সকলেই অত্যন্ত বিকৃত জীবন যাপন করছিল। এমন প্রতিটি সত্তা যা তাঁর সেবার জন্য পয়দা করা হয়েছিল, অস্তিত্ব লাভ করেছিল কেবল তার জন্য এবং যা ছিল তারই অধীন, যেভাবে চাইবে ব্যবহার করবে, আদেশ-নিষেধ, শাস্তি দান কিংবা পুরস্কার প্রদানের একবিন্দু ক্ষমতা নেই যার–সে সবের তারা পূজা-অর্চনা করতে শুরু করেছিল। তারা একেবারেই ভাসাভাসা ও বিক্ষিপ্ত একটি ধর্মে বিশ্বাসী ছিল, জীবন-যিন্দেগীতে যার কোন প্রভাব কিংবা তাদের স্বভাব-চরিত্রে, হৃদয় ও মনে ও আত্মার ওপর যার কোন ক্ষমতা ছিল না।

আল্লাহ তা'আলার ওপর তাদের ঈমান এক ঐতিহাসিক অবহিতির চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। আল্লাহ্কে প্রভু-প্রতিপালক মনে করা, তাকে আসমান-যমীনের স্রষ্টা মানতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

মুসলিম উম্মাহ ও আরব জাতিগোষ্ঠী এই অসুস্থ, অস্পষ্ট ও নিষ্প্রাণ পরিচিতির আবহ থেকে বেরিয়ে এমন এক সুস্পষ্ট ও গভীর আকীদা-বিশ্বাস অবধি গিয়ে পৌছে যার নিয়ন্ত্রণ ছিল

হৃদয়-মন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর, যা সমাজকে প্রভাবিত করার মত জীবন-যিন্দেগী ও জীবনের নানা অনুষঙ্গের ওপর জেঁকে বসেছিল। ঐ সব লোক এমন এক পবিত্র সত্তার ওপর ঈমান এনেছিলেন। যার রয়েছে সর্বোত্তম নাম ও শান। তাঁরা এমন রাব্বুল আলমিনের উপর ঈমান এনেছিলেন যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু, কিয়ামত দিবসের নিরঙ্কুশ মালিক-মুখতার ও রাজাধিরাজ।

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থাৎ, "তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ন। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা' আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।"[৫৭]

এই গভীর, বিশাল, বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট ঈমান দ্বারা ঐ সমস্ত লোকের মন-মানসিকতার আশ্চর্য রকমের পরিবর্তন ঘটে। কেউ যখন আল্লাহর ওপরে ঈমান আনত তাঁর জীবনে এক বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হতো। জাহিলিয়াতের বীজাণুগুলোকে খতম করে দিত এবং জড়ে মূলে উৎখাত করে ছাড়ত। মন-মস্তিস্ক এর ফয়েয দ্বারা মণ্ডিত হতো এবং সেই লোকটি আর পূর্বের ন্যায় থাকতো না।

২.২.৯ নতুন মানুষ নতুন উম্মাহ

এই বিস্তৃত ও গভীর ঈমান, এই শক্ত সুদৃঢ় পয়গম্বরসুলভ শিক্ষা, এই সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞ দার্শনিকসূলভ প্রশিক্ষণ, অন্যন্য ও অত্যাশ্চর্য শক্তি ও ব্যক্তিত্ব এবং এই বিস্ময় উদ্রেককারী আসমানী কিতাবের সাথে যার অনন্য ও বিরল বস্তুসমূহ নিঃশেষ হবার নয় এবং যার সজীবতায় কখনো ঘাটতি পড়ে না, রাসূলুল্লাহ (স.) মৃতপ্রায় মানবতার মাঝে এক নতুন জীবনের জন্ম দেন। মানবতার সেই সম্পদভাণ্ডার যা কাঁচামাল আকারে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছিল, সে সবের উপকারীতা, কল্যাণ ও ব্যয় খাত কারোরই জানা ছিল না। যেগুলোকে মূর্খতা, অজ্ঞতা, কুফর ও কম হিম্মতি বরবাদ করে রেখেছিল, তিনি তাঁদের জীবনের গতি

৫৭. আল-কুর'আন, ৫৯, ২২-২৪

পাল্টে দিলেন। জীবনের নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন। চাপাপড়া যোগ্যতা তুলে ধরলেন এবং অভ্যন্তরীণ সামর্থ্যকে উদ্ভাসিত করলেন। যে ছিল অনুভূতিশূন্য, নিশ্চল ও মৃত। এখন সে প্রাণ ফিরে পেয়ে বিশ্বের উপর রাজদণ্ড পরিচালনা করেছে। প্রথমে ছিল অন্ধ যে নিজেই রাস্তা চিনত না আর এখন সে সারা দুনিয়ার রাহবার ও পথ- প্রদর্শক হিসেবে মানুষকে পথ দেখাচ্ছে।

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون

অর্থাৎ, "আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে-সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনিভাবে কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে।"[৫৮]

নবী কারীম (স.) এর মনোযোগ ও শিক্ষার বদৌলতে আরবের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এমন বিপ্লব দেখা দিল যে, গোটা দুনিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাদের ভিতর সেই সব আজীমুশশান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটতে দেখল যারা ছিলেন যেমন বিস্ময়কর, তেমনি ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। সেই ওমর (রা.) যিনি এক সময় তাঁর পিতা খাত্তাবের বকরি চরাতেন আর তাঁর পিতা তাকে নানা কারণে বকাঝকা করতেন, শক্তি ও সংকল্পে তিনি কুরাইশদের মধ্যম সারির লোকদের অন্তর্গত ছিলেন, সেই ওমর (রা.) এক নিমিষে তৎকালীন বিশ্বকে নিজের মহাত্ম ও যোগ্যতা দ্বারা বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলেন এবং রোম সাম্রাট কায়সার ও পারস্য সম্রাট কিসরার রাজমুকুট ও রাজসিংহাসন ছিনিয়ে নেন এবং এমন এক ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কায়েম করেন যা একই সঙ্গে উল্লেখিত দুই হুকুমতের উপর পরিবেষ্টনকারী এবং প্রশাসনিক ও সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার রাখে। আর তাকওয়া, পরহেযগারী ও ন্যায় বিচারের দিক দিয়ে যিনি ছিলেন তুলনাহীন–প্রবাদ বাক্যের মত। খালিদ ইবন ওলীদ (রা.) তিনি ছিলেন উৎসাহদীপ্ত কুরায়শ যুবকদের অন্যতম। স্থানীয় যুদ্ধ গুলোতে সুনাম অর্জন করেছিলেন। অকস্মাৎ খোদায়ী তলোয়ার হিসেবে ঝলসে ওঠেন। যা কিছু সামনে আসে তিনি কেটে কুটে পরিষ্কার করে চলেন। আল্লাহর এই অবিনাশী তলোয়ার বিজলিবৎ রোম সাম্রাজ্যের মাথায় গিয়ে পড়ে এবং ইতিহসের বুকে অক্ষয় কীর্তি রেখে যায়।

আর এই যে, এঁরা হলেন, আবূ যর, মিকদাদ, আবুদ-দারদা, আম্মার ইবন ইয়াসীর, মুয়ায ইবন যাবাল ও উবাই ইবনে কাব (রা.)। ইসলামের বসন্ত সমীরণের একটা ঝটকা তাঁদের

৫৮. আল-কুর'আন, ৬ : ১২২

উপর দিয়ে বয়ে যেতেই দেখতে দেখতে তারা দুনিয়ার খ্যাতনামা সাধক ও জ্ঞানী-গুণী বলে গণ্য হতে থাকেন। এঁরা হলেন, আলী ইবন আবূ তালীব (রা.), আয়েশা (রা.), আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.), যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। যারা নিরক্ষর নবী (স.) এর কোলে লালিত-পালিত হয়ে দুনিয়ার মহান ও শ্রেষ্ঠতম আলেমদের কাতারে পরিণত হয়েছেন, যাঁদের থেকে জ্ঞানের নহর ও প্রজ্ঞার ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী, অশুভ লৌকিকতা থেকে দূরে তাঁদের অবস্থান। যখন কথা বলেন, তখন মহাকাল নিঃশব্দে নীরবে তাঁদের কথা শুনতে থাকে। যখন সম্বোধন করেন তখন দুনিয়ার বড় বড় ঐতিহাসিকদের কলম তা লিপিবদ্ধ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে যাতে করে একটি শব্দ ও হারিয়ে না যায়।

২.৩ মুসলিম জাতির যোগ্যতাসমূহ

আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং দুনিয়ার খলীফা হিসেবে ইসলাম মুসলমানদের যে অধিকার ও মর্যাদা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে তা এক অনবদ্য অধিকার ও মর্যাদার স্মারক। মুসলিম সমাজ ইসলামের অনুশাসন পালন করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ফলে তাঁদের যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। নিম্নে মুসলিমদের যোগ্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

২.৩.১ আমানত ও দিয়ানত

মুসলিমদের এই ঈমান ছিল মানুষের আমানত, সচ্চরিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রহরীস্বরূপ। নির্জনে ও জনসমাবেশে তথা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যেখানে দেখার মত কেউ থাকত না, এমন জায়গা যেখানে একজন মানুষের যা খুশি করবার পূর্ণ সুযোগ থাকে, যেখানে কাউকে ভয় করার কিংবা কারোর থেকে ভয় পাবার ছিল না, এই ঈমান প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও কামনা-বাসনার উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখত। ইসলামের বিজয়ের ইতিহাসের সততা, আমানতদারিতা ও ইখলাসের এমন সব ঘটনা বিদ্যমান যে, মানব ইতিহাসে এর নজির মেলা ভার। এ কেবল সুদৃঢ় ঈমান ও আল্লাহর ধ্যান এবং সর্বত্র ও সর্বক্ষণ তাঁর অবগতির চেতনারই ফসল ছিল।

ঐতিহাসিক তাবারী বর্ণনা করেন, "মুসলমানগণ যখন ইরানের রাজধানী মাদায়েনে পৌঁছল এবং মালে গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করতে লাগল তখন এক ব্যক্তি তাঁর সংগৃহীত ধন-রত্ন নিয়ে এল এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট সোপর্দ করল। লোকেরা বলল, এমন মূল্যবান সম্পদ আমরা কখনো দেখিনি। আমরা যা সংগ্রহ করেছি এর তুলনায় সেগুলোর কোন মূল্যই নাই। এরপর লোকে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এর থেকে কিছু রেখে আসনি তো? লোকটি আল্লাহর কসম খেয়ে বলল, ব্যাপারটা যদি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত না হতো তাহলে তোমরা

এ সবের কিছুই জানতে পারতে না। লোকেরা বুঝতে পারল, এ কোন মামুলি লোক নন। তারা তাঁর পরিচয় জানতে চাইল। লোকটি জানালো, আমি বলতে পারব না এজন্য যে, তোমরা আমার প্রশংসা করবে, অথচ সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য। তিনি এ কাজের জন্য যদি সওয়াব দিতে চান আমি কেবল তাতে রাজি। তিনি চলে গেলে তাঁর পরিচয় জানার জন্য তাঁর পিছনে একজন লোক পাঠানো হয়। জানা গেল তাঁর নাম আমের, তিনি আবদে কায়স গোত্রের লোক।"[৫৯]

২.৩.২ সৃষ্টিকুল ও প্রদর্শনীর প্রতি নিস্পৃহতা ও নিঃশঙ্কচিত্ততা

তৌহীদি আকিদা-বিশ্বাস তাঁদের মাথা উচু করে দিয়েছিল আর গর্দান করে দিয়েছিল উন্নত। গায়রুল্লাহ্‌র সামনে কিংবা অত্যাচারী বাদশাহর সামনে অথবা আলিম-উলামা, পীর দরবেশ কিংবা ধর্মীয় ও জাগতিক নেতৃত্তের অধিকারি কোন ব্যক্তির সামনে তাঁদের এই উন্নত গর্দান ও উন্নত মস্তক অবনমিত হবে এর কল্পনাও ছিল অসম্ভব। এই ঈমান ও ঈমানি চেতনা তাঁদের দিল ও দৃষ্টিকে আল্লাহ তা'আলার আজমত ও মাহাত্ম্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। সৃষ্টিকূলের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ, দুনিয়ার চিত্তভোলা দৃশ্য ও প্রতারণাকারী বস্তুসমুহ ও শান-শওকতের প্রদর্শনী কোন মূল্যই বহন করত না।

তারা যখন রাজা-বাদশাহ, তাদের জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, তাদের দরবারের সাজসজ্জার দিকে তাকাতেন এবং দেখতে পেতেন, এসব রাজা বাদশাহ এসবেই পরম তুষ্ট, যখন তাঁদের মনে হতো, কতিপয় নিষ্প্রান ভাস্কর্য কিংবা মাটির তৈরি মূর্তি যাদেরকে মানুষের পোশাক পরিয়ে সাজানো হয়েছে। আবূ মূসা বলেন, "আমরা যখন নাজ্জাশির কাছে গেলাম তখন তাঁর দরবারের অধিবেশন চলছিল। ডান দিকে ছিল কুরাইশ দূত আমর ইবনুল আস (রা.) এবং বাম দিকে আম্মারাহ। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ দু-সারিতে উপবিষ্ট। আমর ও আম্মারাহ (রা.) বাদশাহকে লক্ষ্য করে বললেন, মুসলিমগণ কাউকে সিজদাহ করে না। পাদ্রিরা এর প্রেক্ষিতে মুসলিমদের বলল বাদশাহকে সিজদা করতে। হযরত জা'ফর (রা.) তাৎক্ষণিক জওয়াবে বললেন, আমরা আল্লাহ ভিন্ন আর কাউকে সিজদা করি না।"[৬০]

হজরত সাদ (রা.) পারসিক সেনাপতি রুস্তমের কাছে রিবঈ ইবনে আমের (রা.)–কে তাঁর দূত নিযুক্ত করে পাঠান। ইবনে আমের (রা.) গিয়ে দেখতে পান, দরবার মূল্যবান গালিচা দ্বারা সজ্জিত এবং স্বয়ং রুস্তম দামী ইয়াকূত ও মণি-মুক্তাখচিত মহামুল্যবান পোশাক পরিধান করে স্বর্ণ সিংহাসন উপবিষ্ট। তার মস্তকে দামি মুকুট শোভা পাচ্ছে। ইবন আমের (রা.)

---

৫৯. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত তাবারী, *তারীখে তাবারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬

৬০. হাফেয ইমামুদ্দীন ইবনে কাসীর,*আল বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ* (দামেস্ক: দারু আলিমিল কুতুব, ১৯৯৬), খ. ৩, পৃ. ৬৭

যখন রুস্তমের দরবারে যান তখন তাঁর পরনে ছিল পুরনো সাধারন পোশাক, সাথে ছোট্ট একটি ঢাল আর ছোট্ট একটি ঘোড়া। তিনি ঘোড়ায় চরে গালিচা মাড়িয়েই সামনে অগ্রসর হন। এরপর তিনি ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন। তিনি মূল্যবান সোফার সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে নিজে রুস্তমের দিকে অগ্রসর হন। সাথে যুদ্ধাস্ত্র, শিরোপরি লৌহ শিরস্ত্রাণ শরীরে বর্ম পরিহিত। উপস্থিত লোকেরা তাকে সামরিক পোশাকাদি খুলে ফেলতে বলে। তিনি বলেন আমি তোমাদের কাছে নিজ থেকে আসিনি। তোমরাই আমাকে ডেকে এনেছ। আমার এ বেশে আগমন যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তাহলে আমি ফিরে যাচ্ছি। রুস্তম তখন তাদের লোকদেরকে বললেন তাকে আসতে দাও। তিনি পাতা ফরাশের ওপর বর্শায় ভর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে বর্শার অগ্রভাগের চাপে স্থানে স্থানে ফোটো হয়ে যায়। দরবারিরা জিজ্ঞেস করে, তোমরা এদেশে কি জন্য এসেছ? তিনি উত্তর দেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের এজন্যই পাঠিয়েছেন যেন আমরা তাঁরই ইচ্ছানুক্রমে তাঁর বান্দাদেরকে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহর দাসত্বে ন্যস্ত করতে পারি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং ধর্মের নামে কৃত যুলুম ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত করে ইসলামের সুবিচারের ছায়াতলে টেনে নিই।[৬১]

২.৩.৩ নযিরবিহীন বীরত্ব ও জীবনের প্রতি নিস্পৃহতা

পারলৌকিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস মুসলিমদের হৃদয়ে এমন নির্ভীকতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল, এক কথাই যা ছিল বিস্ময়কর! তা তাদেরকে জান্নাতের প্রতি আশ্চর্য রকমের আগ্রহশীল ও জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ করে দিয়েছিল। জান্নাতের ছবি তাঁদের চোখের সামনে এমনভাবে ভেসে উঠত যেন বাস্তবে তারা তা প্রত্যক্ষ করছে। তারা সেই জান্নাতের দিকে ঝাপিয়ে পড়তেন যেমন পত্রবাহক কবুতর ওড়বার সময় কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা মঞ্জিলে গিয়েই দম নেয়।

ওহুদ যুদ্ধে যখন বহু মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছিল তখন আনাস ইবন নযর (রা.) অগ্রসর হন। সামনেই তিনি সাদ ইবনে মুয়ায (রা.) কে দেখতে পান। তিনি হযরত সাদ ইবনে মুয়ায (রা.) কে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন, ওহে সা'দ (রা.)! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি ওহুদ পাহাড়ের ওপাস থেকে ভেসে আসা জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, আমরা তাঁর শরীরে আশিটির বেশি জখম দেখতে পেয়েছি। এসব জখমের কোনটি ছিল তলোয়ারের, কোনটি বল্লমের, আবার কোনটি ছিল তীরের। আমরা তাকে এ অবস্থায় দেখি, তাঁর দেহ কাফির মুশরিকদের আঘাতে আঘাতে টুকরা হয়ে

৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

গিয়েছিল। ফলে তাকে চিনার উপায় ছিল না। তাঁর বোন তাঁর একটি অক্ষত আঙুল দেখে তাকে চিনতে সক্ষম হন।"[৬২]

২.৩.৪ বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ

ইসলাম বিশ্বের মানুষকে সুখ ও শান্তির পরশে আবদ্ধ করার জন্য এক অনুপম ইসলামী ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলেছে। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কলহ, হিংসা, বিদ্বেষ, মারামারি, হানাহানি, ইত্যাদি দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দের ভিত্তিতে ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তিই তার একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং ইসলামে বৈষম্যের কোন স্থান নেই। কুর'আন মাজীদে মানুষকে একজাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষের মধ্যে দেশ, কাল, বর্ণ, ভাষা ও গোত্রের পার্থক্য দূর করে মহানবী (স.) বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। যেখানে বৈষম্যের লেশও খুজে পাওয়া যায় না। মহানবী (স.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন;

لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ , وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ , وَلا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلا بِتَقْوَى

অর্থাৎ, "অনারবগণের উপর আরবগণের যেমন কোন শ্রেষ্টত্ব নেই, তেমনি আরবগণের ওপরও অনারবগণের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"[৬৩]

২.৩.৫ পরিবারভিত্তিক: ইসলামী সমাজব্যবস্থার পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এ সমাজে পরিবার ব্যবস্থাকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি হিসেবে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়। সক্ষম ও সামর্থবান লোকদের বিয়ে করার ব্যাপারে সবিশেষ তাগিদ দেয়া হয়। আলাদা আলাদা ভাবে পারিবারিক লোকেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা হয়। কেননা ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধ অনুসরণ অনুশীলনের জন্য পারিবারিক জীবনের কোনো বিকল্প নেই। যার কারণে মুসলিমগণ পারিবারিক প্রথাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কুরআন ও হাদিসে এ পারিবারিক জীবন ও এর দায়িত্ব, উপযোগিতা সম্পর্কে নানা বক্তব্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

---

৬২. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: কিতাবুল মাগাযী, পরিচ্ছেদ: উহুদ যুদ্ধ, হাদীস নং ৩৭৫২ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৩), খ. ৭, পৃ. ২৪

৬৩. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কিতাবুল মানাকিব, পরিচ্ছেদ: মান দাওয়াল জাহিলিয়াহ, হাদীস নং, ৪৭

অর্থাৎ, "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ নির্ধারিত।"[৬৪]

২.৩.৬ অনুরাগ ও আত্মোৎসর্গ

হযরত আবু বকর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় একবার তাঁর ওপর শত্রুরা আক্রমণ করে বসে। ওৎবা ইবনে রবীয়া তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করেছিল। ফলে তাঁর চেহারা এমনি ফুলে গিয়েছিল, তাকে দেখে চেনাই মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। বনু তামীম তাকে কাপড়ে জড়িয়ে তাঁর ঘরে পৌছে দেয়। তিনি যে তাতে নির্ঘাত মারা যাবেন এতে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না। বেলা ডুবার পরে তিনি জ্ঞান ফিরে পান। তারপর প্রথমে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, রাসূল (স.) এর খবর কি? তিনি কেমন আছেন? লোকে তাঁর একথা শুনতেই ক্রোধান্বিত হয়, এই অবস্থাতেই তিনি তাঁরই কথা স্মরণ করেছেন যার কারণে তাঁর এই করুণ হাল! এ জন্য তারা কটুকাটব্য করতে লাগল, তারা হযরত আবু বকরের মা উম্মুল-খায়ের কে ডেকে বলল, দেখুন! তাঁর কিছু খানা পিনার ব্যবস্থা করুন। মা তাঁকে খাবার গ্রহণের জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু তাঁর মুখে সেই একই কথা, বল, আল্লাহর রাসূল (স.) কেমন আছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথী সম্পর্কে কিছুই জানি না।

তখন তিনি তাঁর মাকে বলেলন, আপনি খাত্তাব কন্যা উম্মু জামীলের কাছে যান এবং তাঁর কুশল জেনে এসে আমাকে জানান। তিনি উম্মু জামীলের কাছে গিয়ে বলেন, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহর কুশল জানতে চাচ্ছে। উম্মু জামীল বললেন, আমি আবু বকরকেও চিনি না আর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ কেও জানি না। আপনি যদি চান তাহলে আমি বরং আপনার সাথে গিয়ে আপনার ছেলেকে এক নজর দেখে আসতে পারি। তিনি সম্মতি জানিয়ে বললেন, ঠিক আছে, চলুন। এরপর উভয়ে একত্রে আবু বকরের ঘরে এসে তাকে ওই অবস্থায় দেখতে পেলেন। উম্মে জামিল আবু বকরের কাছে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখলেন এবং বললেন: আল্লাহর কসম! যে সম্প্রদায় আপনার সাথে এরূপ আচরণ করেছে তারা দুরাচার ও কাফির। আমি আশা করি আল্লাহ তাঁদের থেকে আপনার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

হযরত আবূ বকর তাকে বললেন: আগে বলুন, আল্লাহর রাসূলের অবস্থা কেমন? তিনি কেমন আছেন? উম্মু জামিল বললেন, আপনার মা তো শুনতে পাচ্ছেন! তিনি বলেন তাঁর পক্ষ থেকে ভয় পাবার কিছু নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। উম্মু জামিল তখন

৬৪. আল-কুর'আন, ৪ : ৭

বললেন, তিনি ভাল আছেন এবং সুস্থ আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি এখন কোথায়? উম্মু জামিল বললেন, তিনি এখন আরকামের বাড়িতে অবস্থান করেছেন। আবূ বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! এখন আর আমি পানাহার করতে পারি না যতক্ষণ না আমি রাসূল (স.) এর খিদমতে গিয়ে হাজির হই। এরপর তাঁরা উভয়ে কিছুটা অপেক্ষা করলেন। রাত হলো এবং মানুষের চলাফেরা ও আনাগোনা যখন থেমে গেল তখন উম্মু জামিল আবূ বকর (রা.)-কে নিয়ে আরকামের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং রাসূল (সা.) এর খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখামাত্রই যেন জীবন ফিরে পেলেন। এরপর তিনি পানাহার করেন।"[৬৫]

২.৩.৭ আনুগত্য ও তাঁবেদারি

আনুগত্য ও তাঁবেদারি প্রেম ও ভালবাসার অনিবার্য ও অপরিহার্য ফসল। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) যখন প্রেম ও ভালবাসার সম্পদে ধন্য হলেন তখন তাঁরা তাঁদের সকল শক্তি তাঁর আনুগত্যের পেছনে ব্যয় করলেন। আর এর সর্বোত্তম উদাহরণ হযরত সা'দ ইবন মুয়ায (রা.) এর সেই বিখ্যাত উক্তি যা তিনি আনসারদের পক্ষ থেকে বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে করেছিলেন, "আমি আনসারদের পক্ষ থেকে খোলা মন নিয়ে বলছি এবং তাঁদের পক্ষ থেকে জওয়াবও দিচ্ছি। আপনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করুন, যার সঙ্গে চান সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং যার সঙ্গে খুশি সম্পর্ক ছিন্ন করুন, আমাদের ধন-সম্পদ যা ইচ্ছা ও যতটা ইচ্ছা গ্রহণ করুন এবং যা খুশি বিলিয়ে দিন। আপনি আমাদের থেকে যা গ্রহণ করবেন তা অনেক বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় হবে তা থেকে যা আপনি রেখে যাবেন। সে ব্যাপারে আপনি যা কিছু হুকুম করবেন আমরা তা অবনত মস্তকে মেনে নিব এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকবো। আল্লাহর কসম! আপনি যদি বারকেগামাদান পর্যন্ত চলে যান আমরাও আপনার অনুগমন করব এবং আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনি যদি ঘোড়াসহ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাহলে কালবিলম্ব না করে আপনার পিছনে আমরাও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব।"[৬৬]

২.৩.৮ সম্পদ আত্মসাৎ নিষিদ্ধ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্যে অন্য কারো সম্পদ আত্মসাৎকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে, মুসলিমরা কেউ কারো সম্পদ অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করে না বলে, কারো সম্পদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

---

৬৫. হাফেয ইমামুদ্দীন ইবনে কাসীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪০

৬৬. হাফিয ইবনুল কাইয়েম, *যাদুল মা'আদ* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০০), খ. ২, পৃ. ১৩০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

অর্থাৎ, "মুমিনগণ, তোমরা অন্যায় ভাবে একে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।"[৬৭]

রাসূলুল্লাহ (স.)ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন, তিনি বলেন, مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيد অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে শহীদ হবে।"[৬৮]

২.৩.৯ সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বসুলভ

মুসলিম কখনো অসহায়ত্ববোধ করে না। কেননা এ ব্যবস্থায় মানুষ মানুষের জন্য নিবেদিত থাকে। যে সমাজের মানুষ ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। আদি মাতা-পিতা বিবেচনায় তারা আবদ্ধ বিশ্বভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে। তাদের মধ্যে আরো জোরালো ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসের ফলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থাৎ, "মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে–যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।"[৬৯]

২.৩.১০ অপরাধমুক্ত

ইসলামী সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, একে অপরাধমুক্ত রাখার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে গোষ্ঠীগত পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরাধ নির্মূলের ঐশী নির্দেশনা এ সমাজের অপরাধকে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত রাখে। সমাজ সন্ত্রাস কবলিত হয় না। মাদকাসক্তি সমাজকে গ্রাস করে না। বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ দুর্নীতি করে বটে কিন্তু সমাজ দুর্নীতিগ্রস্ত হয় না। কেননা এ সমাজে সকল অপরাধ মূলোৎপাটনের বিভিন্ন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ফলে, মুসলিমগণ কখনো অপরাধে জড়াতে পারে না। যেমন হত্যা বন্ধে মৃত্যুদণ্ডের কঠোর শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে ।

---

৬৭. আল কুর'আন, ৪ : ২৯

৬৮. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, অধ্যায়: আল মাযালিম, পরিচ্ছেদ: মান কাতালা দূনা মালিহী, হাদীস নং ২৪৮০, পৃ. ৭১৭

৬৯. আল-কুর'আন, ৪৯ : ১০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়।"[৭০]

২.৩.১১ ধর্মীয় স্বাধীনতা

মুসলিমরা কখনো অন্যের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই।"[৭১] আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ অর্থাৎ, "তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।"[৭২]

ইসলামী সমাজব্যবস্থা ছাড়া ধর্ম পালনে এমন উদার অধিকার ও স্বাধীনতা পৃথিবীর আর কোনো সমাজব্যবস্থা কখনো ছিল না, বর্তমানে ও নেই। পৃথিবির দেশ সমূহের মধ্যে ভারত নিজেকে ধর্মনিরেপেক্ষ দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি মুসলিম ভারতেই নিহত হয়ে থাকে। আধুনিক আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ সমূহে প্রতি নিয়ত ধর্মীয় কারণে নিগ্রহের অসংখ্য খবর পত্রিকায় ছাপা হয়। যা থেকে প্রতীয়মান হয়, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কেবল পৃথিবীর সকল ধর্মমতের মানুষের ধর্মপালনের অধিকার ও স্বাধীনতা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারে।

২.৩.১২ কর্মমুখী

মুসলিমগণের জন্য অলসতা, কর্মবিমুখতা, ভিক্ষাবৃত্তি, পরনির্ভরশীলতাকে একেবারেই নিরোৎসাহিত করা হয়েছে। সালাত আদায়ের পর সালাতের মতোই গুরুত্ব দিয়েই জীবিকা উপার্জনের আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৭০. আল-কুর'আন, ২ : ১৭৮
৭১. আল-কুর'আন, ২ : ২৫৬
৭২. আল-কুর'আন, ১১৯ : ৬

অর্থাৎ, "অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৭৩] রাসূলুল্লাহ(স.) নিজে কাজ করতেন। খুলাফায়ে রাশেদীন নিজস্ব ব্যবসায়ের মাধ্যমে পারিবারিক ব্যয় মিটিয়েছেন। কাজ করাকে, পরিশ্রমপ্রিয়তাকে রাসূলুল্লাহ (স.) সম্মানের বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

২.৩. ১৩. প্রেম ও ভালোবাসার সঠিক স্থান

প্রকৃতিগত ও স্বভাবজাত সেই উপাদান যার মস্তকে মানব ইতিহাসের অধিকাংশ বিস্ময়কর অর্জন ও আশ্চর্যজনক কৃতিত্বের স্বর্ণমুকুট স্থাপন করেছে যাকে মানুষ প্রেম ও ভালবাসা নামে স্মরণ করে থাকে, বহুকাল থেকে চরম উপেক্ষিত ও নিষ্প্রাণ অবস্থায় পড়ে ছিল। বহু শতাব্দী অবধি এমন কেউ ছিল না, যে একে কাজে লাগাতে পারে। বহুকাল থেকে পৃথিবীর বুকে এমন কোন মানুষের জন্ম হয়নি যিনি তাঁর সৌন্দর্য ও কামালিয়াত তথা নিজের মহোত্তম গুণাবলী দ্বারা সমগ্র মানব জাতির ভালবাসার হকদার হবেন এবং আপন শক্তি ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব দ্বারা এই ভালবাসা থেকে কাজ নিতে পারেন। আল্লাহর রাসূল (স.) এর সত্তার মধ্যে মানবতা তাঁর সেই হারিয়ে যাওয়া সম্পদটি পেয়ে যায়। তিনি ছিলেন সেই মানুষ যাকে আল্লাহ তা'আলা সামগ্রিক গুণাবলী দান করেছিলেন, সব বৈধ সৌন্দর্য-সৌকর্যের সমাহার বানিয়ে ছিলেন। যারা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের ভাষ্য হলো: তাঁকে যারা হঠাৎ করে দেখত–কী এক অজানা ভয়ে তাদের বুক দুরু দুরু করে কাঁপত। আবার যারা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার সুযোগ পেতেন, তাঁরা তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন। তাঁর প্রশংসাকারীরা বলতেন: তাঁর মতো তাঁর আগে না আর কাউকে দেখেছি, আর না তাঁর পরেই আর কাউকে দেখেছি। তাঁর আগমনের পর সত্যিকার ও পাক-পবিত্র ভালবাসা বাঁধভাঙা প্লাবনের ন্যায় দু'কূল উপচে পড়ে। মানুষের হৃদয়-মন এভাবে আকর্ষণ করে যেভাবে চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও হৃদয় আগে থেকেই তাঁর জন্য অধীর প্রতীক্ষায় ছিল। তাঁর উম্মতের সদস্যেরা তাঁর প্রতি এমন অনুরাগ ও আনুগত্য প্রদর্শন করে যার নযীর প্রেম ও ভালবাসার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর আনুগত্য ও তাবেদারীর মাঝে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করার এবং নিজের ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদ লুটিয়ে দেবার এমন সব ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় যা এর আগে আর কখনো দেখা যায় নি আর না ভবিষ্যতে দেখতে পাবার আশা করা যায়।

---

৭৩. আল-কুর'আন, ৬২ : ১০

২.৩.১৪ উৎকোচ গ্রহণ থেকে দূরে থাকা

কোনো কাজ করে দেয়ার জন্য বা কোনো অবৈধ সুবিধা লাভের জন্য কাউকে তার নির্ধারিত বেতন ভাতার বাহিরে অর্থ বা অন্য কোনো বস্তু দেয়ার নাম উৎকোচ বা ঘুষ। ইসলামী সমাজব্যবস্থা উৎকোচকে সম্পূর্ণভাবে হারাম করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় কেউ ঘুষ দিতেও পারে না নিতেও পারে না। এতে মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। কেননা ঘুষ দিয়ে অন্যকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়। যার যে কাজ করার বা যে চাকুরি গ্রহণ করার কিংবা যে অপরাধ থেকে ক্ষমা পাওয়ার অথবা যে অর্থ সম্পদ ভোগ করার কোনো অধিকার নাই, ঘুষের কারণে তা সম্ভব হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, "তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।"[৭৪]

২.৩.১৫. পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ

এরা সকলেই এই ঈমান কবুলের আগে কি বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করেছিল। তারা না কোন শক্তির সামনে মাথা নত করত। আর না কোন জীবন-বিধানের ধার ধারত। তারা কোন জীবন পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত ছিল না। তারা একমাত্র প্রবৃত্তির অনুগত ছিল। না বুঝেই তারা আমল করত। এখন তারা ঈমান ও গোলামির এক সুনির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করেছিল, তাঁদের জন্য এর বাইরে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর ক্ষমতা মাথা পেতে মেনে নিয়েছিল এবং অনুগত প্রজা, ভৃত্য ও গোলাম হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। পরিপূর্ণ রূপে তাঁর সমীপে নিজেদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সপে দিয়েছিল। তারা এমন ভাবে গোলামে পরিণত হয়েছিল, তারা না নিজেদেরকে নিজেদের সম্পদের মালিক মনে করত, আর না মালিক মনে করত নিজের জানের যে মালিকের মর্জি ও অনুমতি ছাড়া সামান্যতম এখতিয়ারও প্রয়োগ করতে পারে না।

৭৪. আল-কুর'আন, ২ : ১৮৮

২.৩.১৬. অভাবগ্রস্তদের সাথে সদাচরণ

মুসলিমগণের অন্যতম যোগ্যতা হলো অভাবগ্রস্তদের সাথে সদাচরণ করা। এজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে হবে। আর্থিক বা অন্য যেকোন ধরনের অভাব পূরণে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা পরিচালনা করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (স.) এক্ষেত্রে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তার অভাবগ্রস্ত ভাইয়ের কোন অভাব দূর করে দেয় আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার একটি বড় অভাব দূর করে দেবেন। আর যে ব্যাক্তি কোন মুসলিমের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার দুঃখ কষ্টসমূহের মধ্য থেকে একটি বড় দুঃখ কষ্ট দূর করে দেবেন।"[৭৫] আল্লাহ তা'আলা অপর আ'য়াতে বলেছেন:

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, "আত্মীয়কে দেবে তার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফল।"[৭৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

অর্থাৎ, "আত্মীয়-স্বজন কে দেবে তাঁর প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও।"[৭৭]

২.৩.১৭. আদল প্রতিষ্ঠা

ইসলামের আদর্শ ও বিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে আল্লাহর হক আদায় এবং মানব সমাজে যার যা প্রাপ্য তাকে তা পুরোপুরি প্রদান করার নাম আদল। আদল ছাড়া শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ জীবন আশা করা যায় না। জীবনে যে কোনো ধরনের উন্নতির নেপথ্যে আদল ক্রিয়াশীল থাকে। কুর'আন মাজীদে সুস্পষ্ট ঘোষণায় বলা হয়েছে:

---

৭৫. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল ঈমান, পরিচ্ছেদ: মান নাফস আন মুমিনীন কারাবাতিন, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২), হাদীস নং, ২৬৯৯

৭৬. আল-কুর'আন, ৩০ : ৩৮

৭৭. আল-কুর'আন, ১৭ : ২৬

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।"[৭৮]

২.৩.১৮. ইহসান প্রতিষ্ঠা

ইসলাম প্রত্যেক মানুষ কে দায়িত্বশীল ঘোষণা করেছে। সাথে সাথে মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে যুক্ত করে দিয়েছে সমাজের অন্যান্য মানুষ এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিজগতের সাথে তার আচরণের সঙ্গে। ইহসান বা সদাচার হলো এমন একটি ব্যক্তিগত আচরণ যা মানুষের আত্মিক উন্নতি, সফলতা ও কল্যাণ নিশ্চিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ, "তোমরা ইহসান কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন।"[৭৯] আল্লাহ তা'আলা অপর আয়াতে বলেছেন:

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ, "আর ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।"[৮০]

২.৩.১৯. সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ

সামজিক শান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম সকল বিশৃঙ্খলামূলক কাজ নিষিদ্ধ করেছে। অন্যায়ভাবে যারা মানুষকে খুন করে তাদেরকে আইনসংগত ভাবে হত্যা করার বিধান দেয়া হয়েছে। এমনকি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে হত্যার চেয়ে ও জঘন্য হিসেবে ইসলাম অভিহিত করেছে। কাজেই মুসলিম সমাজ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষার জন্য বিশেষভাবে দায়িত্বশীল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

৭৮. আল-কুর'আন, ১৬ : ৯০
৭৯. আল-কুর'আন, ২ : ১৯৫
৮০. আল-কুর'আন, ১১ : ১১৫

অর্থাৎ, "তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা বিশেষভাবে স্বরণ কর। যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু, তখন আল্লাহ তোমাদের মনের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি করে দিলেন আর তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো ছিলে আগুনের গর্তের কিনারে, আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন।"[৮১]

২.৩. ২০.অপচয়-অপব্যয় নিষিদ্ধ

মানুষ তাঁর প্রয়োজনে অর্থ উপার্জন করবে, ব্যয় ও করবে। তবে কোন ক্রমেই অপচয় করতে পারবে না। মানুষের অর্থনৈতিক দায়িত্ব হলো সে অর্থের অপচয় রোধ করবে। মুসলিম সমাজকে অপচয়-অপব্যয় রোধ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

অর্থাৎ, "হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিধান করবে, আহার করবে, পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের কে পছন্দ করেন না।"[৮২]

২.৩. ২১. সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করণ

মুসলিম সমাজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসহনীয় বৈষম্য দূর করার জন্য সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করবে। সুষম বণ্টনের জন্যে আল কুর'আনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এভাবে:

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থাৎ, "আল্লাহ জনপদের অধিবাসীদের নিকট হতে তার রাসূল কে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তার রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদেরে, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূলুল্লাহ (স.) তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে

৮১. আল-কুর'আন, ৩ : ১০৩
৮২. আল-কুর'আন, ৭ : ৩১

নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং আল্লাহ কে ভয় কর; আল্লাহ তো শাস্তি দেয়ায় কঠোর।" [৮৩]

২.৩.২২. সুদ বর্জন

সমাজ ব্যবস্থায় সুদ একটি অভিশপ্ত পদ্ধতি। এটি শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এতে করে সামগ্রিক স্বার্থ নিদারুণ ভাবে ক্ষুণ্ন হয়। ফলে, ইসলাম সুদ কে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করে। এ ব্যবস্থায় কেউ সুদ দিতেও পারবে না এবং সুদ নিতেও পারবে না, এতে মুসলিম সমাজের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ফলে মুসলিমরা সুদ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيم

অর্থাৎ, "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ তা'আলা কোনো পাপী কাফিরকে ভালবাসেন না।"[৮৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যিই যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তাহলে সুদের বকেয়া ছেড়ে দাও।"[৮৫]

২.৩.২৩ আখলাকে হামিদাভিত্তিক

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় মানুষকে সর্বোত্তম নৈতিক গুণাবলিতে বিভূষিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নীতি, ওয়াদাপালন, ইহসান, দায়িত্বনিষ্ঠা, আমানতদারিতা প্রভৃতি গুণাবলী অর্জনে উৎসাহ দেয়ার পাশাপাশি মিথ্যাচার, প্রতারণা, গীবত, ব্যাভিচার সহ সকল পাপাচার পরিহারের ব্যবস্থা্া রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে ইসলামী সমাজব্যবস্থায় মানুষ সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (১) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (২) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ
(مُعْرِضُونَ (৩) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (৪) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (৫

৮৩. আল-কুর'আন, ৫৯ : ৭
৮৪. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৬
৮৫. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৮

অর্থাৎ, "মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, যারা যাকাত দান করে থাকে এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।"[৮৬]

২.৩.২৪. হালাল উপার্জন

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন, মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং উৎপাদন ও উপার্জনে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা। এ জন্যে মানুষকে হালাল জীবিকা উপার্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের প্রথম দায়িত্ব হালাল জীবিকা উপার্জন করা। মুসলিম সমাজ এই কাজকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

অর্থাৎ, "হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৮৭]

২.৩.২৫. পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ

ইসলামে মানুষের অন্যতম প্রধান সামাজিক দায়িত্ব হলো মানুষের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং পারস্পরিক সুসম্পর্ক সংরক্ষণে বিস্তারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সমাজে মুসলিমদের মধ্যে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপনের অনুপ্রেরণা যোগায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

অর্থাৎ, "মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই।"[৮৮]

---

৮৬. আল-কুর'আন, ২৩ : ১-৫
৮৭. আল-কুর'আন, ২ : ১৬৮
৮৮. আল-কুর'আন, ৪৯ : ১০

২.৩.২৬. আত্মীয়তা রক্ষা

আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষের সামজিক জীবনকে অর্থবহ এবং আনন্দময় করে রাখে। ইসলাম তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা মুসলিমদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

অর্থাৎ, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট চাও এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[৮৯] আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন:

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, "আত্মীয়কে দেবে তার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফল।"[৯০] হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন:

قال الله أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته

অর্থাৎ, "আমি আল্লাহ্, আমি রহমান। আমার নাম থেকে আমি রিহিম বা আত্মীয়তা সৃষ্টি করেছি। কাজেই যে তা বজায় রাখবে তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে। আর যে তা ছিন্ন করবে তার সাথে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করবো।"[৯১]

এসব ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় যা এর আগে আর কখনো দেখা যায় নি আর না ভবিষ্যতে দেখতে পাবার আশা করা যায়। এভাবে কুর'আনের আলোকে রাসূল (স.) প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হয়ে মুসলিম জাতি বিশ্বের যোগ্যতম জাতি হিসেবে গড়ে ওঠলো।

---

৮৯. আল-কুর'আন, ৪ : ১

৯০. আল-কুর'আন, ৩০ : ৩৮

৯১. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আসয়াশ আস সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : ফি সিলাতুর রিহম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), হাদীস নং ১৬৯৪

২.৪ মুসলিম জাতির নেতৃত্ব ও এর প্রভাব

অতঃপর মুসলিমগণ কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করল। দুনিয়ার নেতৃত্বের বাগডোর তাঁরা নিজেদের হাতে তুলে নিল এবং নেতৃত্বের আসনে জেঁকে বসা অসুস্থ ও পীড়িত জাতিগোষ্ঠীকে অপসারণ করল যেই নেতৃত্ব তাঁরা কখনো সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি। নিম্নে মুসলিম জাতির নেতৃত্ব ও এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

২.৪.১. মুসলিমগণের নেতাসূলভ বৈশিষ্ট্যাবলী

মুসলিমগণ পৃথিবীর মানুষদেরকে নিজেদের সাথে নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও সহীহ গতিতে সহীহ মনযিলের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল। তাদের মধ্যে সেই সব গুণের সমাবেশ ঘটেছিল যা ঐসব জাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্বের মহান পদমর্যাদার যোগ্য পাত্র বলে প্রমাণ করত এবং তাদের তত্ত্বাবধানে ও নেতৃত্বে তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর কল্যাণ ও সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করত। তাদের সে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল এরূপ:

(১). তাঁদের কাছে ছিল আসমানী কিতাব ও খোদায়ী শরীয়ত। এজন্য তাঁদের অনুমাননির্ভর হবার কিংবা নিজেদের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়নের যেমন দরকার ছিল না, তেমনি তাঁরা মূর্খতা ও অজ্ঞতা, প্রতিদিনের আইনগত পরিবর্তন-পরিবর্ধন সংস্কার এবং মারাত্মক রকমের ভ্রান্তি ও অনাচার থেকে মুক্ত ও নিরাপদ ছিল। নিজেদের রাজনীতি ও পারস্পরিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে দিকভ্রান্ত ভাবে চলা ও অন্ধকারে হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি করতে ও তাঁরা বাধ্য ছিল না। তাঁদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহী ছিল, ছিল খোদায়ী শরীয়তের প্রদীপ্ত রৌশনী যার ওপর নির্ভর করে তাঁরা পথ চলত এবং যার সাহায্যে জীবনের সমস্ত রাস্তা ও তার বাকসমূহ তাঁদের জন্য আলোকিত ছিল। তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপেই আলোতে গিয়ে পড়ত এবং মনযিলে মকসূদ তাঁদের পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হতো।

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, "আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে-সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনিভাবে কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে।"[৯২]

৯২. আল-কুর'আন, ৬ : ১২২

(২). তাঁরা হুকমত ও নেতৃতের পদে সুদৃঢ় নৈতিক, চারিত্রিক প্রশিক্ষণ ও পূর্ণাঙ্গ আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের পর সমাসীন হয়েছিলেন। তাঁরা দুনিয়ার সাধারণ শাসক জাতিগোষ্ঠী ও ক্ষমতাসীন লোকদের ন্যায় নিজেদের সব রকমের নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ নিচ থেকে উপরের দিকে লাফ দেয়নি, বরং দীর্ঘকাল যাবত আসমানী প্রত্যাদেশ তাঁদের সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণ দান করেছিল এবং বছরেরে পর বছর ধরে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধান ও শিক্ষাধীনে ছিল। তিনি তাঁদের তাযকিয়া তথা আত্মিক পরিশুদ্ধি করেন এবং তাঁদের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দান করেন। ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ ও ফেতনা-ফাসাদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁদের দিল একেবারেই মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের কানে রাত-দিন কুরআন মজীদের এই আয়াত গুঞ্জরিত হতো:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

অর্থাৎ, "ঐ পরকালীন বাসভূমি আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। খোদাভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম।"[৯৩]

যখন তাঁরা কোন যিম্মাদারী নিজের হাতে তুলে নিত তখন তাঁকে লুটের মাল ভাবত না এবং তা গ্রাস করার জন্য এগিয়ে যেত না, বরং একে নিজের যিম্মায় অর্পিত এক পবিত্র আমানত ও আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ মনে করত। তাঁরা সব সময় চোখের সামনে রাখত:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।"[৯৪]

(৩). তাঁরা কোন জাতিগোষ্ঠীর সেবা দাস কিংবা কোন রাজবংশের ও দেশের প্রতিনিধি ছিল না যাঁদের সামনে কেবল তাঁদের সুখ-শান্তি, প্রাচুর্য, উন্নতি ও সমৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য, যারা কেবল সেই জাতিগোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এবং অবশিষ্ট সমস্ত জাতিগোষ্ঠী শাসিত হবার জন্যই পয়দা করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করে। তাঁরা আরব ভূখণ্ড থেকে এজন্য বের হয়নি, দুনিয়ার বুকে আরব শাহীর বুনিয়াদ স্থাপন করবে এবং তাঁর ছায়ায় আরাম-আয়েশের

৯৩. আল-কুর'আন, ৮৮ : ৮৩
৯৪. আল-কুর'আন, ৪ : ৫৮

জীবন কাটাবে আর এর সমর্থনে অন্যদের ওপর গর্ব ও অহংকার করবে। এজন্যও নয় যে, লোকদের রোমান ও পারসিকদের গোলামী থেকে বের করে আরবদের ও তাঁদের নিজেদের গোলামীতে নিয়োজিত করবে। তাঁরা কেবল এজন্য বেরিয়েছিলেন যে, তাঁরা আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের মত মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে কেবল লা-শরীক আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগীতে স্থাপন করবে। মুসলিম দূত হযরত রিবঈ ইবন আমের (রা.) পারস্য সম্রাট ইয়াযদাগিরদের ভরা দরবারে এই সত্যেরই ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

"আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এজন্যই পাঠিয়েছেন যাতে আমরা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগীর দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণ কাল-কুঠরি থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর প্রশস্ততা ও বিস্তৃতির দিকে এবং নানা ধর্মের নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে নাজাত দিয়ে ইসলামের আদল-ইনসাফে নিয়ে যাই।"[৯৫] অনন্তর দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠী তামাম মানব সম্প্রদায় তাঁদের দৃষ্টিতে একই মর্যাদাভুক্ত ছিল। যদি পার্থক্য থেকে থাকে তবে তা ছিল দ্বীনদারীর পার্থক্য।

(৪). মানুষ দেহ ও আত্মা, হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বিত রূপ। মানুষ প্রকৃত সৌভাগ্য ও কল্যাণ ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ করতে পারে না এবং মানবতার ভারসাম্যময় উন্নতি ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের এই সমস্ত শক্তি পরীক্ষিতভাবে ক্রমোন্নত ও বিকশিত হবে। পৃথিবীতে সৎ ও সংস্কৃতি ততক্ষণ পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এমন এক ধর্মীয়, নৈতিক, বুদ্ধিভিত্তিক ও বস্তুগত পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে মানুষের জন্য খুব সহজে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে এবং অভিজ্ঞতা এটা প্রমাণ করে দিয়েছে, এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না জীবনের দিক নির্দেশনা ও সংস্কৃতির পরিচালনার ভার ঐ সমস্ত লোকের হাতে অর্পিত হবে যারা আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের উভয়টির প্রবক্তা, ধর্মীয় আদর্শ, নৈতিকতার পরিপূর্ণ নমুনা, সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা মণ্ডিত। তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস ও প্রশিক্ষণের মধ্যে যদি সামান্যতমও ফাক-ফোকার কিংবা দাগ থাকে তবে তা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং বিভিন্নরূপে তাঁর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। আর যদি এমন কোন দল বিজয়ী হয় যারা কেবলই বস্তুর পূজারী, বস্তুগত আনন্দ-উপভোগী বিশ্বাস করে না এবং কোন ইন্দ্রিয়াতীত সত্যেও যাঁদের প্রত্যয় নেই, তবে তাদের মেযাজ-এর মূলনীতি ও প্রবণতাঁর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া তাঁদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর পড়া অনিবার্য।

---

৯৫. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭ম, পৃ. ৪০

২.৪.২ অতীত মুসলিম নেতৃত্বের প্রভাব

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন বিশ্ব দ্রুত গতিতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং পৃথিবীর বুকে এমন কোন শক্তি ছিল না যা পতনোন্মুখ মানবতাকে হাত ধরে বাঁচাতে পারে, মুহাম্মদ (স.) এর আবির্ভাব পৃথিবীকে এমন একটি দলের নেতৃত্ব প্রদান করে যারা ছিলেন আসমানী গ্রন্থ ও একটি শরীয়ত ও বিধানের মালিক, যাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহ প্রদত্ত রৌশনীর আলোকে পরিচালিত হতো, যারা দুনিয়ার বুকে হক ও ইনসাফের পতাকাবাহী ছিলেন, যারা রাজত্ব ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলনে নবুওয়াত ও রিসালতের সুদৃঢ় নৈতিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আত্মশুদ্ধি লাভের পর, যারা কোন জাতির খেদমত গুযার ও কোন বংশ ও দেশের প্রতিনিধি ছিলেন না, যাদেরকে ভারসাম্যময় মেযাজ ও উপযোগী স্বভাব-প্রকৃতি দান করা হয়েছিল।

এই দলের অস্তিত্ব মানব জাতির সার্বিক ধ্বংসের রাস্তায় তাৎক্ষণিক প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দেয় এবং ক্রমান্বয়ে মানবতাকে কয়েক শতাব্দীর জন্য সেই সব ফেতনা-ফাসাদ ও সমূহ বিপদ থেকে বাচিয়ে দেয় যা বিশ্বের বুকে ছেয়ে ছিল। সে মানুষকে সাথে নিয়ে সহীহ মনযিলের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। তাঁদের শাসনামলে মানুষ সমান্তরাল গতিতে উন্নতি করে এবং মানুষের সর্ব প্রকার প্রকাশ্য ও প্রাচ্ছন্ন শক্তি একই রূপ ইচ্ছা-অভিপ্রায় ও সৌষ্ঠব সহকারে ক্রমোন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে এবং এমন এক পরিবেশ কায়েম হয় যেখানে মানুষের জন্য খুব সহজেই আপন পরিপূর্ণতায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "এই দলটির প্রভাবে জীবনের ধারা ও পৃথিবীর গতিপথ পাল্টে যায়। বিশ্বব্যাপী গতিধারা আল্লাহ-বিস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতির দিক থেকে সর্বব্যাপী আল্লাহপরস্তী ও আত্মপরিচিতির দিকে বদলে যায়, মানুষের মেযাজ, বোধ-বুদ্ধি ও দিল যায় পাল্টে। ভ্রান্ত নৈতিক মূল্যবোধ ও মিথ্যা পরিমাপের পরিবর্তন ঘটে। উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত থাকে। জীবন-যিন্দেগী ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিমিত্ত নির্ভেজাল ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষামালা তুলাদণ্ডের মর্যাদা লাভ করে। এই সভ্যতার যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সাথে নৈতিক চরিত্র ও প্রকৃষ্টতার ও উত্থান ঘটে এবং বিজয়ের বিস্তৃতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ও একইভাবে বিস্তার ঘটে। ধর্মীয় সম্বন্ধ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে ঐক্য এবং সমঝোতা-সম্প্রীতি ও প্রেমপ্রীতি পৃথিবীটাকে সাক্ষাত বেহেশতে পরিণত করে যেখানে পারস্পরিক শক্তি পরীক্ষা ও লড়াই-ঝগড়া ছিল না। খোদাপরস্তী ও পাক-পবিত্রতার রাস্তা যা জাহিলিয়াত যুগে কাঁটায় ভর্তি ছিল এবং দীর্ঘকাল থেকে নির্জন ও জনশূন্য অবস্থায় পড়েছিল, বিপদমুক্ত রাজপথে পরিণত হয় যেই পথের ওপর নির্ভর দিয়ে কাফেলা নির্ভয়ে পথে চলত। আল্লাহর আনুগত্য যা প্রথমে মুশকিল ছিল এখন তা সহজ এবং নাফরমানী যা প্রথমে সহজ ছিল এখন তা কঠিন হয়ে

গেল। দ্বীনের প্রতি দাওয়াতের মধ্যে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ এবং নৈতিক প্রশিক্ষণ ও সংস্কার-সংশোধনের মধ্যে ক্রেনের শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায় যা লক্ষ কোটি মানুষকে পশু জীবন ও চারিত্রিক অধঃপতনের হাত থেকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির শীর্ষ বিন্দুতে পৌছিয়ে দেয়। মানুষের মেধা, জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ ও স্বভাব প্রকৃতির উদ্দাম গতি যা দীর্ঘকাল থেকে নষ্ট হচ্ছিল কিংবা অপাত্রে ব্যয়িত হচ্ছিল তা সঠিক দিক অবলম্বন পূর্বক পৃথীবিকে প্রকৃত উন্নতি ও অগ্রগতি দান করে।"[৯৬] মোটকথা, মনুষ্য কাফেলা মনযিলে মকসূদের নিকটবর্তী হয় এবং এর সম্মুখ ভাগ মনযিল পৌছে যায়।

২.৪.৩. সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর বৈশিষ্ট্য

সাহাবায়ে কিরাম এর এই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা ধর্ম ও নৈতিকতা এবং শক্তি ও রাষ্ট্রনীতির পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। এসবের বিক্ষিপ্ত গুণাবলী তাঁদের মধ্যে একই সঙ্গে সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে মানবতা সকল শাখা প্রশাখা ও সৌন্দর্যসহ দৃশ্যমান ছিল। এই নৈতিক, চারিত্রিক ও উন্নতরতর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ এইরূপে বিস্ময়কর ও অন্যন্য ভারসাম্য, এরকম অস্বাভাবিক ব্যাপকতা যার উদাহরণ ইতিহাসে খুব কমই মেলে এবং পরপর পরিপূর্ণ বস্তুগত প্রস্তুতি ও বিস্তৃত জ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতে এটা সম্ভব ছিল, তাঁরা মানব সম্প্রদায় গুলোকে তাঁদের উন্নততর আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক ও বস্তুগত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিপূর্ণতা পর্যন্ত পৌছাতে পারবে। অনন্তর ইতিহাসে খেলাফতে রাশেদার যুগ থেকে সবদিকে দিয়ে পরিপূর্ণ ও সফল কোন যুগের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এ ছিল কেবল যেসব লোকের জীবন-চরিত্রের অমীয় ফসল যারা হুকূমত পরিচালনা করতেন এবং যারা ছিলেন সভ্যতা-সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক। ফসল ছিল তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস, প্রশিক্ষণ, সরকার পদ্ধতি ও রাষ্ট্রনীতির মৌলনীতিমালা এজন্য যে, তাঁরা যেখানেই থাকতেন এবং যে অবস্থায় থাকতেন, ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতার সর্বোত্তম নমুনা হতেন। তাঁরা শাসক হিসেবেই থাকুক অথবা সাধারণ একজন কর্মচারী হিসেবে, পুলিশেই হোন অথবা সৈনিক, তাঁদের সর্বদাই সংযত, শুচি-সুভ্র, চরিত্রবান, আমানতদার, সততা বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি, আল্লাহভীরু ও বিনয়ী হিসেবেই পাওয়া যেত। জনৈক রোমক সর্দার নিমোক্ত ভাষায় মুসলিম সৈনিকদের প্রশংসা করেছেন:

"দিনের বেলা তাঁরা ঘোড়সওয়ার মর্দে মুজাহিদ আর রাতের বেলায় ইবাদতগুজার। নিজেদের বিজিত এলাকায় তাঁরা মূল্য দিয়ে আহার্য দ্রব্য ক্রয় করে খায়। কোথাও প্রবেশ

---

৯৬. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?* (ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২), পৃ. ৩০২-৩০৩

করতে হলে সবার আগে সালাম প্রদান করে এবং যুদ্ধের ময়দানে এমন দৃঢ় ও সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করে যে, শত্রু নিপাত করেই ছাড়ে।"[৯৭]

২.৪.৪ ইসলামী শাসন ও সভ্যতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল

হিজরি ১ম শতকে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি তাঁর পরিপূর্ণ রুহ ও দৃশপট সমুহ আবির্ভাব এবং ইসলামী হুকমতের নিজস্ব রূপ ও রীতিনীতি সহকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছিল ধর্ম ও নৈতিকতার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক নতুন ঘটনা। এই বিপ্লবের ফলে পৃথিবী তার সভ্যতার গতিধারায় পাল্টে যায়। ইসলামের এই বিরাট আজীমুশশান বিজয়ে জাহিলিয়াত এক অভূত পূর্ব পরীক্ষা ও বিপদের মুখোমুখি হয়, এতদিন পর্যন্ত তার প্রতিপক্ষের অবস্থানগত মর্যাদা একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আহ্বানের বেশি ছিল না। এখন হঠাৎ করেই হয়ে গেল সৌভাগ্য ও মুক্তির একটি পূর্ণাঙ্গ মিশন, আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের পরিপূর্ণ সমন্বয়, জীবন ও শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি, একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা-সংস্কৃতি, একটি সমাজ, একটি শক্তিশালী হুকুমত ও একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সংবিধান। একদিকে ছিল এমন একটি যৌক্তিক, বুদ্ধিগ্রাহ্য ও আমল উপযোগী ধর্ম যা ছিল সরাসরি প্রজ্ঞা ও যুক্তিনির্ভর, আর অপর দিকে ছিল কেবলই কষ্ট-কল্পনা ও আজগুবী কিসসা-কাহিনী। একদিকে ছিল আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত ও আসমানী ওহী, আর এর বিপক্ষে ছিল শুধুই অনুমান, নিছক মানবীয় অভিজ্ঞতা ও মানবরচিত আইন-কানূন।

ইসলাম তৌহিদ তথা একত্ববাদের দাওয়াত পেশ করে এবং মূর্তিপূজা ও শিরক- এর এমন নিন্দা জ্ঞাপন করে যে, এগুলো চিরদিনের জন্য হেয় ও অবজ্ঞেয় হয়ে যায়। লোকে অতঃপর এর নামে লজ্জা পেত এবং নিজেদেরকে এর থেকে মুক্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করত অথবা তাঁরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ও সাফাই সহকারে এর স্বীকৃতি এবং বিস্ময়ের সঙ্গে বলত:

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

অর্থাৎ, "সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটাএক বিস্ময়কর।"[৯৮] অথবা এখন তাঁরা নিজেদের ধর্মের শিরকমূলক অঙ্গসমূহ ও কর্মকাণ্ডের ভিন্নতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করতে থাকে এবং এমন সব ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতে থাকে যরা সেগুলোকে তৌহিদ তথা একত্ববাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

বর্তমানে এসে যদ্বরা ইউরোপের ধর্মীয় ইতিহাস ও খ্রিষ্টান গির্জার কাহিনী যদি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করা হয় তাহলে ইসলামের বুদ্ধিভিত্তিক প্রভাবের আরও অনেক নমুনাই দেখতে

---

৯৭. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭ম, পৃ. ৫৩

৯৮. আল-কুর'আন, ৩৮: ৫

পাওয়া যায়। স্বয়ং মারটিন লুথার কিং এর বিখ্যাত সংস্কারমূলক আন্দোলন তার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং ঐতিহাসিকগণ একথা স্বীকার করেছেন, এই আন্দোলনের জনকের ওপর ইসলামী শিক্ষামালার প্রভাব পরেছিল। কেবল ধর্মই নয়, বরং ইউরোপের সমগ্র জীবন ও এর সভ্যতা-সংস্কৃতি ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন:

For although, there is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic civilization is not traceable nowhere it is so clear and momentous as in the genesis of that power which constitutes the permanent distinctive force of the modern world and the supreme source of its victory- natural science and scientific spirit. অর্থাৎ, "ইউরোপের উন্নতি ও অগ্রগতির কোন শাখা-প্রশাখা কিংবা কোন একটি দিকই এমন নেই যেখানে ইসলামী সভ্যতা তার ছাপ না রেখেছে কিংবা কোন প্রকার প্রভাব না ফেলেছে, উল্লেখযোগ্য ও উজ্জ্বলতর কোন স্মৃতি না রেখেছে। ইউরোপীয় জীবনের ওপর ইসলাম এক বিরাট প্রভাব ফেলেছে।"[৯৯] একই লেখক অন্যত্র বলেন:

Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world... It was not science only which brought Europe back to life. Other and manifold influences from the civilization of Islam communicated its first glow to European life. অর্থাৎ, "কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই ইউরোপে জীবন সঞ্চারের কৃতিত্বের অধিকারী নয়, বরং ইসলামী সভ্যতা ইউরোপীয় জীবনের ওপর খুবই বিরাট ও বিভিন্ন মুখী প্রভাব ফেলেছে। আর এর সূচনা সে সময়ই হয়ে যায় যখন ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম আলোকচ্ছটা ইউরোপের ওপর পড়া শুরু করেছে।"[১০০]

৯৯. *The making of Humanity,* Ibid, p. 190
১০০. Ibid, p. 190

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম উম্মাহর অবদান

সারা বিশ্বে বর্তমানে মুসলিমগণ বৃহত্তম জাতি। এক সময় পৃথিবীর অর্ধেক এমনকি সুদূর ইউরোপের স্পেন, তুরস্ক মুসলিমগণের অধীনে ছিলো। চিকিৎসা বিদ্যায় ইবনে সিনা, গনিতে মূসা আল খারিজমিসহ অনেকের অবদান আছে বিশ্ব সভ্যতায়। স্বয়ং পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিমগণ ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় সম্প্রদায়। সারা বিশ্বের অর্থনীতি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর তেলের উপর নির্ভরশীল। নিচে বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিমগণের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

৩.১. বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুসলিমগণের অবদান

মানব জাতির জন্য প্রয়োজন এমন কোন বিষয় নেই যার বিবরণ ও সুষ্ঠু সমাধান ইসলামে নেই। ইসলাম মানব সমাজকে যা দিয়েছে, অন্য কোন ধর্ম তা দিতে অদ্যাবধি সক্ষম হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনেও ইসলামের অবদান অসামান্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচনে ইসলাম প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বলা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের নবজাগরণ সৃষ্টিতে ইসলামের ভূমিকা সর্বাধিক। দেড় হাজার বছর পূর্বে জাহেলিয়াতের প্রগাঢ় অন্ধকারে মানব জাতি অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত থাকা অবস্থায় বিশ্ব প্রভু মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন ইসলামের প্রধান উৎস আল-কুরআন। যাকে তিনি বিজ্ঞানময় বলে ঘোষণা করেন।[১০১] সে সময় থেকেই ইসলাম বিজ্ঞান সম্পর্কিত নির্ভুল তথ্য প্রদান করে আসছে। তাই ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোনই বিরোধ নেই। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ (সা.) ও বিজ্ঞান গবেষণার অনেক উপাত্ত রেখে গেছেন। যা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন। ইসলাম সর্বদা বিজ্ঞানকে সামনের দিকে এগিয়ে দিতে চেয়েছে। নিম্নে এ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

৩.১.১ রসায়ন বিজ্ঞানে মুসলিমগণের অবদান

মুসলিমগণ রসায়ন বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। জাবির ইবনুল হাইয়ান-কে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয়। তিনি রসায়ন বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণার উপর প্রায় ৫০০ টি আর্টিকেল প্রণয়ন করেন। তাঁর বিখ্যাত 'রচনা বুক অব দি সেভেন্টি' জাবির-এর রচনায়। গ্রিকদের নিকট পরিচিত একটি রাসায়নিক পদার্থ সাল অ্যামোনিয়াক-এর উল্লেখ

১০১. আল-কুর'আন, ৩৬ : ০২

রয়েছে।"[১০২] তাঁর রচনাগুলো ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞান গবেষকরা অনুবাদ করে নেন। আধুনিক বিশ্ববিখ্যাত রসায়নবিদদের তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক। বিশ্বের বিজ্ঞানীরা জাবির ইবনুল হাইয়ান-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন পদার্থ আবিষ্কার করেন। তিনি বাষ্পীয়করণ, দ্রবীকরণ, স্ফটিকীকরণ, এবং এক পদার্থের সঙ্গে অন্য পদার্থ মিশিয়ে নতুন পদার্থ আবিষ্কারের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

আরবীয় আলকেমিয়ার"[১০৩] জনক ছিলেন জাবির ইবনুল হাইয়ান। পরীক্ষামূলকভাবে বিজ্ঞান অধ্যয়নের গুরুত্ব তিনি সে আমলে সমস্ত কেমিয়াবিদদের চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করেন এবং রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতিবিধানে তার তত্ত্বগত ও কার্যগত অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তথাপি তাঁর নামে চলিত বইগুলো চতুর্দশ শতাব্দীর পর এশিয়া ও ইউরোপ উভয় মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী রাসায়নিক আলোচনা-পুস্তক ছিল।"[১০৪]

'মুহাম্মদ ইবনু জাকারিয়া' ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ রসায়ন বিশারদ। তিনি হীরাকোষকে শোধন করে গন্ধক-দ্রাবক তুঁতিয়া প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি কৃত্তিম উপায়ে বরফ তৈরি করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি রসায়ন বিষয়ে 'কিতাবুল আসরার' নামে অতি মূল্যবান একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মিস্টার জিরাড ল্যাটিন ভাষায় এ মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন এবং তা রসায়ন শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে সারা ইউরোপের উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠে পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি আরেকটি বিরাট গ্রন্থ 'কিতাবুল মানসূরী' (দশ খণ্ডে) রচনা করেন। পনের শতকে মিলান (ইতালির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর) শহরে এ বইটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। পরে এ গ্রন্থের ফার্সি, জার্মান সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল।[১০৫]

'আল রাযী' অনেক নতুন বিষয় প্রবর্তন করেন। তার মধ্যে প্রতীক চিহ্নাদি অন্যতম।"[১০৬] তাকে বর্তমানে রসায়ন শাস্ত্রের অন্যতম প্রবর্তকও বলা হয়। তাঁর লিখিত আল কেমিয়া সংক্রান্ত বইয়ের মধ্যে 'গোপনতত্ত্ব' নামক বইটি বহুজন কর্তৃক সম্পাদিত ও ল্যাটিন ভাষায়

---

১০২. স্যার টমাস আর্নল্ড, *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭), পৃ. ৩৩৫

১০৩. আলকেমি (Alchemy): মধ্যযুগীয় রসায়নশাস্ত্র, অপকৃষ্ট ধাতুকে কিভাবে সোনায় পরিণত করা যায় তা আবিষ্কার করাই ছিল এ শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। উদ্ধৃত: www.ovidhan.org/e2b/alchemy

১০৪. ফিলিপ কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস* (কলকাতা:মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ৭৬-৭৭

১০৫. মোহাম্মদ আবূ তাহের বর্ধমানী, *অধঃপতনের অতল তলে* (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন, ২০১৬), পৃ. ৮

১০৬. নূরুল হোসেন খন্দকার, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩), পৃ. ৭৮

অনূদিত হয় এবং চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এটাই ছিল রসায়ন বিজ্ঞানের মূল উৎস। 'রোজার বেকন' একে 'ডি স্পিরিটিবাস এট করপোরিবাস' নামে তার বইয়ে উদ্ধৃত করেন।"[১০৭]

৩.১.২ পদার্থ বিজ্ঞানে মুসলিমগণের অবদান

পদার্থ বিজ্ঞানেও মুসলিম অবদান সর্বজনবিদিত। এতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত হচ্ছেন 'আল কিন্দী'। তার রচনার সংখ্যা কমপক্ষে ২৬৫ টি এবং তিনি আরবদের মধ্যে প্রথম মুসলিম দার্শনিক। সুনির্দিষ্ট ওযন, জোয়ার ভাটা, আলোক-বিজ্ঞান এবং বিশেষত আলোর প্রতিফলন সম্পর্কে তাঁর একাদিক গ্রন্থ রয়েছে। আল কিন্দি অস্ত্রের জন্য লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ছোট ছোট বই লিখেন।"[১০৮]

পদার্থ বিজ্ঞানে 'আল বেরুনী'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পদার্থ বিজ্ঞানে তার বৃহত্তম অবদান হচ্ছে, প্রায় সঠিকভাবে আঠারোটি মূল্যবান পাথর ও ধাতুর সুনির্দিষ্ট ওযন নিরূপন। আল বিরুনীর মনি-মুক্তা সম্পর্কিত অসম্পাদিত একটি বিরাট গ্রন্থ অপরূপ পাণ্ডুলিপি আকারে এসকোরিয়াল"[১০৯] লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। এতে স্বাভাবিক, বাণিজ্যিক ও চিকিৎসার দৃষ্টিকোণ থেকে বিপুল সংখ্যক পাথর ও ধাতুর বিবরণ দেয়া আছে।"[১১০] পদার্থ বিদ্যায় যার নাম স্মরণ না করলেই নয়, তিনি হচ্ছেন একাদশ শতাব্দির হাসান ইবনু হায়সাম। যিনি একাধারে পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ ও চিকিৎসক। 'মূসা ইবনু শাকির'- এর পুত্র মুহাম্মদ, আহমাদ এবং হাসান এর রচিত যন্ত্র সম্পর্কিত প্রাচীনতম গ্রন্থ 'বুক অব আর্টিফিসেস'। এটি প্রকাশিত হয় আনুমানিক ৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। এ গ্রন্থটিতে একশত কৌশলগত নির্মাণের বিষয় উল্লিখিত রয়েছে যার মধ্যে ২০ টির ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে।"[১১১] ইবনু সিনা 'আলার নামে উৎসর্গকৃত দর্শন' (দি ফিলোসফি ডেডিকেটেড টু আলা) শিরোনামে পারস্য ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন । এটি সম্ভবত পদার্থ বিদ্যার জন্য অতীব গুরুত্বত্বপূর্ণ।"[১১২]

আল খাযিনি পদার্থবিদ্যার উপর একটি বিশাল গ্রন্থ লিখে শেষ করেন ১১২১-২২ খ্রিষ্টাব্দে। তার নাম দেন 'কিতাব মিজান আল হিকমাহ' বা জ্ঞানের দাঁড়িপাল্লার বই। বইটি আট খণ্ডে সমাপ্ত। ইতিহাসবিদ জোসেফ নিদহাম লিখেছেন, The History of windmills

---

১০৭. *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

১০৮. *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৮-৩২৯

১০৯. এসকোরিয়াল: এটি একটি রাজকীয় বাসভবন, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের কাছাকাছি অবস্থিত যা স্থাপিত হয়েছে ১৫৮৪ সালে। উদ্ধৃত: http://en.wikipedia.org/wiki/E1-Escorial

১১০. *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১

১১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৮

১১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮২

really begins with Islamic culture and in Iran'| বায়ু প্রবাহ দ্বারা চালিত কল (windmill) এর ইতিহাসের শুরু আসলেই সেই মুসলিম বিশ্বে, মুসলিমদের হাত থেকে। নবম শতাব্দীতে বিজ্ঞানী বনী মূসা ভ্রাতৃদ্বয়ের লেখা যন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ 'কিতাব আল হাইয়াল' এ সর্বপ্রথম বায়ুকলের উল্লেখ করা হয়। যদিও এর এক শতাব্দী পর সিস্তান"[১১৩] এর বায়ুকল সম্পর্কে মুসলিম ভূগোল বিদরাই প্রথম জানান। নিদহামের ভাষ্যমতে, ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে মুসলিমদের আনুভূমিক বায়ুকল ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তখন এর নকশাকে বলা হতো নুভো যন্ত্র বা নতুন যন্ত্র।

দশম শতাব্দীতে বিজ্ঞানী আল খারিযমীর লেখা দশটি অধ্যায়-সম্বলিত বই 'মাফতীহ আল উলম' (বিজ্ঞানের চাবি)-বইটিকে প্রযুক্তির বিশ্বকোষ বলে আখ্যা দেয়া হয়। বিভিন্ন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের নাম ও নামের উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং এগুলোর নির্মাণ-পদ্ধতির তথ্য ও ব্যবহার-প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। আর 'কিতাব আল হাইয়াল' এ ১০৩ টি যন্ত্রের মডেল একে দেখিয়েছেন যেগুলোর ৯৩ টি বনী মূসা ভ্রাতৃদ্বয়ের আবিষ্কৃত। যার পাণ্ডুলিপি বর্তমানে তোপকাপি'[১১৪] সারা'ঈ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

৩.১.৩ চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলিমগণের অবদান

চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমগণের অবদান অতুলনীয়। এর মধ্যে আল রাজি উল্লেখযোগ্য। তিনি নিঃসন্দেহে মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ও সর্বকালের অন্যতম শেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তিনি কেবল মুসলিম জগতের মধ্যে নয়, সমস্ত মধ্যযুগের মধ্যে তিনি তীক্ষ্মতম মৌলিক চিন্তাবিদ ও শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসাবিদদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ল্যাটিন পাশ্চাত্যে 'রাযেস' নামে পরিচিত। তিনি ২০০ টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন, যার অর্ধেক চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত। তার বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত রচনায় তিনি পৃথক পৃথক রোগের বিষয় আলোচনা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পিত্তাশয় ও মূত্রাশয়ের পাথর সংক্রান্ত রোগ। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কেও তিনি গ্রন্থ রচনা করেন।"[১১৫] হাম ও বসন্ত রোগ সম্পর্কে বিস্তৃত বই 'আল জোদারি ওয়াল হাসবাহ' তারই লেখা। নিতান্তই সংগতভাবে এ বইটিকে আরবী চিকিৎসা সাহিত্যের অন্যতম অলংকার মনে করা হয়। তিনি আরোও একটি বই রচনা করেন তার নাম 'আল হাবী'। এ গ্রন্থে সর্বপ্রকার রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাসহ চিকিৎসার প্রণালী ও ঔষুধের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত ছিল।

---

১১৩. সিস্তান: এটি ইরানের একটি ঐতিহাসিক আধুনিক পূর্ব অঞ্চল। উদ্ধৃত: http://en.wikipedia.org/wiki/Sistan

১১৪. তোপকাপি: উসমানীয় শাসনামলের এক অপূর্ব নিদর্শন তোপকাপি প্রাসাদ। এটি শুধু উসমানীয় সুলতানদের বাসস্থানই নয় ইস্তাম্বুলের প্রশাসনিক ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহার করা হত। ঐতিহাসিক এ রাজকীয় প্রাসাদটি তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে অবস্থিত।

১১৫. *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০-৩৩১

চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে এ গ্রন্থ ইউরোপীয় গবেষণা জগতে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

'ইবনে সিনা' বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিশারদ ও দার্শনিক। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার অসামান্য অবদানের জন্য তাকে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র ও চিকিৎসা প্রণালী ও শল্য চিকিৎসার দিশারী মনে করা হয়। চিকিৎসা বিষয়ে 'কানূন ফিত তিব্ব' গ্রন্থটি একটি নিখুঁত সৃষ্টি। এ গ্রন্থটির উপর নির্ভর করে ইউরোপের ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর সমমানের কোনো বই আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারেনি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বছরের মধ্যে ল্যাটিনে এর পনেরটি এবং হিব্রুতে একটি সংস্করণ হয়। কিছুকাল আগে ইংরেজিতে এর আংশিক অনুবাদ হয়। ডাক্তার উইলিয়াম অসলা এর ভাষায়, এ গ্রন্থটি অন্য যেকোনো গ্রন্থের চেয়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত 'মেডিকেল বাইবেল' হিসেবে টিকে ছিল।"[১১৬] চিকিৎসা সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞানের আশ্চর্য রকম সন্নিবেশ থাকার কারণে এ গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বৃহৎ সংঘ বলা হয়।"[১১৭] দু'জন অন্যতম মুসলিম চিকিৎসক হচ্ছেন "ইবনু জুহর" ও 'ইবনু রুশদ'। ইবনু যুহর আল মোহেড রাজদরবারে একজন অভিজাত চিকিৎসক ছিলেন। তার প্রধান রচনা ফ্যাসিলিটেশন অব ট্রিটমেন্ট এর আরবি আত তায়সীর নামে পরিচিত ছিল। এটি ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসে জনৈক ইয়াহুদীর সহয়তায় প্যারাভিসিয়াস কর্তৃক 'থেইসির' শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়।

ইবনু জুহর-এর শিষ্য ও বন্ধু ইবনু রুশদ এরিষ্টলীয় শ্রেষ্টতম দার্শনিকদের অন্যতম ছিলেন। এর সাথে তিনি বিখ্যাত চিকিৎসকও ছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর ১৬ টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে 'কুলিয়াত ফিত তিব্ব' (জেনারেল রুল্স ও মেডিসিন) গ্রন্থটি ল্যাটিন অনুবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয়।"[১১৮] এছাড়াও চিকিৎসা বিশারদ 'আলী তাবারী' কয়েকটি গ্রন্থ লেখেন। তার মধ্যে ফিরদাওস আল হিকমাহ ফিত তিব্ব বা 'চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্বর্গ' নামক সর্বাপেক্ষা গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ।"[১১৯] এছাড়াও চিকিৎসা বিজ্ঞানে আরো অনেক মুসলিম মনীষীর নাম রয়েছে যাদের সকলের তালিকা এ ক্ষুদ্র পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

---

১১৬. *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

১১৭. মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, ৯ম-১০ম শ্রেণী* (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৩), পৃ. ৯৫

১১৮. *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

১১৯. *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৩.১.৪ জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলিমগণের অবদান

জ্যোতির্বিজ্ঞানেও মুসলিম মনীষীগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। এর মধ্যে মুসা আল খারিজমি অন্যতম। গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা ও সাধনায় তার সারা জীবন কেটেছিল। তিনি সৌরমণ্ডল ও জ্যোতির্মণ্ডল সম্মন্ধে গবেষণা করে পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।"[১২০] এরপর রয়েছেন ইবনু বাজা। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তার প্রণীত গ্রন্থ ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে বহু পণ্ডিত মৌলিক গবেষণায় অগ্রসর হন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান, দর্শনসহ আরো অনেক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তদবির উল মুতাওয়াহিত তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম। ইবনু আমাজুর তিনি যে উচ্চস্তরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন তা পরবর্তী বিজ্ঞানী কর্তৃক তাঁর পর্যবেক্ষণের নির্ণয় ফলের দৃষ্টান্ত ব্যবহার থেকেই বুঝা যায়। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইবনু ইউনুস তার পুস্তকে ইবনু আমাজুরের অনেক তথ্য উল্লেখ করেন।

আল ফারাগিনী জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। তার রচিত Elements of Astronomy গ্রন্থটি পাশ্চাত্যে বহুল সমাদৃত। কিছুদিন পূর্বেও প্রাচ্য জগতে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। আল মাহনী জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে কতগুলো প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। বিজ্ঞান জগতে তাকে প্রসিদ্ধ করেছে যে গবেষণা ও সাধনা, তা হলো অর্কিডিমিসের প্রবর্তিত ও প্রচলিত গোলক সমন্ধে গবেষণা। গোলক সম্পর্কে অধুনা যতগুলি প্রণালী আছে, তার সবগুলো সম্পর্কেই তিনি আলোচনা করেন।"[১২১]

১৩ শতকেই ইরানের পণ্ডিতরা সৌরজগতের একটি মডেল দাঁড় করান, কোপার্নিকাস"[১২২] যার ধারণা দেয় ১৫ শতকে। তাছাড়া আবুল হাসান ও 'আলী ইবনু আমাজুর-এ দুই মুসলিম বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে সর্ব প্রথম চন্দ্র সম্পর্কে গবেষণায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন।[১২৩] চন্দ্র পৃষ্ঠে তিনটি জ্বালামুখ বা creators তিনজন মুসলিম বিজ্ঞানীর নামে নামকরণ করেছে প্যারিসের ইন্টারন্যাশনাল আস্ট্রনমিকাল ইউনিয়ন। আরো ১৩ জন মুসলিম বিজ্ঞানীর নামে চন্দ্র পৃষ্ঠের বিভিন্ন পর্বত, উপত্যকা ইত্যাদি নামকরণ করা হয়েছে। এ থেকেই বুঝা যায় জ্যোতির্বিজ্ঞান এ মুসলিমদের অবদান কত!

---

১২০. *অধঃপতনের অতল তলে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১২১. *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬০

১২২. কোপার্নিকাস (জন্ম: ১৪৭৩ মৃত্যু: ১৫৪৩ খ্রি.): একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনিই প্রথম আধুনিক সূর্য কেন্দ্রিক সৌরজগতের মতবাদ প্রদান করেন। উদ্ধৃত: http://bn.wikipedia.org/wiki/নিকোলাউস-কোপের্নিকুস

১২৩. *অধঃপতনের অতল তলে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৩.১.৫. দর্শনে মুসলিমগণের অবদান

দর্শন হল তত্ত্বজ্ঞান যুক্তি ও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র বা তত্ত্ব। অষ্টম শতাব্দির প্রথম ভাগ থেকেই ইরাকের কুফা ও বাসরা দর্শন ও সাহিত্য চর্চার জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠে।"[১২৪] এছাড়া 'ইবনু বাজা'র দার্শনিক খ্যাতি তার অন্যান্য সকল খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়েছিল। তাঁর গ্রন্থসমূহ ইবনু রুশদ এর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আরব দার্শনিক আল কিন্দিকে ন্যায়সঙ্গতভাবে মুসলিম দর্শনের পথিকৃত বলে অভিহিত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে তিনি আরবদের দার্শনিক নামে পরিচিত। দার্শনিক জ্ঞানের প্রতিটি দিকের উপর আলোকপাত করে তিনি বহু বই লিখেছেন। শুধু তাই নয় অঙ্ক শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতি তখনকার প্রচলিত সমস্ত শাখায় তার অবদানে সমৃদ্ধ ছিল। এছাড়া দর্শন, ধর্ম শাস্ত্রের পাণ্ডিত্বেই তিনি ছিলেন সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন। তার এ পর্যন্ত ২৭০ টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর বারো শতকের টমাস অকুইনাস"[১২৫] সহ সমগ্র ইউরোপের উপর একাধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।"[১২৬]

আল কিন্দির ন্যায় আল ফারাবী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনু খাল্লীকান তাকে মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে প্রশংসা করেন। বিশেষভাবে দর্শনের জন্যই তিনি পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্য তাকে দ্বিতীয় এরিস্টটল"[১২৭] বলা হয়। ইবনু বাযা ও জাবির যখন টলেমির নানা ভ্রান্ত মতের সংশোধন করেন, তখনি বনু তোফায়েল নানা দিক থেকে তাদেরকে সহায়তা করেন। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে তোফায়েল ও অন্য বৈজ্ঞানিকগণ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, টলেমির মতবাদ ভুল।"[১২৮] কেউ কেউ মনে করেন যে, 'রবিনসন ক্রুসো'[১২৯] এর মূল উৎস ইবনু

---

১২৪. *বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১২৫. টমাস আকুইনাস (জন্ম ১২২৫-মৃত্যু ১২৭৪ খ্রি.) তিনি ছিলেন একজন ক্যাথলিক ধর্মবেত্তা এবং সন্ন্যাসীপন্থী যাজক। ইতালির নেপলসে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগে রাষ্ট্রনীতিক দর্শনের প্রধান ব্যাখ্যাদাতা ছিলেন তিনি। উদ্ধৃত: http://bn.wikipedia.org/wiki/Ugvm আকুইনাস

১২৬. *অধঃপতনের অতল তলে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১২৭. এরিস্টটল (জন্ম ৩৮৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ, মৃত্যু ৩২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ): তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তিনি রাজা ফিলিপ ও আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন। উদ্ধৃত: http://bn.wikipedia.org/wiki/এরিস্টটল

১২৮. *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১২৯. রবিনসন ক্রুসো ড্যানিয়েল ডিফো রচিত একটি উপন্যাস। ১৭১৯ সালে এ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি রবিনসন ক্রুসো নামে এক ভগ্নপোত ব্যক্তির কাল্পনিক আত্মজীবনীর আকারে রচিত।

তোফায়েল এর উল্লেখিত গ্রন্থটি। বইটি ১৬৭১ সালে ছোট (ইয়োঙ্গার) এডওয়ার্ড পোক কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়।"[১৩০]

সুবিখ্যাত মনীষী চিন্তানায়ক ইবনু রুশদ ১১২৬ সালে কর্ডোভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রহ বিজ্ঞানী চিকিৎসক ও আরাস্তুর ভাষ্যকার ছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের উপর তিনি যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন সে হিসেবে তাকে মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলতে হয়। তিনি এশিয়া বা আফ্রিকার ছিলেন যতটুকু তার চেয়ে বেশি ছিলেন ইউরোপের। পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে এরিস্টটল যেমনি ছিলেন প্রকৃত শিক্ষক তেমনি ইবনু রুশদ ছিল প্রকৃত ভাষ্যকার। মধ্যযুগে ইউরোপের খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিতদের মনে ইবনু রুশদ যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন এমন আর কোনো গ্রন্থকারই করতে পারেননি।"[১৩১]

৩.১.৬ ইতিহাসে ও সমাজবিজ্ঞানে মুসলিমগণের অবদান

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে মুসলিম জাতির মৌলিক অবদান স্বীকৃত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক শাখার মতো ইতিহাস শাস্ত্রের এক সুশীল রূপদান এবং প্রায়োগিক সমাজ বিজ্ঞানের রূপকার হিসেবে মুসলিমদের অবিস্বরণীয় অবদান পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। পবিত্র কুর'আনের জ্ঞান-চর্চার প্রতি অপরিসীম গুরুত্বারোপ এবং মহানবীর (সা.) অশেষ অনুপ্রেরণায় মুসলিমরা ইতিহাস লিখনে এগিয়ে আসেন এবং ইতিহাসের ক্রমবিকাশ ও পরিপূর্ণ রূপদানে সফল হন।

পবিত্র কুর'আন একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইতিহাসের অসংখ্য উপাদান এতে বর্ণিত হয়েছে। কুর'আনের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা মুসলিমদের ইতিহাস চর্চার মূল কারণ। ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই মানব জীবন সতত প্রবাহমান, তাই কুর'আন বিভিন্ন আঙ্গিক ও প্রেক্ষাপট বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও সভ্যতার ইতিহাস তুলে ধরেছে মানব জাতির কাছে। এক্ষেত্রে কুর'আন নিজেই ইতিহাসের অন্যতম উৎস। প্রফেসর আব্দুল হামীদ সিদ্দিকী বলেন:

The Holy Quran is not a book of history, but it is divine verdict of history. The superb style in which the Holy Quran has discussed the different phases of the lives of various nations-their rise, development and decline, as well as the causes underlying their changes- has no parallel in the historical records of the world.

---

১৩০. *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

১৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

অর্থ্যাৎ, পবিএ কুর'আন শুধু ইতিহাস বিষয়ক কোন বই নয় বরং এটি ইতিহাসের স্বর্গীয় রায়। পবিএ কুর'আন অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিভিন্ন মানুষের জীবন ধারনের প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন জনপদের উত্থান এবং পতন এবং সাথে সাথে পরিবর্তনের কারনসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছে। যেখানে অন্য কোথাও সমান্তরালভাবে পৃথিবীর ইতিহাস বর্ণিত হয়নি।"[১৩২]

এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইতিহাস বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন রয়েছে, সৃষ্টির সুচনার ইতিহাস, বিভিন্ন যুগে মানব জাতি, নবী ও সংস্কারকদের ইতিহাস, বিভিন্ন ধর্ম, আইয়ামে জাহিলিয়াতের ইতিহাস। এসব ঐতিহাসিক বর্ণনার বিশুদ্ধতা কুরআনের মাধ্যমে নির্ভরতা লাভ করেছে। কেননা আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুর'আনের বিশুদ্ধতা তর্কের ঊর্ধ্বে। ড.মরিস বুকাইলি বলেছেন, Thanks to its undisputed authenticity, the Quran holds a place among the books of revelation, shared neither by the old nor new testament. "ইতিহাস রচনার সনাতন পদ্ধতিতে কুরআন এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা যোগ করেছে। শুধু মানুষ, জনপদ, ধৃষ্টতা ও মহানুভবতার ইতিহাস নয়; এক আধ্যাত্মিক এবং শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত কুরআনের ইতিহাস সংশ্লিষ্টতার অন্যতম লক্ষ্য।"[১৩৩]

মুহাম্মদ (সা.) মানব ইতিহাস চর্চার এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইতিহাস অতীত জাতিসমুহের বিরক্তিকর কাহিণীমাত্র যেমন নয়, তাঁদের কীর্তির গৌরব গাঁথাও নয় বরং তাহা মানুষের ব্যর্থতার এক নিদারুণ দুঃখজনক আখ্যান। পরিতাপের বিষয় এই যে, কোন জাতিই তাদের পূর্ববর্তী পতিত জাতির ভুলগুলি হতে কোনও শিক্ষা গ্রহণ করেনি। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কোন জাতি যখন তাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস ও তাদের স্মৃতিসৌধ গুলোর নিদর্শন হতে শিক্ষা গ্রহণে অবহেলা করে ও আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত হয়, তখন ঐ জাতির পতন আসে। এতে বুঝা যায় যে, ইসলামী ইতিহাস চর্চার দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতি হতে একেবারাই ভিন্ন। ইসলামী ইতিহাস চর্চার পদ্ধতির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য।"[১৩৪] প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী আব্দুর রহমান ইবনু খালদুন সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাস শাস্ত্রের আবিষ্কারক ছিলেন। পৃথিবীর চিরস্মরণীয় মহান ব্যক্তিদের মধ্যে মধ্যযুগের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইবনু খালদুন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি যেসব গ্রন্থ লিখে গেছেন তার মধ্যে 'কিতাবুল ইবার-ওয়া দীওয়ানুল মুবতাদা' নামক ইতিহাস বিষয়ক রচনাটি তাকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। তিনি তার ওই

---

১৩২. Abdul Hameed Siddiqui, *The Islamic concept of History* (Kualalampur: Islamic Book Trust,1981), p. 112

১৩৩. ড. মরিস বুকাইলি, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন্স, ২০১২), পৃ. ৮২

১৩৪. *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

পুস্তকে মানবীয় জীবন যাত্রার প্রণালী ও রীতিনীতি উদ্ভাবনে আর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রূপদানে বর্ণের প্রভাব, আবহাওয়ার প্রভাব ও প্রাকৃতিক উৎপন্ন দ্রব্যের প্রভাব কিভাবে প্রতিফলিত হয় তার বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।"[১৩৫] তাঁর রচিত বিভিন্ন সময়ের কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে যার মধ্যে 'মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন' সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ।

'মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন' ইতিহাসের ভূমিকা বিষয়ক বই। দেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র ও আবহাওয়া ও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি এ সমস্তই যে ইতিহাসের বিকাশধারাকে প্রভাবিত করে এ মতবাদ তিনিই প্রথম এই বইতে ব্যক্ত করেন। তিনি জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অবনতির আইন খুজে বের করতে সাধনা করেছেন। এ হিসেবে তাকে ইতিহাসের প্রকৃত ক্ষেত্র ও প্রাকৃতিক আবিষ্কারক বলা চলে। তিনি নিজেও এ দাবি করেছেন। ইতিহাসে এমন ব্যাপক ও দার্শনিক ধারণা তার আগে কোনো আরব, এমনকি কোনো ইউরোপিয়ানদের কল্পনায় আসেনি।"[১৩৬]

তিনি ছিলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী বাকলদের পথ প্রদর্শক। কেবলমাত্র ইবনে খালদুনই নয়, বালাজুরি, হামাদানি, আল বেরুনী, আত তাবারী, আল মাসুদী ও ওয়ালিউল্লাহর এর মত শত শত বিশ্ব বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিকদের অবদান মানব ইতিহাসে প্রজ্বলিত ও উন্নত হয়েছে।"[১৩৭] সিন্ধু প্রদেশের ইতিহাসের জন্য আলী ইব্ন আব্দুল হামিদ এর 'চাচনামা' সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। হিন্দু শাসক চাচ ও তার উত্তরাধিকারীদের আমলে সিন্ধু প্রদেশের"[১৩৮] ইতিহাসই এর প্রধান বিষয়বস্তু। মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম-এর নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ইতিহাস এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও সিন্ধু প্রদেশের ইতিহাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, মীর মুহাম্মদ ইব্ন মাসুম এর লিখিত তারীখ-ই সিন্ধু। এতে মুসলিম বিজয় থেকে শুরু করে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

৩.১.৭. প্রত্নতত্ত্বে কুর'আনে কারীমের অবদান

মহাগ্রন্থ কুর'আনুল কারীমে প্রাত্নতত্ত্বের কথা রয়েছে। কিন্তু তা এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। কুর'আনে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার উদ্দেশ্য মূলতঃ এটাই যে, তা দ্বারা সমকালীন

---

১৩৫. *অধঃপতনের অতল তলে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৩৬. *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

১৩৭. *অধঃপতনের অতল তলে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৩৮. সিন্ধু প্রদেশ: পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের একটি। এখানে ঐতিহাসিক সিন্ধী জাতির লোকদের বাস। ভারত-পাকিস্তান ভাগের পরে ভারত থেকে আগত অনেক অভিবাসী মুসলমানও এখানে বাস করে। উদ্ধৃত: http://bn.wikipedia.org/wiki/সিন্ধুথপ্রদেশ

মানবজাতিকে পূর্ববর্তী জাতিসমুহের নিখাদ পরিণতি সম্বন্ধে মনোযোগ আকর্ষণ করা। তবে তা তাদের বিভিন্ন অট্টালিকা ও বিশাল অবাক করা মূর্তির জন্য নয়, বরং তারা কিভাবে জীবনযাপন করত তা অনুধাবন করার জন্য। মহাপ্রভুর মহাবিধান নতচিত্তে স্বীকার করে তারা কি তৎকালীন প্রেরিত নবীর প্রদর্শিত পথে চলত, না আল্লাহর সার্বভৌম আধিপত্য অস্বীকার করে জীবন যাপন করতো। তারা কি আসমানী বিধি বিধান মাথা পেতে নিতো, না মন যা চায় তাই করতো। যদি তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নতমস্তকে মেনে নিয়ে থাকে তাহলে তারা যে সফলকাম হয়েছিল এবং যদি শয়তানের দেখানো পথ অনুসরণ করে, তাহলে কি পরিণতি তাদের ঘটেছিল-সেটাই মানবজাতিকে অবহিত করা কুরআনে প্রত্নতত্ত্বের উল্লেখের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। যদিও শেষোক্ত দল বড় কোন সাম্রাজ্য সভ্যতার ধারক বাহক হয়েও থাকে।

আল কুর'আনের প্রত্নতাত্ত্বিক বিবেচনা ও বিশ্লেষণের মূল মানদণ্ড হচ্ছে অতীত কোন জাতির ঈমান বা বিশ্বাস। শুধু তখনই নয়, বর্তমানেও এ মাপকাঠিতে মানুষের সভ্যতার বিচার হবে। যাঁরা আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং তদীয় বিধানের প্রতি চরম শ্রদ্ধা পোষণ করে তাঁরাই সফলকাম, সত্য এবং সর্বাধুনিক প্রগতিশীল জাতি। পক্ষান্তরে পশ্চাৎপদ সত্য অস্বীকারকারীরা বিফল এবং অসভ্য গোষ্ঠী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

অর্থাৎ, "ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম।"[১৩৯]

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য আধুনিক তথা পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য কুর'আনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সংগতিহীন। এখানে মানুষের মনোযোগকে অতীতের ইতিহাসের দিকে আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে মানুষ অতীত জাতিসমুহের পরিণতি থেকে শিক্ষা পেতে পারে। একথা কুর'আনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ, "তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী এবং শক্তি ও কীর্তিতে অধিক প্রবল ছিল, অতঃপর তাদের কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি।"[১৪০]

---

১৩৯ আল-কুর'আন, ১৮ : ৪৬

এ আয়াত মানুষকে এটাই নির্দেশ করতে বলে যে, অন্যায় ও অত্যাচারীদের পরিণাম কি ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা অপর আয়াতে বলেন:

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيد

অর্থাৎ, "আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল গোনাহগার। এইসব জনপদ এখন ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছে এবং কতকূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে।"[১৪১]

এভাবে কালামুল্লাহর অসংখ্য আয়াতে মানবজাতিকে উপদেশচ্ছলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। যাতে তাঁরা পৃথিবীর জায়গায় জায়গায় ভ্রমণ করে এবং সেখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ অবলোকন করে এজন্যে যে, তারা যেনো সেইরূপ পরিণামের ভয়ে অতীত জাতির কৃতকর্মের পুনরাবৃত্তি না করে।

মোটকথা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা নিয়ে কুর'আনিক বিশ্লেষণ এবং পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীদের স্থাপত্য শিল্প, চিত্র শিল্প এবং জড় মূর্তিগুলো হতে তাদের পার্থিব অগ্রগতি বিবেচনা করে যাবতীয় অনুশীলন সীমাবদ্ধ রেখেছে এবং এদিক থেকেই তাদের অগ্রগতি ও সভ্যতা নির্ণয় করে থাকে। তাদের ধর্ম বিশ্বাস, নৈতিকতা, জীবনযাপন ইত্যাদি পদ্ধতির বিষয়ে তাঁরা আদৌ বিবেচনা করে না। তারা কি তৌহিদবাদী ছিলো নাকি বহু জড়বাদীর উপাসক ছিলো, তারা কি আল্লাহর নবীকে গ্রহণ করেছিল না মিথ্যারোপ করেছিলো? এ সমস্ত বিষয় আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার এক সুদূর প্রসারী দিক দর্শন দান করেছে। সে উদ্দেশ্য ছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা নিতান্তই অমূলক ও প্রহসন মাত্র।"[১৪২]

৩.১.৮. ভূগোল শাস্ত্রে মুসলিমগণের অবদান

ভূগোল শাস্ত্রে মুসলিমদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ইউরোপ যখন মধ্য যুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তখন নীলনদ, ইউফ্রেটিস"[১৪৩] আর টাইগ্রিস"[১৪৪] এর অববাহিকায় মাথা তুলে

---

১৪০. আল-কুর'আন, ৪০ : ৮২

১৪১. আল-কুর'আন, ২২ : ৪৫

১৪২. *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

১৪৩. ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদী: এটি দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার একটি নদী। এটি তুরস্কে উৎপত্তি লাভ করে সিরিয়া ও ইরাকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে টাইগ্রিস নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং শাত আল আরব নামে পারস্য উপসাগরে পতিত হয়েছে। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর পানি ব্যবহার করেই প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতাগুলো বিকাশ লাভ করেছিল। উদ্ধৃত: http://en.wikipedia.org/wiki/ইউফ্রেতিস।

দাঁড়িয়েছে এক বিশাল আরব সম্রাজ্য। মুসলিমগণ মিসর বিজয়ের সাথে সাথে বিশাল সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করে নাইজার নীলনদের উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত অগ্রসর হন। মুসলিম পর্যটকেরা আফ্রিকা মহাদেশের নাতাল অঞ্চলের সাথে পরিচিত হন। এভাবে ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হতে থাকে। মুসলিম ভূগোলবিদরা ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে অক্ষরেখা"[১৪৫] এবং দ্রাঘিমারেখা"[১৪৬] নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। খলিফা আল মামুন এর সময়কালে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর পরিধি পরিমাপের জন্য চেষ্টা করেন। সিরিয়ার মরুভূমিতে সিঞ্জার"[১৪৭] সমভূমিতে সম্পন্ন হয় এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। এতে স্থির হয় পৃথিবীর পরিধি হচ্ছে ২০৪০০ মাইল।

নবম শতাব্দীর শেষভাগে বাগদাদের মুসা ভ্রাতৃদ্বয় ভূগোল শাস্ত্রের আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখেন। তারা একটি আধুনিক মানমন্দির (গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করার গৃহ) স্থাপন করেছিলেন। পৃথিবীর গোলাকৃতির ভিত্তিতে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার কল্পনার দ্বারা তারা এক বিজ্ঞানসম্মত ভূগোল প্রণয়ন করেন। যখন খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা ভৌগোলিক চেতনার জগতে কাল্পনিক অবাস্তব রূপরেখা প্রকাশ করেছে, সৃষ্টি করছে এক ধোঁয়াটে পরিবেশ। এ সময় মুসলিম অঞ্চলের ভূগোলবিদরা এই শাস্ত্রটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন। তার সংস্কার সাধন করলেন। নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটালেন।"[১৪৮]

এর মধ্যে মুসা আল খারিজ্‌মির নাম অন্যতম। মার্কো, পোলো কিংবা কলম্বাসের অনেক আগেই তিনি সর্বপ্রথম মানচিত্র এঁকেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ডিগ্রির পরিমাপে পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি নিরূপণ করেন। পরবর্তীতে ইউরোপের গবেষকগণ মুসা আল খারিজ্‌মির

---

১৪৪. টাইগ্রিস ও দজলা নদী: এটি দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার একটি নদী। নদীটি তুরস্কে উৎপত্তি লাভ করে ইরাকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ইউফ্রেটিস নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং শাত আল আরব নামে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। উদ্ধৃত: http://en.wikipedia.org/wiki/টাইগ্রিস

১৪৫. অক্ষরেখা(Parallel of latitude): বিষুবরেখা থেকে দূরবর্তী উত্তর ও দক্ষিণের কল্পিত রেখা। উদ্ধৃত: ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ৬

১৪৬. দ্রাঘিমা রেখা (parallel of longitude) : কোন নির্দিষ্ট মধ্যরেখা থেকে অন্য কোন স্থানের মধ্যরেখার কৌণিক দূরত্বকে দ্রাঘিমা বলে আর দ্রাঘিমা বা দ্রাঘিমাংশ বোঝবার কল্পিত রেখাকে দ্রাঘিমারেখা বলে। উদ্ধৃত: http://www. Ovidhan.org/b2b/দ্রাঘিমা

১৪৭. সিঞ্জার: এটি একটি শহর যা ইরাকের নীনবি প্রদেশের নিকট মাউন্ট শেনগাল এর কাছাকাছি রোজাভা সীমানায় অবস্থিত। এই অঞ্চলে প্রধানত ইয়াযীদি কুর্দিদের সঙ্গে আরব এবং অ্যাসিরিয়ান সংখ্যালঘুদের বসবাস। উদ্ধৃত: http://en.wikipedia.org/wiki/Sinjar

১৪৮. আলী ইমাম, *প্রাচীন নগরীর খোঁজে* (ঢাকা: তাম্রলিপি প্রকাশনী, ২০১১), পৃ. ১৫২-১৫৩

গবেষণাকেই তাদের গবেষণার মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন।"[১৪৯] তিনি এবং তার কয়েকজন সাথী তত্ত্ববিদ 'সুরত আল আরদ' বা বিশ্বের একটি বাস্তব রূপ প্রস্তুত করেছিলেন। এটাই পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কনের মডেল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আল খারিজমি গ্রিক ভূগোলবিদ টলেমির গ্রন্থটি অনুবাদ করেন এবং তার সঙ্গে একটি মানচিত্রও সংযোজন করেন। আল খারিজ্‌মি টলেমির অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা গ্রহণ করেন, তবে তিনি তার সাথে মুসলিম দেশগুলোর বিবরণ পেশ করেন। তার উদ্যোগ দুনিয়ার মানচিত্রের একটি বাস্তবরূপ তৈরি হয়। ভূগোলবিদগণ পৃথিবীকে যে সাতটি মহাদেশ বিভক্ত করেছেন তা খারিজমির বর্ণিত সপ্ত ইক্লিমের ভিত্তিতেই। বিশ্বের মানচিত্র অঙ্কন বিশ্বের পরিধি অক্ষরেখা দ্রাঘিমা এবং জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি ব্যাপারে তার গবেষণাধর্মী জ্ঞানই পরবর্তীতে এ বিষয়টিকে উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করে।"[১৫০]

আল মুকাদ্দাসি আহসান আল তাকসিম ফিল মারিফাতি আকালীম নামে তিনি একটি বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিশ বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং এ গ্রন্থে তিনি সেসব দেশের ভৌগোলিক মূল্যবান তথ্যাদি তুলে ধরেন এবং এতে একটি মানচিত্র সংযোজন করেন। ইয়াকুত ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল হামাবির 'মুজামুল বুলদান' নামক গ্রন্থটি ভূগোল শাস্ত্রের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এতে তিনি প্রত্যেক স্থানের ঐতিহাসিক জাতি তাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পরিচয় ও ঘটনা সমূহের উল্লেখ করেছেন।"[১৫১]

বালখি সম্প্রদায়ের মাকদিমি মুসলিম জগৎকে মোট ১৪ টি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটির জন্য স্বতন্ত্র মানচিত্র প্রস্তুত করেন। বালখি সম্প্রদায়ের ভূ-চিত্রাবলি ছিল উল্লেখযোগ্য। এসব মানচিত্রে বিভিন্ন জলবায়ুভিত্তিক অঞ্চলের ভাগ ছিল। ইরানের মুসলিম ভূগোলবিদ রুশতাহের বর্ণনায় ছিল খোরাসান"[১৫২] থেকে তুস"[১৫৩] পর্যন্ত-দীর্ঘ সড়কপথের বিবরণ। ইস্পাহান"[১৫৪]

---

১৪৯. *অধঃপতনের অতল তলে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

১৫০. *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

১৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

১৫২. খোরাসান: এটি মধ্য এশিয়ার একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। মধ্যযুগে বর্তমান ইরানের উত্তরপূর্ব অঞ্চল, প্রায় সমগ্র আফগানিস্তান, দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই খোরাসানের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হত। উদ্ধৃত: http://bn.wikipedia.org/wiki/খোরাসান

১৫৩. তুস: এটি ইরানের রাজাভি খোরাসান প্রদেশের একটি প্রাচীন শহর। প্রাচীন গ্রীকদের কাছে এটি সুসিয়া নামে পরিচিত ছিল। উদ্ধৃত: http://bn.wikipedia.org/wiki/তুস, ইরান

১৫৪. ইস্পাহান: এটি ইরানের তেহরান শহরের ৩৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ইরানের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী।

থেকে হেরাত"[১৫৫] পর্যন্ত যাওয়ার বর্ণনা ভূপ্রকৃতির বিবরণ। তার তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা থেকে পরবর্তীকালে বহু অবলুপ্ত শহরের সুস্পষ্ট অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়েছে। আবু দুলাফ ভারত ভ্রমণ করে গ্রন্থ রচনা করেন, আজাব আল বুলদান অর্থ বিভিন্ন দেশের বিস্ময়। সেখানে কাশ্মীর, মুলতান, সিস্তান, মালাবার, করমণ্ডল রাজ্যের কথা রয়েছে। ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে মুহাল্লবী প্রথম আফ্রিকার সুদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইবনুয যুবাইর রচিত 'রিহালাত' ভ্রমণ বৃত্তান্ত তীর্থযাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। আল কাজভীনা রচনা করেন 'ভূগোল'। ইরান এবং মধ্য এশিয়া ভ্রমণ করে পুস্তক রচনা করেন মুস্তাওফী। আল দিমাশকির ভৌগোলিক গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতবর্ষে মালাবার এবং করমণ্ডল উপকূল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ ছিল। বিখ্যাত মুসলিম ভূগোলবিদ আল মাসউদি তার রচিত পুস্তকে প্রাকৃতিক ভূগোলের বিবরণ দেন। তার গ্রন্থের নাম মরুজ আল বাহার। তিনি মন্তব্য করেন বায়ুমণ্ডল দিয়ে আবৃত পৃথিবী। সামুদ্রিক জলোচ্ছাস নিয়ে আলোচনা করেন।"[১৫৬]

৩.২. প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির উন্নয়নে মুসলিম

ইসলাম মানুষকে বিভিন্নভাবে বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহিত করেছে। যার ভূরিভূরি প্রমাণ পবিত্র কুর'আন ও সহীহ হাদীসে বিদ্যমান। এসব বিষয় গবেষণা করে মুসলিমগণ অনেক জিনিস আবিষ্কারের শুভ সূচনাও করেছিলেন। কালক্রমে তা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হাতে চলে যায়। পবিত্র কুর'আনের বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনাকে মেনে নিয়ে ড. মরিস বুকাইলি বলেন, 'কুর'আনের এমন একটা বক্তব্যও নেই, যে বক্তব্যকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খণ্ডন করা যেতে পারে।"[১৫৭]

৩.২.১. শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমগণের অবদান

শিক্ষা মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। শিক্ষা ছাড়া কোন মানুষ কোন দিন মনুষ্যত্বের মনযিলে পৌঁছতে পারে না। শিক্ষার কারণে এবং প্রতিফলনে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষের অবস্থান সর্ব শীর্ষে। শিক্ষার এই মহান ও গুরুত্ববহ ভূমিকার কারণে যুগে যুগে মনীষীগণ এতদ সম্পর্কীয় চিন্তা-চেতনা ও গবেষণার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

---

১৫৫. হেরাত: এটি আফগানিস্তানের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তানে হারিরূদ নদীর উপর অবস্থিত। খ্রিস্টিয় ৭ম শতকে মুসলিমরা শহরটি দখল করে। উদ্ধৃত:
http://bn.wikipedia.org/wiki/হেরত

১৫৬. *প্রাচীন নগরের খোঁজে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

১৫৭. ডঃ মরিস বুকাইলি, রূপান্তর: আখতার উল আলম, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান* (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ১০

দুনিয়ার শিক্ষা বিপ্লবের ইতিহাসে ইসলাম এ কারণে গৌরব প্রকাশ করতে পারে যে, যেহেতু ইসলামের বাণীর প্রথম শব্দটিই শিক্ষার প্রধান অবলম্বন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ প্রভুর প্রথম নির্দেশই হলো-পড়ো। এরশাদ হচ্ছে,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

অর্থাৎ, "পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন । শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।"[১৫৮]

ইসলাম আগমনের সাথে সাথে শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করলো। এক্ষেত্রে কুর'আন হলো মূল নির্দেশক এবং আল্লাহর রাসুল (সা.) হলেন মূল প্রশিক্ষক। আল্লাহ ও তাঁর আল্লাহর রাসুল (সা.) এর দেয়া শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো জানার এবং জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব স্রষ্টার মহিমা ও একক সার্বভৌমত্ব অনুসরণের মাধ্যমেই মানব কল্যাণে নিয়োজিত থাকা। মুসলমিগণ পেরেছে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাদের অসাধারণ অবদান রাখতে। মুহাম্মদ (স.) এর শিক্ষার প্রভাবে ও প্রত্যক্ষ প্রেরণায় ইতিহাসের অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত জাহেল আরবরা পরিণত হয় এক সুসভ্য শিক্ষিত জাতিতে। শুধু তাই নয়, তাঁরা সমগ্র দুনিয়ার মানুষের জন্য শিক্ষার অনন্য মডেল হয়ে রয়েছেন আজও। কুর'আন, হাদীস, ইবাদত, আখলাক ছিল তার শিক্ষার পাঠ্যক্রম। মসজিদ ছিলো তার ব্যবহৃত প্রথম শিক্ষায়তন।"[১৫৯]

মহানবী (সা.) জীবদ্দশায় মদীনায় ৯ টি মসজিদ ছিলো। এখানে সমবেত হতো নিকটবর্তী অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। এর পদ্ধতি ছিলো উন্মুক্ত। যা হতে আজ কালকার বিশ্ব Open University এর ধারণা লাভ করেছে। মহানবী (সা.) নিজে ছাড়াও অগ্রসর শিক্ষিত সাহাবাগণ এখানে শিক্ষাদানে রত থাকতেন। এদের দুজন ছিলেন হযরত আলী (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.)। যাদের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে আমীর আলী উল্লেখ করেছেন:

In the public mosque at Medina, Ali and his cousin Abdullah the son of Abbas, delivered weekly Lectures on philosophy and logic, the traditions, history, rhetoric and law, whist other dealt with

---

১৫৮. আল-কুর'আন, পৃ. ৯৬: ১-৫

১৫৯. *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

other subject. অর্থাৎ, "মসজিদে নববীতে হযরত আলী (রা.) এবং তার চাচাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) প্রতি সপ্তাহে দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, আচারানুষ্ঠান, ইতিহাস অলংকারশাস্ত্র, এবং আইনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাষন প্রদান করতেন। বিভিন্ন সময় অন্য বিষয় নিয়েও আলোচনা করতেন।"[১৬০]

রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদের মধ্যে একটি বিরাট দল শিক্ষকরূপে পরিচিতি পেয়েছিলেন। বস্তুত প্রত্যেক সাহাবীই ছিলেন পরবর্তী মানুষ ও জনগোষ্ঠীর জন্য এক একজন আদর্শ শিক্ষক। হযরত উমর, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, যায়িদ ইবনে সাবিত ও হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন প্রথম কাতারের সুবিজ্ঞ ও পণ্ডিত। এছাড়া বিশজন দ্বিতীয় সারির এবং ত্রিশজন ছিলেন তৃতীয় সারির পণ্ডিত।"[১৬১]

মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার বুনিয়াদ খোলাফায়ে রাশেদার আমলে ব্যাপক ও বিস্তৃত রূপ লাভ করে। প্রথম যুগের তুলনায় এ যুগে পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা শুরু হয় যদিও তা ছিল মসজিদ কেন্দ্রীক শিক্ষার অন্তর্গত। এ সময়ে তাফসীরুল কুরআন, হাদীস, ফিকাহ শাস্ত্র ও প্রাক ইসলামী কবিতা পাঠ স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইসলামের প্রথম যুগের শিক্ষার ইতিহাসে আরেকটি দিক ছিলো বন্দী ও জিম্মি শিক্ষিত লোকদের ও মুসলিম অশিক্ষিতদের শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হতো। একদিকে যেমন এটি শিক্ষা বিস্তারের সুন্দর পন্থা অপরদিকে যথাযথ সম্মানজনক মানবাধিকার এতে হেফাযত থাকে।

চার খলীফার মধ্যে হযরত উমর (রা) শিক্ষার প্রসারে কাজ করেন। ইসলামী শিক্ষার উপর পাঠ দান করার জন্য তিনি দামেশকে, বসরা, কুফা প্রভৃতি বিখ্যাত শহরে বিদ্বান শিক্ষদের প্রেরণ করেন। সপ্তদশ হিজরিতে কুর'আন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। মসজিদ ভিত্তিক এসব শিক্ষায়তনে জমায়েত হতো বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী। শুধু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের অধীনে ছিল চার হাজার শিক্ষার্থী। সিরিয়ার রাজধানী দামেশকে প্রতি ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক থাকতো। অভিভাকদের উপর খলীফার নির্দেশ ছিল ছেলে মেয়ে শিক্ষায়নে তাগিদের ব্যাপারে। হযরত উমর (রা.) এর এ ধরনের একটা তাগিদের উল্লেখ করেছেন আমির আলী- You should make them learn well known proverbs, wise sayings and good poetry. "[১৬২]

---

১৬০. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, *দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম* (ঢাকা: জ্ঞানবিতরনী প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ২০৪
১৬১. *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

১৬২. *দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

মোটকথা, আরব উপদ্বীপের লোহিত সাগর হতে নীলনদ, স্পেনের জিব্রাল্টা হতে বঙ্গোপসাগরের ঢেউমালা পর্যন্ত বিস্তৃত শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম অবদান পৃথিবীতে এক স্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করে। মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণ ফসল তারাই প্রমাণ বহন করে যুগ যুগ ধরে।

৩.২.২. প্রযুক্তির উন্নয়নে মুসলিমগণের অবদান

বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্রান্তিকালেই ঘটেছিলো ইসলামের আবির্ভাব। প্রাচীন সভ্যতাগুলো তখন ধুকে মরছিল। বিজ্ঞানীদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল ধর্মবিরোধী অপবাদ দিয়ে। দেশান্তর করা হচ্ছিল গ্রীক বিজ্ঞান আলোকদের। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে মানব জাতির মুক্তির সাথে সাথে বিজ্ঞান জগত ও যেন হাফ ছেড়ে বাচলো। অনতিকালের মধ্যেই প্রাচীন বিজ্ঞানের উদ্ধার ও চর্চা শুরু করে দিলো মুসলিম দুনিয়া। পবিত্র কুর'আনে কারীম এবং মহানবীর (সা.) প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় মুসলিমরা বিজ্ঞান সাধনার যে জ্বলন্ত আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করে তা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে বিরাজিত রয়েছে।

এই সম্পর্কে হাশিম বিন আব্দুল হাকিম বলেন, "মুসলিম বিজ্ঞানীরাই গ্রীক, রোমান কিংবা বাইজেন্টাইন্দের চেয়েও প্রযুক্তিকে বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। ইউরোপের মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে ইউরোপীয় গবেষকদের এমন ধারণা স্পষ্টতই বদ্ধমূল হয়েছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে অবদান রাখার জন্য মুসলিম বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণ যথোপযুক্তভাবে সম্মানিত হয়েছেন।"[১৬৩]

যেসব পুস্তকে এসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে তা হচ্ছে আল খারিয্মীর গ্রন্থ মাফাতিহ আল উলম, আল ফারাবির এহসা আল উলম, দশম শতকে এনসাইক্লোপিডিয়া রাসাইল ইখওইয়ান আল সাফা, ইবনু সিনার কিতাব আল নাজাত, ইবনু আল নাদিম এর বিখ্যাত জীবনী সংক্রান্ত অভিধান আল ফিহরিস্ত, ইবনু খালদুনের মহাবিশ্বের ইতিহাস বিষয়ক বিখ্যাত বই মুকদ্দমা, আল আমিরির আল ইলম বী মানাক্বিব আল ইসলাম, ইত্যাদি বইয়ে বিজ্ঞানের সাথে প্রযুক্তির সম্পৃক্ততা দেখানো হয়েছে। বিজ্ঞানের থিওরির বাস্তব প্রয়োগ প্রযুক্তির ফলে সম্ভব হয়েছে, এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইবনু খালদুন, বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানী তুস কুবরু জাদেহ প্রমুখ। পূর্বে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ প্রযুক্তিকে যদি বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে নির্ণয় করে না যেতেন তাহলে আজকের বিজ্ঞানে প্রযুক্তির উন্নত থেকে উন্নততর ব্যবহারে বিশ্ব যে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে তা হয়তো অনেকটা অধরাই থেকে যেত।

---

১৬৩. হাশিম বিন আব্দুল হাকিম, *শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের কাছে ঋণী* (ঢাকা: আফরোজা প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ৬৫

৩.২.৩. স্থাপত্য শিল্পে মুসলিমগণের অবদান

জেরুজালেমে উমারের মসজিদ, কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলে সেন্ট সফিয়া মসজিদ, কর্ডোবা মসজিদ, স্পেনের আলহামরা, দিল্লির দেওয়ানে আম, দেওয়ানে খাস, মতি মসজিদ, আগ্রার তাজমহল, জামে মসজিদসহ বিভিন্ন ইমারত নির্মাণ ও নকশা প্রভৃতি তৈরি করে মুসলিমগণ বিশ্বের স্থাপত্য শিল্পে এক উচ্চস্থান দখল করেছে। "গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড"[১৬৪] তৈরি করে মুসলিমরাই রাস্তা তৈরির পথ দেখিয়েছে। ভারতবর্ষে মোঘল শাসনামলের অসমান্য কীর্তি বলে বিবেচিত আগ্রা পোর্ট। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর একটি মোঘল পেইন্টিং লন্ডনের ভিক্টোরিয়া আলবার্ট জাদুঘরে রক্ষিত আছে। চিত্রটি সুপারভাইজিং এর প্রমাণের দিক থেকে অশেষ মুল্যবান। আল মুকাদ্দাসি এবং ইবনু হাওয়াল এর মতো ভূগোলবিদগণ দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, একই সাথে ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে সেসব এলাকার বিভিন্ন অবস্থা ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লিখেছেন। তাদের সেসব লেখনী থেকে বহু রাস্তাঘাটের বিবরণ পাওয়া যায়। মুসলিমরা আইবেরিয়ান পেনিনসুলাতে"[১৬৫] তাদের নিজস্ব সেচ-পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিল, যাতে বৃষ্টির জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রত্যাশা কিছুটা কমে এবং বলা যায় তাঁরা সফল হয়েছিল।

আধুনিক স্পেন মুসলিম স্পেনের যেসব সেচ-পদ্ধতি এখনো সযত্নে লালন করে চলছে। এখনো চাষাবাদ সম্পর্কিত প্রচুর স্প্যানিশ শব্দের মূল খোঁজলে আরবী উৎসের খোজ পাওয়া যায়। আইবেরিয়ান পেনিনসুলাতে মুসলিম প্রকৌশলীরা গুয়াদালকুইভির"[১৬৬] ঘিরে এবরো"[১৬৭] বরাবর বয়ে যাওয়া নদীগুলোর উপর বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। এই বাঁধগুলোর চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলোর নির্মাণ সামগ্রী। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে লেখক আল ইদ্রীস এর লেখায় কর্ডোভাস্থ গুয়াদালকুইভির নদীর উপর নির্মিত এ রকম

---

১৬৪. গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড: এটি এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন ও দীর্ঘতম সড়ক পথ। দুই শতাব্দীরও অধিক সময় এটি উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে সংযুক্ত করে রাখে। এটি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া হয়ে পাকিস্তানের পেশাওয়ারের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত পৌছায়। এর প্রাক্তন নামের মধ্যে ছিল উত্তরপথ, শাহ রাহে আজম, সড়কে আজম, বাদশাহী সড়ক। উদ্ধৃত : http://bn.wikipedia.org/wiki গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড

১৬৫. আইবেরিয়ান পেনিনসুলা: এটি তৃতীয় বৃহত্তম ইউরোপীয় উপদ্বীপ। এটা ইউরোপীয় মহাদেশের একেবারে দক্ষিণ- পশ্চিমে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৫৮২.০০০কি.মি.।

১৬৬. গুয়াদালকুইভির: এটা আইবিরিয়ান উপদ্বীপের পঞ্চম দীর্ঘতম নদী এবং তাঁর সম্পূর্ণ দৈর্ঘের সঙ্গে স্পেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী।

১৬৭. এবরো: এটি আইবেরিয়ান উপদ্বীপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। উদ্ধৃত: http://bn.wikipedia.org/wiki/Ebro

বাঁধের বর্ণনা পাওয়া যায়। মার্বেলের স্তম্ভবিশিষ্ট এই বাঁধ নির্মিত হয়েছিল মিসরীয় পাথর দিয়ে। ৯৬০ খৃষ্টাব্দে ইরানের কুর নদীর উপর একটি বিশাল ও উচ্চাকাঙ্খী প্রজেক্ট দাড় করান বায়েজিদ আমীর আসুস আদুদ আল দাওলা। যা এখনো দূরপ্রাচ্যে বিস্ময় বলে বিবেচিত হয়।"[১৬৮]

নবম শতকের শেষার্ধ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর বহু সামরিক স্থাপত্যের সৃষ্টি হয়। এ কথা স্বীকার করে হয় যে, এ ব্যাপারে ক্রুসেডাররা সিরিয়া ও মিসর থেকে বহু ধারণা সংগ্রহ করে, কারণ এর কয়েক শতক আগে সিরিয়া ও আর্মেনিয়ায় দুর্গ নির্মাণ কৌশল উচ্চতর পর্যায়ে বিকশিত হয়। ইউরোপীয়রা এ সুত্র থেকেই 'ম্যাচিকলেশন'[১৬৯] এর ব্যবহার শিখে। যেমন ১০৮৭ সালে কায়রোর ম্যাচিকোলিস প্রতিষ্ঠিত একটি ফটক বাব আন-নাসর। এর এক শতক পরে ইউরোপে সর্ব প্রথম এসব দৃষ্টান্ত দেখা যায়।"[১৭০]

মিসর ও সিরিয়া থেকে ধার করা সামরিক স্থাপত্যের ওপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন দুর্গের 'সমকোণী' বা 'বক্র' প্রবেশ পথ। রোমান ও বাইজেন্টাইন"[১৭১] দের সমর বিজ্ঞানে এ ধরনের প্রবেশ পথ সর্বপ্রথম বাগদাদের গোলাকার নগরীতে ব্যবহৃত হয় অষ্টম শতকে। বুমারিসে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত থাকলেও ইংল্যান্ডে এগুলো সামান্য দেখা যায়।"[১৭২] সুদর্শন মুসলিম মিনার বিশেষ করে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের কায়রোর মিনারগুলো ইতালীর পরবর্তী কালে ক্যাম্পনিলিকে প্রভাবিত করেছে এবং সেখান থেকেই রেন এর কতিপয় সুদর্শন 'সিটি

---

১৬৮. *শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে 'বিশ্ববাসী' মুসলিমদের কাছে ঋণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১৬৯. ম্যাচিকলেশন: ঘন ঘন সন্নিবেশিত দেয়াল সংলগ্ন ব্র্যাকেট ব্যবস্থা যা একটি উদ্গাত নিচু পাঁচিলের সৃষ্টি করে। প্রতি জোড়া ব্র্যাকেটের মধ্যস্থলে একটি ফাঁকে বদ্ধ অবস্থায় একটি ঠেলা দরজা থাকে। অবরোধকারীরা দেয়ালের নিচে বিস্ফোরক দ্রব্য স্থাপনের চেষ্টা করলে এসব ফাঁক পথে তাদের মাথায় উপর তীর, গরম তেল বা পানি এবং অন্যান্য জিনিস নিক্ষেপ করতে পারে।

১৭০. *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫-১৯৬

১৭১. বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য (৩৩০-১৪৫৩ খ্রি.): এই সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল রাজধানী কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে। এই সাম্রাজ্যের ওপর নাম হচ্ছে পূর্বাঞ্চলীয় রোমান সাম্রাজ্য যদিও পশ্চিমাঞ্চলের রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী যুগকে বিবেচনা করলেই কেবল এ নামটি কার্যকারিতা লাভ করে।

১৭২. *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬ .

স্টাপল"[১৭৩] এর উদ্ভব হয়।"[১৭৪] এভাবেই মুসলিমগণের স্থাপত্য অবদান ইউরোপকে প্রভাবান্বিত করে।

৩.২.৪. সংগীতে মুসলিমগণের অবদান

ইসলামের আবির্ভাব পূর্বে আরবে সংগীতের জোর প্রচার ছিলো কিন্তু তা ছিল কলুষিত। গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় ও সংগীতের ভাল কদর ছিল। পরিবেশের এ পটভূমিতে আরব মুসলিমরাও সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপরও মুসলিমগণ অসংখ্য দেশ, বিশেষ করে রোম, পারস্য, চীন, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপে ও পশ্চিম এশিয়ার মতো দূরাঞ্চলসমুহ জয় করে তথাকর শিল্প সংস্কৃতির প্রতি কিছু না কিছু আকৃষ্ট হয়। এর ফলে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সাথে সাথে তারা সংগীত বিদ্যার নানা প্রশাখায় জড়িয়ে পড়ে।

আব্বাসীয় আমলে সংগীতের স্বর্ণ যুগ সুচিত হয়। আব্বাসীয় খলীফা হারূন ও মামুন সংগীতের সর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। এ সময় আবুল ফারাজ ইস্পাহানী আরবীতে ২১ খণ্ডে বিভিন্ন সংগীত প্রণয়ন করেন। তিনি এতে ১০০ প্রকার স্বরলিপি চিহ্নিত করে এর প্রকৃতি ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোকপাত করেন। রাজধানী বাগদাদে বহু সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সংগীত সম্পর্কিত অনেক গ্রীক গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়। ইব্রাহিম ও ইসহাক মাওসালী নামক দুজন সংগীত ও সুরশিল্পী সে যুগের শ্রেষ্ঠ সুরকার ছিলেন। খলীফা আল ওয়াসিক নিজেই ছিলেন এক মহান সংগীত প্রতিভা যিনি প্রথম বীনার ব্যবহার ও ১০০ প্রকার সুর উদ্ভাবন করেন। খলীফা মুন্তাসির ও মুতাজিদ-সংগীতের সমঝোদার ছিলেন। শাহাযাদী ও উচ্চ বংশীয় মহিলারাও সংগীত জলসার আয়োজন করতেন এবং সংগীত চর্চা করতেন। তাদের জলসায় শত শত গায়ক-গায়িকা যোগ দিত। কায়রোর বিশ্বখ্যাত দারুল হিকমায় অন্যান্য সকল বিষয়ের সাথে গান বাদ্য ও শেখানো হতো।

মুহাম্মদ নূরুল আমীন এ প্রসঙ্গে বলেন, "ইউরোপে মুসলিম স্পেনের শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সেভিল প্রাচ্যের দামিশকের স্থান লাভ করেছিল। বলা হয় স্পেনের কর্ডোভা ছিল গ্রন্থের আর সেভিল ছিল সংগীত বাদ্যের নগরী। স্পেনের শাসকদের মধ্যে হিশাম ও দ্বিতীয় আব্দুর রহমান সংগীতের শ্রেষ্ঠ উৎসাহদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আব্দুর রহমান কর্ডোভায় সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বাগদাদের নির্বাসিত গায়ক জিরাবকে আপন দরবারে স্থান দান করেন"।"[১৭৫]

---

১৭৩. সিটি স্টাপল: কোন ভবনের বিশেষত গির্জার প্রধান অংশ থেকে উঁচু টাওয়ার, যার চূড়া সাধারণত সরু হয়।

১৭৪. *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১ .

১৭৫. *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে আরবে ইসলাম আগমনের প্রথম শতকেই। এখানেও ইসলামী কৃষ্টি কালচারের বৈপ্লবিক প্রসারের সাথে সাথে সংগীতের চর্চা শুরু হয়। সিন্ধু বিজয়ের পর ভারতের শাসকদের মধ্যে সুলতান মাহমুদ এর সময়কালে সিন্ধু, পানজ্যাব, ও উত্তর ভারতে সংগীতের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। প্রধানত আধ্যাত্মিক ভাবদ্বারা ছিলো এর উপপাদ্য। আলাউদ্দিন খিলজীর সময় বাহরুজ ও চাংগী প্রমুখ শিল্পী রাজ আসন অলংকৃত করেছিলেন। কিন্তু সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের সময়কাল ছিল সংগীতের উৎকর্ষের মূল কাল। উপমহাদেশের বিখ্যাত কবি ও সংগীতকার আমীর খসরুর চেষ্টায় গযল ও আধ্যাত্মিক সংগীতের প্রভূত সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়।

উপমহাদেশে সংগীতের উন্নয়নে মুসলিমগণের অন্যন্য অবদান রয়েছে। ইংরেজরা দেশ দখলের পর যখন এখানকার সংস্কৃতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয় তখন অয্যোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সংগীতের রক্ষা হয়। খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর ও বাংলার গভর্নর শাহ সুজা মোঘল দরবারের দুজন নামকরা সংগীত শিল্পী মিসরি ও রঙ্গর খানকে ঢাকায় আনেন। ফলে ঢাকা বাংলা সংগীতের প্রাণ কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। তাছাড়া উপমহাদেশে শুদ্ধ এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের সে উজ্জ্বল উত্তরাধিকার যুগ প্রবর্তক মুসলিম সংগীতকারগণের হাত ধরে এখনো প্রবাহমান।

৩.২.৫. হস্তলিপিতে মুসলিমগণের অবদান

বিজ্ঞানের মতো মুসলিমগণ হস্তলিপি শিল্পে কুর'আনের মাধ্যমে প্রেরণা লাভ করে। কুর'আনের ভাষা আরবিকেই তারা প্রাথমিক হস্তলিপি উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রথম যুগে পবিত্র কুর'আনের সংরক্ষণের দাবিতে তারা পাথর, চামড়া, কাঠের টুকরা, ইত্যাদির উপর কুর'আনের আয়াতসমূহ লিখে রাখতেন। কিছুকাল পর কুর'আনকে গ্রন্থবদ্ধ করা হয় এবং মুসলিম রাষ্ট্র বিশাল ব্যাপ্তির মাধ্যমে কুর'আনের শিক্ষা পাঠ এবং নকল করার প্রবণতা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ নূরুল আমীন বলেন: "হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ পর্যন্ত কাগজে লিখে রাখার প্রচলন ছিলো না। কাগজে লিখিত সর্বপ্রথম প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় বাগদাদে। চতুর্থ হিজরী শতকের শেষ দিকে কাগজের প্রবর্তন হয়। ফলে লিপির জন্যও তা ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তখনও মুসলিমগণ তাদের পূর্বসুরিদের মতো নিজ হাতে কুর'আন লিপিবদ্ধ করতে গৌরব বোধ করতো। এই লেখা সুন্দর করার তাগিদ মুসলিম বিশ্বের হস্ত বিদ্যার উন্নয়নে এক বিরাট ফলপ্রসূ অবদান রাখে এবং আদর্শ হিসেবেও গৃহীত হয়। বর্তমানে চীনের পশ্চিমাঞ্চল থেকে উত্তর আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় আরবী ভাষা ও আরবী হস্ত লিপিকলার প্রচলন রয়েছে।

ধর্তব্য যে চিত্রাঙ্কন মূর্তি ও ভাস্কর্য শিল্পের প্রতি কুরআনের নিরুৎসাহ ও আপাত নিষেধাজ্ঞা চিত্রকলার দিকে মুসলিমগণের অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে।"[১৭৬]

৩.২.৬. চিত্র শিল্পে মুসলিমগণের অবদান

চিত্রশিল্পের ইতিহাস অনেকতা মানবজাতির সূচনার ইতিহাস থেকে শুরু হয়। মুসলিম চিত্রকলার যে নতুন অধ্যায় চিত্রকলার ইতিহাসে যুক্ত হয়েছে তা বিভিন্নভাবে তার পূর্বতন চিত্রকলার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তবুও বেশ কিছু নতুন ধারা মুসলিম চিত্রকলায় যোগ হয়েছে। বেশ কড়াকড়ি ও উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে মুসলিম চিত্রকলার আরম্ভ হয়েছিল এবং উৎকর্ষের সাফল্য শিখরে উপনীত হয়েছিল। ধর্মের নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও চিত্রকলা বেড়ে উঠেছিল এবং নতুন ধারণা ও যোজনায় ব্যাপ্তি লাভ করেছিল।

পবিত্র কুর'আনে চিত্রকলার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো আয়াত নেই। তবে কুর'আনের ব্যাখ্যাদাতাগণ কোনো কোনো আয়াতের রূপক অর্থ নির্দেশ করে এ শিল্পের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। যে সকল প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন তার মধ্যে সূরা মায়িদার ৯৫ নং আয়াতে আনসাব তথা প্রতিমা নির্মাণ অর্থেও জের টানেন। উক্ত আয়াতে আনসাব এর নিন্দা করা হয়েছে। সূরা হাশরের ২৪ নং আয়াতে 'মুসাব্বির' তথা গঠনকারী শিল্পী হিসাবে আল্লাহর মহান গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কোনো সৃষ্টি, স্রষ্টার এ গুণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না, যারা করবেন তারা শিরকের সমতুল্য কাজ করবেন।

৩.২.৭. শিল্পে মুসলিম স্পেন

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার মূল বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে শিল্পকে কেন্দ্র করে। বর্তমানের পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলো কোনো না কোন শিল্পের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এক কথায় ইউরোপকে আধুনিক শিল্পের প্রাণ হিসেবে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু তারা সর্বপ্রথম মুসলিমগণের কাছ থেকেই শিল্প এবং শিল্প সংক্রান্ত জ্ঞান পেয়েছে। ইতোপূর্বে তারা ছিল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অনগ্রসর জাতি। ইউরোপে মুসলিম উৎকর্ষতার প্রাণকেন্দ্র স্পেনই প্রথম তাদের দেখিয়েছিল সভ্যতার আলোক মশাল। জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পের উচ্চশিখরে যখন স্পেনীয় মুসলিম শিল্পী সাহিত্যিক বিজ্ঞানীগণ গভীর নিমগ্ন ঠিক তখনই ইউরোপের অবস্থা বর্ণনা করেছেন খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক ষ্টানলি লেনপুল:

When our Saxon ancestors dwelt in wooden hovels and trod upon dirty straw, when our language was informed and such accomplish meant as reading and writing were almost confined to

১৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৭

a few monk we can to some extent realize the extra ordinary civilization of the Moors ....All Europe was then plunged in barbaric ignorance and savage manners।"[১৭৭] লেনপুল, তখনকার ইউরোপের অজ্ঞতা ও বর্বতার কথা-বলেছেন।

৩.২.৮. ভারতীয় সংস্কৃতি ও মুসলিম

ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে মুসলিম শাসন বলবৎ ছিল। এই দীর্ঘ সময় ইসলাম তথা আরব সভ্যতার যে ছোয়া লেগেছিল ভারতের গায়ে তা তার সংস্কৃতির উন্নয়নে বৈপ্লবিক অবদান রেখেছে। অসংখ্য জাতি সম্প্রদায় গোষ্ঠীর পাদপীঠ ভারত বহুকাল ধরে বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতি কেন্দ্র ছিল। তৎকালীন নিজস্ব পরিমণ্ডলে ভারতীয় সংস্কৃতির বিচরণ ছিল। তারা যেমন নিজের বহির্বিশ্বে প্রচার ও বিকাশমুখী ছিল না তেমনি বাইরের কিছুকেও গ্রহণ করতো না। একপ্রকার বিচ্ছিন্ন ও সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি স্থিত ছিল না। কিন্তু আরবদের সংস্পর্শে এসে ভারতীয় সংস্কৃতি এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। ভারতে মুসলিমগণের রাজনৈতিক বিজয়ের পর পুরো ভারত মানস এক নতুন প্রাণনায় জেগে উঠে। মুসলিম বিজয় ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। ভারতে ধর্মীয় সংস্কৃতির যে জঘন্য রূপ ধর্মীয় আধিপত্যবাদ ইসলামের সময় ও প্রগতিশীলতার কাছে তা মাথা নত করে। একই ধর্মীয় অনুসারীদের মধ্যে যে কৌলিন্য ও ভেদপ্রথা বিদ্যমান ছিল তার প্রেক্ষিতে দলিতরা স্বভাবতই ইসলামি শিক্ষার সহায়তা লাভ করে।

১৭৭. *দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের সূচনা

রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রাঁয় সাড়ে নয় লক্ষ বর্গমাইল এলাকার রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে একটি অবিভাজ্য দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) এর পর তার উত্তরসূরি হযরত উমর (রা.) বারো লক্ষ বর্গমাইলের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে অনুরূপ একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যেটি বিশাল সীমানার অধিকারী হয় যার মধ্যে উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ট্রান্সঅক্সানিয়া, ককেসাস, আনাতোলিয়ার অংশবিশেষ, সমগ্র সাসানীয় সাম্রাজ্য, বৃহত্তর খোরাসান, সাইপ্রাস, রোডস, সিসিলি, ইবেরিয়ান উপদ্বীপ, এবং বেলুচিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমানা ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু নদ ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত পৌছায়। পরবর্তীতে মুসলিমগণ যখন ইসলামের পথ থেকে দূরে সরে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (স.) আনীত জীবন ব্যবস্থা হতে নিজেদেরকে গুটিয়ে নেয়, তখনি তারা বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয়। মুসলিমরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক মুসলিম অপর মুসলিমকে বরদাস্ত করতে পারে না। মুসলিমগণের যখন এ অবস্থা তখন ৬৫৬হিজরিতে এসে হালাকু খানের হাতে ইসলামী বিশ্বসাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদ ধ্বংস হয়। মুসলিম জাতির ওপর আপতিত ইতিহাসের বৃহত্তম বিপর্যয়ের একটি ছিল এটি। আটশ বছর আগেকার পৃথিবীতে ১০ লাখ মানুষ নিহত হওয়া মানে আধুনিক সময়ে ১০০ কোটির জনসংখ্যা ধ্বংস হওয়ার সমান। হালাকু-চেঙ্গিসি হামলায় দজলা ও ফোরাত নদীর পানি প্রথমে লালবর্ণ ধারণ করে মুসলিমগণের রক্তে। এরপর তা কালো রং ধারণ করে যখন বাগদাদের গবেষণাগার ও গ্রন্থাগারগুলো জ্বালিয়ে কয়লা, ছাই ও কালি নদী দুটোতে নিক্ষেপ করা হয়। দজলা-ফোরাত নদীর পানি ব্যবহার উপযোগী হতে প্রায় ছ'মাস সময় লেগেছিল। মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের সূচনা সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো:

৪.১ পতন যুগের সূচনা

মুসলিম উম্মাহর জীবনে পতনের সূচনা অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর জীবনের তুলনায় অনেক বেশি সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান। যদি চরম উন্নতি ও পতনের মাঝের সীমাকে চিহ্নিত করা হয় তাহলে আঙুল সেই ঐতিহাসিক রেখার ওপর রেখে দেয়া যেতে পারে যে রেখা খেলাফতে রাশেদা ও আরব রাজতন্ত্র বা মুসলিমগণের বাদশাহীর মধ্যে বিভাজনকারী সীমা। সরাসরি ইসলামী নেতৃত্ব বা এর মাধ্যমে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর সে সমস্ত ব্যক্তির হাতে ছিল যাঁদের প্রত্যেক সদস্য তাঁর ঈমান ও আকীদা, আমল ও আখলাক, প্রশিক্ষণ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি, সুকুমার বৃত্তি ও উন্নত চরিত্র বা ভারসাম্য রক্ষার দিক থেকে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর একটি স্থায়ী মুজিযা ছিলেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে ইসলামের ছাঁচে এমনভাবে

ঢেলেছিলেন যে, একমাত্র দেহ ছাড়া আর কোন কিছুতে আপন অতীতের সঙ্গে তাঁদের কোন সাদৃশ্য অবশিষ্ট ছিল না। না ঝোঁক ও প্রবণতার ক্ষেত্রে, না মন-মানসিকতার মধ্যে আর না চিন্তা-ভাবনার পন্থা ও পদ্ধতির মধ্যে, না প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে। এ সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তি যাঁদের কথা ওপরে বলা হয়েছে। তাঁরা দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয়ে পরিপূর্ণ নমুনা ছিলেন।

তাঁরা একাধারে সালাতের ইমাম, মসজিদের খতিব, কাযি, বিচারক, বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারের আমানতদার, বিশ্বস্ত ভান্ডার রক্ষক ও সেনাবাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন এবং একই সময় তারা যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমাধান, রাষ্ট্র ও শহর-নগরের ব্যবস্থাপনা ও সাম্রাজ্যর অন্তর্গত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁদের মধ্যে একেকজন একই সময়ে মুত্তাকী সাধক, সিপাহী বা মুজাহিদ, সমঝদার কাযী, মুজতাহিদ, ফকিহ, কুশলী ও অভিজ্ঞ প্রশাসক ও নিপুন রাজনীতিক ছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিসত্তায় একই সময় ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁদের চারপাশে সে সমস্ত লোকের জামাত ছিল যারা সে একই মাদরাসা-ই নববী কিংবা মসজিদে নববীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। একই ছাঁচে ঢালা, একই আত্মার ধারক-বাহক এবং একই স্বভাব-চরিত্র ও গুণে গুণান্বিত। খলীফা তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই তাঁদের পরামর্শ ও সাহায্য ছাড়া করতেন না। অনন্তর তাঁদের প্রাণসত্তা সভ্যতা-সংস্কৃতির সমগ্রকাঠামোতে, হুকূমতের গোটা ব্যবস্থায় এবং মানুষের সমগ্র জীবন, সমাজ ও চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর তাঁদের ঝোঁক ও প্রবণতার ছায়াপাত ঘটে। তাতে তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়ে। সেখানে আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের মধ্যে কোন দ্বন্ধ ছিল না, ছিল না ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন সংঘাত কিংবা সংঘর্ষ। সেখানে দীন ও দুনিয়ার কোন পার্থক্য বা বিভাজন ছিল না, ছিল না কোন নীতি ও উপাযোগিতার মধ্যে কোন প্রকার টানাপোড়েন। তেমনি উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও নৈতিক চরিত্রের মধ্যে ও কোন বিশেষত্ব ছিল না।"[১৭৮] মোটের ওপর তাঁদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইসলামী সালতানাতের সমাজ জীবনের প্রতিষ্ঠাতাদের নৈতিক চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, ভারসাম্য ও সামগ্রিকতার পূর্ণ প্রতিনিধিত্বকারী দর্পণ স্বরূপ ছিল। পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন কারণে তাদের পতন ডেকে নিয়ে আসে।

ওসমানীয় খেলাফাত (অটোমান) তথা মুসলিমদের উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব খুবই বেশি। নভেম্বর ১৯১৪ সালে সুলতান ৫ম মোহাম্মাদ মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তখন স্বাভাবিক ভাবেই মিত্র শক্তিও তুরস্কের ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বেশ কয়েকটি ফ্রান্টে অটোমানদের সাথে মিত্র শক্তির যুদ্ধ হয়। মিত্র বাহিনীর সাথে ওসমানীয় খেলাফাত এর যুদ্ধে জড়িত ৩ টি অত্যন্ত গোপন এবং গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। ষড়যন্ত্র

১৭৮. *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭

এবং কয়েকটি ফ্রান্টে যুদ্ধ। ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের সাথে আরবদের ঝামেলা তৈরি করতে একজন চর নিয়োগ দেয়। তাঁর নাম ছিল থমাস এডওয়ার্ড লরেন্স (Thomas Edward Lawrence)। এই থমাস এডওয়ার্ড লরেন্স পরে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে যায় Lawrence of Arabia নামে। টি ই লরেন্সকে ব্রিটিশ সরকার তখন প্রতি মাসে ২ লক্ষ পাউন্ড খরচ দিত তুর্কিদের তথা খেলাফাত এর সাথে আরবদের সমস্যা তৈরি করতে। এবং এ কাজে সে আশাতীত সফল হয়। সে মক্কার গভর্নর শরীফ হোসাইন ইবনে আলী কে ওসমানীয়দের সাথে লড়তে ব্রিটিশ বাহিনীকে সহায়তা করতে রাজি করে ফেলে।"[১৭৯]

৪.১.১ গ্যালিপ্পলি অভিযান

এপ্রিল ১৯১৫ সালে ইংল্যান্ড, রাশিয়া, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রাঞ্চ সম্মিলিত ভাবে তুরস্কে আক্রমন করে ইস্তাম্বুল দখল এর জন্য। এটি গ্যালিপ্পলি অভিযান নামে পরিচিত। ইস্তাম্বুল দখল করতে পারলে ব্লাক সি এবং দারদেনালস স্টেট এবং মর্মর সাগরের এর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাই সর্ব শক্তি দিয়ে মিত্র শক্তি তুরস্ক আক্রমন করে। আট মাস এই যুদ্ধ চলে। এই গ্যালিপ্পলি অভিযান মিত্র শক্তির জন্য একটি বড় বিপর্যয় হয়। তারা অটোমানদের কাছে পরাজিত হয়। তাদের ১ লক্ষ ১৫ হাজার সৈন্য নিহত হয়। বিজয়ী হলেও অটোমানদেরও প্রায় একই পরিমাণ সৈন্য নিহত হয়। এবং এটিই ছিল প্রথম মহাযুদ্ধে মুসলিমগণের একমাত্র বিজয়। এ যুদ্ধে ওসমানীয়দের পক্ষে নেতৃত্ব দেন যে জেনারেল তিনি অসম্ভব বিখ্যাত হয়ে যান। তার নাম মোস্তফা কামাল পাশা। যিনি পরে খলিফা আব্দুল মজিদকে হটিয়ে খেলাফত এর অবসান ঘটান এবং তুরস্কের ক্ষমতা দখল করে আতাতুর্ক (জাতির পিতা) উপাধি গ্রহণ করেন। মোস্তফা কামাল এর উত্থান হযরত আবু বকর (রা.) থেকে শুরু হওয়া খেলাফাত এর অবসান ঘটে। ক্ষমতা দখল করে মোস্তফা কামাল ইসলামের বিরুদ্ধে চরম রুদ্র মূর্তি ধারণ করেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাতারাতি সম্পূর্ণ বদলে ফেলা হয়। সেক্যুলার স্কুল চালু করা হয়। ইসলামি শিক্ষা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। ধর্মীয় অবকাঠামো গুলোও ধ্বংস করা হয়। শরি'আ কাউন্সিল বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। ধর্মীয় বৃত্তি প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়। সূফীদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়। শরি'আ আদালত অবৈধ ঘোষণা করে দেশের সকল কাযীকে বরখাস্ত করা হয়।"[১৮০]

তুর্কিদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকেও কামাল পাশা সেক্যুলার নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এর চেষ্টা করেন : ১.পাগড়ি বা টুপি পড়া নিষিদ্ধ করা হয়। ২. সরকারী ভবনগুলোতে হিজাব নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। ৩. হিজরি ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু করা হয়।

---

১৭৯. http://www.somewhereinblog.net/blog/samilz7/29987240, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ২০ ডিসেম্বও, ২০১৬

১৮০. *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো? প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮

৪. ১৯৩২ সালে আরবিতে আযান দেয়া নিষিদ্ধ করে তুর্কি ভাষায় আযান চালু করা হয় এবং দেশের হাজার হাজার মসজিদে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। ৫. জু'মাবারের পরিবর্তে শনিবার এবং রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়।

সেই সময় তুর্কিদের শিক্ষার হার খুবই কম ছিল। শিক্ষার হার বাড়ানোর অজুহাত দেখিয়ে কামাল পাশা আরবি বর্ণমালার পরিবর্তে ল্যাটিন চালু করলেন। ল্যাটিন বর্ণ চালুর সাথে সাথে আরবি শব্দগুলোর তুর্কি প্রতিশব্দ খুঁজে বের করতে একটি কমিশন গঠন করেন।

এবং সর্বশেষ ধর্মনিরপেক্ষকে ভবিষ্যৎ থ্রেট থেকে বাঁচাতে কামাল পাশা সাংবিধানিকভাবে সেনাবাহিনী এবং বিচার বিভাগে আমূল সংস্কার করেন। সেনাবাহিনীকে তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষক করা হয়। এবং সাংবিধানিকভাবে সেনাবাহিনীকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয় যে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য তারা যা ইচ্ছা করতে পারবে। (পরে তুরস্কের বেশ কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীকে সেনাবাহিনী ফাঁসি দেয় এই ক্ষমতা বলে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে জেল দেয় ইসলামি কবিতা পড়ার অপরাধে!)। ইসলাম তথা মুসলিমদের উপর কতটা মারাত্মক এর প্রভাব তা সহজেই অনুনেয়। উপমহাদেশে তখন বিখ্যাত খেলাফত আন্দোলন হয় কামাল পাশার এই কর্মকাণ্ডের জন্য।

৪.১.২ বাগদাদ এর পতন

১৯১৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর ইংল্যান্ড বাগদাদ অভিযান ঘোষণা করে। তারা মূলত বসরা দিয়ে হামলা চালায়। এই ফ্রান্ট এ তিন মাস যুদ্ধ চলে ওসমানীয় এবং ব্রিটিশ বাহিনীর মধ্যে। ওসমানীয়দের নেতৃত্ব দেন খলিল পাশা আর ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন জেনারেল ফ্রেডেরিক স্ট্যানলি মাউডু। ১৯১৭ সালের ১১ মার্চ জেনারেল ফ্রেডেরিক স্ট্যানলি মাউডু (Frederick Stanley Maude) এর নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বাহিনী এর হাতে বাগদাদ এর পতন ঘটে। ৯ হাজার এরও বেশি ওসমানীয় সৈন্য বন্দী হয় ব্রিটিশ বাহিনী এর হাতে।"[১৮১]

৪.১.৩ জেরুজালেমের পতন

১৯১৭ সালের ১৭ নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে বিখ্যাত জেনারেলদের একজন জেনারেল এ্যাডম এ্যালেনবে (Edmund Allenby) এর নেতৃত্বে ব্রিটেন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এর একটি সম্মিলিত বাহিনী পবিত্র শহর আল কুদস বা জেরুজালেম এর উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করে। এছাড়া মিত্র বাহিনীর অন্য কমান্ডার ছিল অস্ট্রেলিয়ার হ্যারি কাওভেল(Harry Chauvel), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার হ্যারি বুলফিন (Edward Bulfin)। ওসমানীয়দের পক্ষে ছিল আলি ফুয়াদ পাশা, জাভেদ পাশা এবং

১৮১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

জার্মানি এরিখ ভন ফলকেনউন (Erich von Falkenhayn) ফ্রেদেরিখ ক্রেস ভন ক্রেসিস্তিন (Friedrich von Kressenstein)। ১৩ দিন ব্যাপি যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী জয় লাভ করে।

৪.১.৪ দামেস্কের পতন

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ ব্রিটেন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড, মক্কা শরীফ এবং ফ্রান্স এর সম্মিলিত বাহিনী হাইফা থেকে দামেস্কের উদ্দেশ্য অভিযান শুরূ করে। ওসমানীয় এবং জার্মান বাহিনী তাদের এই বিশাল বাহিনীর সামনে দাড়াতেই পারে নাই। মাত্র ৪ দিনেই দামেস্কের পতন ঘটে। সম্মিলিত ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় জেনারেল এ্যাডম এ্যালেনবে (Edmund Allenby). তাকে বলা হত Bloody Bull. এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার হ্যারি কাওভেল (Harry Chauvel), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার হ্যারি বুলফিন (Edward Bulfin) এবং শরীফ হোসাইন ইব্ন আলীর পুত্র ফয়সাল মিত্র বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। ওসমানীয়দের পক্ষে ছিল মোস্তফা কামাল পাশা, জাভেদ পাশা এবং জার্মানি লিমন ভন স্যান্দারস (Liman von Sanders)।"[১৮২]

৪.১.৫ ইস্তাম্বুলের পতন

১৯১৮ সালের ১৩ নভেম্বর মাসে ব্রিটেন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ইটালি, গ্রিস, আমেরিকার এর সম্মিলিত বাহিনীর হাতে ওসমানীয় খেলাফাত এর রাজধানী ইস্তাম্বুলের পতন ঘটে। সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডার ছিল সমেরেস্ট আরথার গোক ক্যালটোপ (Somerest Arthur Gough Calthorpe) ওসমানীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় আলী সাইদ পাশা।

এভাবে মুসলিম খেলাফাতের বিভিন্ন সময়ের রাজধানী এবং গর্বের সবগুলো ঐতিহাসিক শহর এর একে একে পতন ঘটে। প্রত্যেকটি শহর বাস্তবে মিত্র বাহিনী দখল করে। মুসলিমগণ রাজনৈতিক ভাবে এতটা দূরাবস্থার মধ্যে কখনও পরে নাই। (মঙ্গলদের আক্রমনকে অনেকে এর কাছাকাছি বড় বিপর্যয় বলেন)।"[১৮৩]

৪.১.৬ মধ্যপ্রাচ্য এর ভাগ

মহাযুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ সালের প্যারিস এ বিখ্যাত প্যারিস পিস কনফারেন্স শুরু হয়। এই পিস কনফারেন্স এ ব্রিটিশ সরকার ওসমানীয় খেলাফাত এর ভূমি ভাগা-ভাগি নিয়ে কিছুটা বেকায়দায় পরে। কারণ এই সময় তারা তিন পক্ষের মুখোমুখি হয় শরীফ হোসাইন ইবনে

---

১৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬
১৮৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

আলীর পুত্র ফয়সাল, World Zionist Organization এবং সাইক-পিকো এ্যাগরিমেন্টের অন্য পক্ষ যাদের সাথে ব্রিটিশ সরকার একই ভূমি নিয়ে চুক্তি করে। প্রথমেই ব্রিটিশ সরকার সাইক-পিকো এ্যাগরিমেন্ট অফিশিয়ালি স্বীকৃতি দেয়। ফলে ফ্র্যান্স পায় সিরিয়া তার আশে পাশের এলাকা। ফ্রান্স পেয়েই যে অপকর্মটি করে তা হল সিরিয়াকে ভাগ করে ফেলে জাতীয়তা বা আদর্শ অনুসারে। লেবানন নামে আলাদা দেশ বানায় আরব খ্রিস্টানদের জন্য (যদিও এখন লেবানন এখন একটি বহুধর্মীয় দেশ)। দ্রুযিদের জন্য আলাদা অংশ নাম দিয়েছিল আল দ্রুযি স্টেট, আল অয়াতি উপজাতিদের জন্য আল অয়াতি স্টেট, সুন্নিদের জন্য স্টেট অব দামাস্কাস।

ফ্র্যান্স প্রায় ৩০ বছর সিরিয়া এভাবে শাসন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সিরিয়া বিপ্লব হয় এবং সিরিয়ানরা ফ্রেঞ্চদের বের করে দেয় তবে লেবাননকে আর ধরে রাখতে পারে না। লেবানন আলাদা রাষ্ট্রই থাকে। ফ্রেঞ্চরা শাসন এর সময় একটি আল অয়াতি উপজাতিদের গ্রুপকে বেঁছে নেয় এবং নানান সুযোগ সুবিধা দেয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের উপর ফ্রান্স এর পক্ষে পুলিশি করতে। এই আল অয়াতি উপজাতিরা ছিল সিরিয়ার সবচেয়ে নিষ্ঠুর, ডাকাত, অশিক্ষিত এবং অনেকটা বর্বর সম্প্রদায়। ইতিহাসে আল অয়াতি উপজাতিদেরকে একটি ডাকাত সম্প্রদায় হিসেবেই দেখা যায় তারা পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় বাস করতো এবং সুন্নিদের গ্রাম এবং শহরগুলোতে ডাকাতি করতো। সুন্নিরা এই আল অয়াতিদের ভয় পেত। ফ্রেঞ্চরা এসে এই আল অয়াতিদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং প্রচুর সামরিক সহায়তা করে। ফলাফল ৩০ বছর পর যখন ফ্রান্স সিরিয়া ছেড়ে চলে যায় এক আল অয়াতি জেনারেল হাফিজ আল আসাদ সিরিয়ার ক্ষমতা দখল করে। তারই ছেলে বাশার আল আসাদ এখন সিরিয়া এর ক্ষমতায়।"[১৮৪]

সাইক-পিকো এ্যাগরিমেন্ট অনুযায়ি ইংল্যান্ড ইরাক, ট্রান্স জর্ডান (বর্তমান ম্যাপে জর্ডান, ফিলিস্তিন, ইসরাইল) এবং হিজায পায়। ব্রিটিশ সরকার বেলফোর ঘোষণা অনুযায়ী World Zionist Organization-কে ফিলিস্তিনের একটা অংশ দিয়ে দেয়। হোসাইন-ম্যাকমোহন এ্যাগরিমেন্ট এর সুরাহা করতে তারা একটি অভিনব কৌশল গ্রহণ করে। শরীফ হোসাইন ইবনে আলীর ছিল ৩ পুত্র ছিল। তারা বড় ছেলে আলী বিন শরীফ হোসাইন কে দেয় হিজায। এবং আলী ক্ষমতায় গিয়েই নিজেকে হিজায এর রাজা এবং মুসলিমগণের খলিফা ঘোষণা করে। আলী ১৯২৪ সালের অক্টোবর থেকে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ৩ মাস হিজায শাসন করে। সে আল সৌদের কাছে ক্ষমতা হারায়। এই আল সৌদকেও অর্থ এবং অস্ত্র ব্রিটেনই দেয়। আল সৌদ হিজায দখল করে নিজেকে রাজা

১৮৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

ঘোষণা করে এবং বংশের নামে দেশের নাম দেয় "সৌদি আরব"। এর মাধ্যমে শরীফ হোসাইন ইবনে আলী এবং তার পরিবার মক্কা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায়। তারা একাকী অত্যন্ত নির্মম ভাবে মারা যায় এবং ওসমানীয় খেলাফাত এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার পায়।

শরীফ হোসাইন ইবনে আলীর মেজু পুত্রের নাম আব্দুল্লাহ বিন শরীফ হোসাইন। তাকে দেওয়া হয় জর্ডান। আব্দুল্লাহ ক্ষমতায় গিয়ে নিজেকে হাশেমি (নবীজির বংশ) জর্ডান এর রাজা ঘোষণা করে। এবং এই আব্দুল্লাহ শরীফ হোসাইন ইবনে আলীর একমাএ ছেলে যে ক্ষমতায় টিকে ছিল শেষ পর্যন্ত। তার পর তার নাতি হোসাইন ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৯৯ জর্ডান এর ক্ষমতায় ছিল। হোসাইন এর মৃত্যুর পর তার ছেলে আব্দুল্লাহ জর্ডান এর ক্ষমতায় বসেন। এবং তিনি এখনও জর্ডান শাসন করছেন। শরীফ হোসাইন ইবনে আলীর ছোট পুত্র এর নাম ছিল ফয়সাল। তার সাথে টি ই লরেন্সের সবচেয়ে ভাল সম্পর্ক ছিল। ফয়সাল নিজেকে ইরাকের রাজা ঘোষণা করে। তবে ইরাকের মানুষ তাকে প্রত্যাখান করে। তখন ব্রিটিশ সরকার ফয়সালের পুত্র গাজাকে গভর্নর বানায়। ইরাকের মানুষ তাকেও প্রত্যাখান করে। এর পর ব্রিটিশ সরকার গাজা এর পুত্র ফয়সাল ২য়কে গভর্নর বানায়। ১৯৫৮ সালের ১৪ জুলাই ইরাকি আর্মি বিদ্রোহ করে। তারা শরীফ পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে একটি বাসায় একত্রিত করে গুলি করে হত্যা করে। সে সময় একজন তরুণ আর্মি অফিসার বেশ বিখ্যাত হয় (শরীফ পরিবারের হত্যাকাণ্ডের সময় ছিল না)। এই তরুণ অফিসার ১৯৬৮ সালে ইরাকের ক্ষমতা দখল করে। তার নাম সাদ্দাম হোসেন।"[১৮৫]

এভাবেই এক মুসলিম উম্মাহ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। তৈরি হয় গভীর ক্ষত। যার দাগ মুসলিম বিশ্ব এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে। আরও কতদিন বয়ে বেড়াতে হবে তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

৪.২ মুসলিম উম্মাহর পতনের কারণসমূহ

৪.২.১ জিহাদ ও ইজতিহাদের অভাব

একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় মকসূদ বা লক্ষ হচ্ছে আল্লাহর ফরমাবরদারি ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ এবং তাঁর সার্বভৌমত্ব ও বিধি-বিধানের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এজন্য প্রয়োজন এমন প্রতিটি আকিদা-বিশ্বাস, প্রশিক্ষণ, নৈতিক চরিত্র, ইচ্ছা-অভিসন্ধি ও কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদের যা এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং জিহাদ ভেতর বাইরের ঐ সমস্ত উপাস্য ও মিথ্যা মা'বুদগুলোর বিরুদ্ধে যা আল্লাহর আনুগত্য ও ইসলামের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ ও

---

১৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৯

প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। এসব লক্ষ যখন অর্জিত হবে তখন একজন মুসলিমের জন্য জরুরি হলো, সে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর বিধানসমূহকে তার চারপাশের পৃথিবী এবং তারই মতো আর সব মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য চেষ্টা-তদবির করবে, প্রয়াস চালাবে। এটা তার ধর্মীয় দায়িত্ব ও আল্লাহর সৃষ্টিকুলের কল্যাণ কামনার স্বাভাবিক চাহিদা। পৃথিবীতে যত জড়বস্তু, প্রাণী, উদ্ভিদ ও মানুষ আছে তা আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধানসমূহের তথা তাঁরই সৃষ্ট প্রাকৃতিক কানূনের সামনে মস্তকাবনত।

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

অর্থাৎ, "আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।"[১৮৬] আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

অর্থাৎ, "তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভুমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের ওপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।"[১৮৭] এ ব্যাপারে মানুষের কোনো প্রকার চেষ্টা তদবীরের ভূমিকা বা কোনো প্রকারের চেষ্টা সাধনার আবশ্যকতা নেই। প্রাণীকুলের জন্য জীবন-মৃত্যু ও লালন-পালনের যে আইন-কানূন রয়েছে এবং তার শরীর ও প্রকৃতির জন্য আল্লাহ তা'আলা যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এর ওপর তারা বিনা প্রশ্নে অবনত মস্তকে চলছে এবং চলতে থাকবে। এর থেকে চুল পরিমাণও ব্যত্যয় ঘটবে না। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বিশ্বময় প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ বা সংগ্রাম কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

অর্থাৎ, "আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১৮৮] আর এই জিহাদের একটি দাবি এও, মানুষ সে ইসলাম সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল হবে যার খাতিরে তারা জিহাদ করবে এবং কুফর ও জাহিলিয়াত

১৮৬. আল-কুর'আন, ৩ : ৮৩
১৮৭. আল-কুর'আন, ২২ : ১৮
১৮৮. আল-কুর'আন, ০২ : ১৯৩

সম্পর্কেও অবহিত থাকবে যার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করছে। তারা গভীরভাবে অবহিত হবে যাতে করে যে পোশাকে ও যে রঙেই তা জাহির করা হোক, দেখা মাত্র তা চিনবে।

এ সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "মুসলমানগণের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সে সকল লোকের হাতে থাকবে যারা সামনে আসা জীবনের নতুন নতুন সমস্যা-সংকটকে এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সঠিক ও যথাযথ ফয়সালা করবার যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখেন এবং ইসলামের স্পিরিট ও ইসলামের আইন প্রণয়নের মৌল নীতিমালা সম্পর্কে এতটা অবহিত ও মাস'আলা বের করার ব্যাপারে এতটা পারঙ্গম হবেন, তারা মুসলিম উম্মাহর সামনে বিরাজমান সংকটগুলোর সমাধান করতে পারেন এবং দ্বিধাদ্বন্ধ কালে ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় যাঁরা তাদের দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন। বাতেলপন্থীরা সেগুলোকে তাদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করবে এবং যমিনে ফেতনা-ফাসাদ, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির কাজে এ সবের সাহায্য নেবে। পক্ষান্তরে সত্য পথের পথিক এসব থেকে কাজ নেবে যেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা এসব সৃষ্টি করেছেন।"[১৮৯]

৪.২.২ উমাইয়া ও আব্বাসী খলিফাবৃন্দ

কিন্তু দুর্ভাগ্য দুনিয়াবাসীর, খুলাফায়ে রাশেদীনের পর পৃথিবীর নেতৃত্বের মর্যাদামণ্ডিত আসনে এমন সব লোক জেঁকে বসে যারা এজন্য কোনো প্রকৃত প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। খুলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় তারা উচ্চতর ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশিক্ষণ লাভ করেনি। তাদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের মান এতটা সমুন্নত ছিল না যা মুসলিম মিল্লাতের একজন নেতার মর্যাদার উপযোগী। তাদের মস্তিষ্ক ও স্বভাব-প্রকৃতি আরবের প্রাচীন প্রশিক্ষণ ও পরিবেশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরুপে মুক্ত হতে পারেনি। তাদের মধ্যে না জিহাদের রূহ ছিল আর না ছিল ইজতিহাদের শক্তি যা দুনিয়ার ইমামত ও বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য। খলিফা-ই রাশেদ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয ব্যতীত উমাইয়া ও আব্বাসী খলীফাদের সকলের অবস্থা ছিল এরূপই।

৪.২.৩ রাজতন্ত্রের প্রভাব ও পরিণতি

এর ফলশ্রুতিতে ইসলামের মধ্যে অনেক ফাঁক-ফোকর দেখা দেয়। ফলে উপর্যুপরি নানাবিদ ফেতনা ও মুসিবত দেখা দেয়। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

---

১৮৯. *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০

ক. ধর্ম ও রাজনীতির বিভাজন

ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কার্যত বিভাজন দেখা দেয়। কেননা পরবর্তী শাসকগণ জ্ঞানে, গরিমায় ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এতটুকু যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না যে, তাদের উলামায়ে কিরাম ও দ্বীনদার লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে না। তাঁরা হুকুমত ও রাষ্ট্রনীতিকেই নিজেদের হাতে রাখেন এবং যখন তাঁরা চেয়েছেন কিংবা যখন পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদা ও দাবি দেখা দিয়েছে কেবল তখনই পরামর্শদাতা, বিশেষজ্ঞ হিসেবে তার উলামায়ে কিরাম ও দ্বীনদার লোকদের সাহায্য নিয়েছেন ও তার যতটুকু চেয়েছেন কবুল করেছেন এবং যখন চেয়েছেন তাদের পরামর্শ পাশে রেখে দিয়েছেন, সে মতে আমল করেনি। এভাবে রাষ্ট্রনীতি ধর্মের খবরদারি ও তত্ত্বাবধান থেকে মুক্ত হয়ে শেকলবিহীন হাতির ন্যায় লাগামহীন হয়ে পড়ে। ধর্ম দিণদিন শক্তিহীন, প্রভাবশূন্য ও নিষ্প্রভ হয়ে চললো আর ওদিকে রাষ্ট্রনীতি হাত-পা মেলতে শুরু করলো। ধর্মের লাগাম শিথিল এবং রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণহীন ও তার স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। সে দিন থেকে উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার লোক, দুনিয়াদার ও জাগতিক বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা পরিষ্কার দুটো পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হলো এবং এ দু'য়ের মাঝে ফাঁক দিন দিন বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে থাকলো এবং কোন কোন সময় তা বৈরিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পর্যবসিত হতো।

খ.রাষ্ট্র পরিচালকদের মধ্যে জাহিলিয়াতের প্রবণতা সৃষ্টি

হুকুমতের সদস্যবৃন্দ, এমন কি স্বয়ং খলিফা নিজেও ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রের পূর্ণ নমুনা ছিলেন না, এমন কি তাদের কারোর কারোর মধ্যে জাহিলী যুগের রোগ-জীবাণু ও প্রবণতা পাওয়া যেত। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও মন-মানসিকতার প্রভাব জাতীয় জীবনের ওপর পড়ত এবং লোকে সাধারণত তাদেরই আচার-আচরণ ও প্রবণতার অন্ধ অনুকরণ করতো। ধর্মের খবরদারি ও দেখাশুনা খতম হয়ে গিয়েছিল। তাদের জবাবদিহিতা উঠে গিয়েছিল। আমরু বিল-মা'রুফ ওয়া নাহী আনিল-মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধের প্রাধান্য খতম হয়ে গিয়েছিল। কেননা এর পিছনে কোনো শক্তি কিংবা রাষ্ট্রের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। এ ছিল কেবল হাতে গোনা এমন কতিপয় লোকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আমল যাদের কাছে কোনো শক্তি এবং অমান্য ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কাউকে শাস্তি দানের কোনো অধিকার ছিল না, অথচ এর বিপরীতে লাগামহীন ও মুক্ত জীবনের লোভনীয় হাতছানি ছিল অনেক। ফলে মুসলিম জনপদগুলোর ভেতর জাহিলিয়াত শ্বাস গ্রহণের অবাধ সুযোগ পায় এবং ক্রমান্বয়ে তা মাথা তুলে দাঁড়ায়। আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, সমৃদ্ধি কামনা ও আনন্দ উপভোগের জীবন ব্যাপক হয়ে যায়। খেলাধুলা ও ক্রীড়া-কৌতুকের বাজার হয়ে যায় গরম ও রমরমা। এ নৈতিক অধঃপতন ও ভোগবিলাসে মত্ত কোন জাতির পক্ষে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন,

নবীদের প্রতিনিধিত্ব করা, আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকা, তাকওয়া ও দীনদারীকে উৎসাহিত করা এবং লোকের জন্য উন্নততর চারিত্রিক নমুনা কায়েম করা সম্ভব নয়, বরং এমনতরো অবস্থায় জাতি তার নিজের অস্তিত্ব, সম্মান ও আযাদি বজায় রাখার শক্তিও খুইয়ে বসে।

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

অর্থাৎ, "যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না।"[১৯০]

গ.ইসলামের অপপ্রতিনিধিত্ব

অল্প দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই সব লোক নিজেদের আমল আখলাক ও পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়াদিতে ইসলামের শরঈ রাষ্ট্রনীতি, এর সামরিক আইন-কানূন, এর সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও এর নৈতিক শিক্ষামালার খুব কমই প্রতিনিধিত্ব করতো। এভাবে অমুসলিমদের দিল থেকেই ইসলামের পয়গামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও তার প্রভাব চলে যেতে লাগল এবং ওদের প্রতি তাদের আস্থায় ভাটা পড়লো। এই সম্পর্কে Muhammad Qasim Zaman বলেন, That the decline of Islam began when people stared to lose faith in the sincerity of its representative. অর্থাৎ, "ইসলামের পতন সেদিন থেকে শুরু হলো যেদিন মানুষ ওই সমস্ত লোকের সততার ব্যাপারে, তাদের আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহ করতে লাগলো যারা নতুন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছিল।"[১৯১]

৪.২.৪ দার্শনিক জটিলতা নিয়ে মেতে থাকা

সে পতন যুগে মুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তানায়কগণ যেই পরিমাণ অধিবিদ্যা (Metaphysics) ও গ্রিকদের ধর্মতত্ত্ব (Theology)এর দিক মনোযোগ দেন সে পরিমাণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) কার্যকর ফলপ্রসূ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে নজর দেননি, অথচ এ গ্রিক দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব গ্রীকদের দেবমালা বা প্রতিমাবিদ্যা (Mythology) বৈ কিছুই ছিল না যাকে তারা নিজেদের চাতুর্যরূপে দার্শনিকসুলভ শব্দসমষ্টি ও পরিভাষার আড়ালে একটি যুক্তি শাস্ত্রের পোশাকে পেশ করেছিল। তা ছিল শুধু কতিপয় অলীক কল্পনার সমষ্টি ও শব্দসমষ্টির এমন এক ইন্দ্রজাল যার পেছনে কোনো বাস্তবতা ও মৌলিকত্ব ছিল না। আল্লাহ তা'আলা

---

১৯০. আল-কুর'আন, ৩৩: ৬২

১৯১. Muhammad Qasim Zaman, *Princeton Readings in Islamist Thought* (London: Princeton University Press, 2009), p. ১১৫

আপন অনুগ্রহ ও করুণায় মুসলিমগণকে এ অহেতুক ও অর্থহীন বিষয় থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নবুয়তের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহর যাত ও সিফাত তথা তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর সে নিশ্চিত ও অকাট্য জ্ঞান দান করেছিলেন যার বর্তমানে সে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এবং আল্লাহর যাত ও সিফাত সম্পর্কে সে রাসায়নিক মিশ্রণ ও বিশ্লেষণের (যা ঐশী দর্শন ও বাণীর পদ্ধতি) আদৌ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আফসোসের বিষয় দার্শনিক ও কালাম শাস্ত্রবিদগণ এ মহা নেয়ামতের কদর না করে সে সব আলোচনা-সমালোচনার অর্থহীন কাজে, দুনিয়া ও আখিরাতে যেগুলোর কোনই লাভ নেই, শতাব্দীর পর শতাব্দীর পর্যন্ত নিজেদের সর্বোত্তম যোগ্যতা ও মেধার পরিচয় অপচয় করেন। ঠিক তেমনি তারা নিউ প্লেটোনিক দর্শন তথা অধিবিদ্যার সমালোচনা ও ওয়াহদাতুল উজুদ মতবাদ নিয়েও প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করে।

৪.২.৫ শিরক ও বিদ'আত

এ পতন যুগে মুসলিমগণের মধ্যে শিরক ও মূর্খতা, প্রাচীন সব জাহিল জাতিগোষ্ঠীর আকিদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে এবং মুসলিম জীবনে ও তাদের মেযাজে এমন সব বিদ'আত স্থান করে নেয় যেগুলো ধর্মীয় জীবনের একটি বিরাট অংশ দখল করে নেয়। মুসলিমগণকে বিশুদ্ধ দ্বীন ও দুনিয়ার সাফল্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। প্রকাশ থাকে, দুনিয়ার অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিমগণের যা কিছু বৈশিষ্ট্য তা এ দ্বীনের বদৌলতেই, এ ইসলামের কারণেই যা আল্লাহর রাসূল (স.) আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

অর্থাৎ, "এটা আল্লাহর কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত।"[১৯২] অনন্তর যখন এর মধ্যে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি, কল্পিত আমল ও রসমের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং আল্লাহ না করুন, তা তার মৌলিকত্ব খুইয়ে বসবে তখন দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য গ্যারান্টি আর অবশিষ্ট থাকবে না এবং সে এ যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলবে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি তার সামনে মাথা নত করবে এবং মানুষের দিল সে জয় করবে।

৪.২.৬ দাওয়াত ও তাজদীদের অব্যাহত ধারা

আসল দীন কিন্তু এ গোটা মুদ্দতে সর্বপ্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতির হাত থেকে নিরাপদ থাকে। মুসলিমগণ সঠিক রাস্তা থেকে যেখানে যেখানে সরে এসেছিল কিংবা বিপথগামী হয়েছিল কুর'আন ও সুন্নাহর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই ধরা পড়ত। দ্বীন ও শরীয়ত

১৯২. আল-কুর'আন, ২৭ : ৮৮

মুসলিমগণের ভুলের ক্ষেত্রে কখনো সঙ্গ দেয়নি, বরং এসবের অধ্যয়ন থেকে গায়রে ইসলামী তথা অনৈসলামিক পরিবেশ, শিরকমূলক ও বিদআতসর্বস্ব কার্যকলাপ, রসম, জাহিলী, আমল-আখলাক, ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে; অধিকন্তু আমির শ্রেণী ও রাজা-বাদশাহর ভোগ-বিলাস ও জোর-যবরদস্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও জিহাদি প্রেরণা সৃষ্টি হতো। এরই ফলে ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি যুগে ও মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোণে এমন সব উন্নত মনোবলসম্পন্ন ও অটুট ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মানুষ জন্ম নিতে থাকেন, যারা এ উম্মাহর মধ্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করেছেন, মুসলিমগণের মুর্দা দেহে জিহাদী রুহের সঞ্চার করেছেন, বছরের পর বছর ধরে জড় ও নির্জীব সমতলে গতি ও তরঙ্গের সৃষ্টি করেছেন, মাস'আলা-মাসাইল ও বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেদের চিন্তা ও চেতনা জীবন্ত করেছেন এবং মুজতাহিদসুলভ যোগ্যতা দিয়ে মুসলিমদের মধ্যে নবতর ইসলামী রূহ ও মানসিক জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। পর্যবেক্ষণসূলভ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী একজন ঐতিহাসিকের চোখে জিহাদ ও তাজদীদের ইতিহাসে কোন শূন্যতা ও বিরতি দৃষ্টিগোচর হয় না। সংস্কারের জ্বলন্ত মশাল ও প্রদীপ অব্যাহত পন্থায় একের থেকে অন্যে আলো জ্বেলে দিয়েছে এবং প্রবল ঘূর্ণিঝড়ও সে আলো নিভিয়ে দিতে পারেনি।"[১৯৩]

৪.২.৭ ক্রুসেড ও জঙ্গি খান্দান

খ্রিষ্টান ইউরোপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ফিরে ইসলামের উপর ক্ষুব্ধ ছিল। মুসলিমগণ তাঁর গোটা প্রাচ্য সাম্রাজ্যের উপর দখল জমিয়ে রেখেছিল এবং তাদের সমস্ত পবিত্র স্থানেই মুসলিমদের দখলে ছিল। কিন্তু শক্তিশালী মুসলিম সম্রাজ্যের উপস্থিতিতে ও প্রতিবেশী খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর উপর তাদের অব্যাহত অগ্রাভিযানের দরুন তাদের আক্রমণ পরিচালনা করার সাহস হতো না। হিজরী পঞ্চম খ্রি. ১১শ শতাব্দীর শেষে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, ইউরোপের ক্রুসেড যোদ্ধারা সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অভিমুখে ধাবিত হয় এবং তাদের সেনাবাহিনী বন্যা ও তুফানের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। ৪৯২ হি./ ১০৯৯ খ্রি. সনে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম (বায়তুল মুকাদ্দাস) জয় করে নেয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের এক বিরাট অংশই তাদের দখলে চলে যায়। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপন বলেন:

The crusaders penetrated like a wedge between the old wood and the new and for a while seemed to cleave the trunk of Mohammad an Empire into splinters. অর্থাৎ, "ক্রুসেডাররা এসব দেশে এমন সহজে ঢুকে

১৯৩. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *তারীখে দাওয়াত ও আযীমত* (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৭), খ. ১, পৃ. ৯৭

পড়েছিল যেমন পুরোনো কাষ্ঠখণ্ডের ভিতর খুব সহজে পেরেক ঢুকানো হয়। স্বল্প সময়ের জন্য এমন মনে হচ্ছিল যে, তারা ইসলামরূপী বৃক্ষের মূল কাণ্ড উপড়ে ফেলে তা ধুনিত তুলার মতো উড়িয়ে দেবে।"[১৯৪]

ক্রুসেডাররা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময় বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে অসহায় মুসলিমদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল তার উল্লেখ করে ইয়াকুত আল-হামাবী বলেন, "So terrible, it is said, was the carnage which followed that the horses of the crusaders who rode up to the mosque of Omar were knee-deep in the stream of blood. Infants were seized by their feet and dashed against the walls or whirled over the battlements, while the Jews were all burnt alive in their synagogue."

অর্থাৎ, "বায়তুল মুকাদ্দাসে বিজয়ি বেশে প্রবেশ করার পর ক্রুসেড যোদ্ধারা এভাবে পাইকারি হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল যে, যে সব ক্রুসেড যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে ওমর (রা.) তে গিয়েছিল তাদের ঘোড়ার হাটু পর্যন্ত রক্তের বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। বাচ্চা শিশুদেরকে পা ধরে দেওয়াল গাত্রে আছড়ে মারা হয় অথবা প্রাচীরের ওপর থেকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। অন্যদিকে ইয়াহুদীদেরকে তাদের সিনাগগের মধ্যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।"[১৯৫]

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতন এবং খ্রিষ্টান বিশ্বের উত্থান ও ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচায়ক। এ ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য বিপদ সংকেত। খ্রিষ্টানদের দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা এরপর থেকে এতখানি বেড়ে যায় যে, কিরক-এর শাসনকর্তা রেজিনাল্ড মক্কা মুআয্যামা ও মদীনার ওপর আক্রমণ পরিচালনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল। রিদ্দার ঘটনার পর ইসলামের ইতিহাসে এর চাইতে বেশি নাযুক মুহূর্ত ও বিপজ্জনক সময় আর আসেনি।

৪.২.৮ জাহিলিয়াতের জন্য প্রতিবন্ধকতা

কিন্তু মুসলিম জাতির যাবতীয় খারাবি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নিজেদের সর্বপ্রকার স্খলন সত্ত্বেও সমকালীন সমস্ত জাহেলি জাতি গোষ্ঠির মুকাবিলায় আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম প্রদর্শিত রাজপথের কাছাকাছি অবস্থান করছিল এবং তারা আল্লাহর অধিক অনুগত ও বাধ্য ছিল।

---

১৯৪. Stanley Lane-Poole, *Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem* (London: G. P. Putnam's Sons, 1906), p. 214

১৯৫. ইয়াকুত আল-হামাবী, *মু'জামুল বুলদান* (বৈরুত: দারু সাদির প্রকাশনী, ১৯৫৭), পৃ. ১১৬

তাদের অস্তিত্ব ও তাদের ছিটেফোঁটা ক্ষমতা জাহিলিয়াতের বিস্তার ও উন্নতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধক প্রমাণিত হচ্ছিল। তারা নিজেদের যাবতীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও দুনিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ছিল যাদেরকে অপরাপর রাজশক্তি ভয় পেত এবং সদা সন্ত্রস্ত থাকতো। তাদের দৃষ্টিতেও মুসলিমগণ বিরাট গুরুত্বের অধিকারী ছিল। বাহ্যিক অবয়বে ধরা না পড়লে ও এবং বাইরের হুকুমতগুলোর কাছে তা অনুভূত না হলেও ভেতর থেকে এ শক্তি ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে চলেছিল, এমন কি হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাদের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক দুর্বলতা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে এবং মুসলিম শক্তির সে ভীতিকর ছায়া যা দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হতো তা দৃষ্টিপথ থেকে অপসৃত হয়ে যায়। সাথে সাথে মুসলিমগণের উপর বর্বর ও অসভ্য জাতিগোষ্ঠী এবং প্রতিপক্ষ শক্তিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম দেশগুলো লাওয়ারিশ মালের মতো বিজয়ী শক্তিগুলোর হাতে ভাগ-বণ্টিত হতে থাকে।

৪.২.৯ তাতারী ফেতনা

এ সব বন্য ও বর্বর আক্রমণের মধ্যে সব চাইতে বড় আক্রমণ ছিল তাতারীদের আক্রমণ যা পিপীলিকা ও পতঙ্গের ন্যায় প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকে অগ্রসর হয় এবং সমগ্র মুসলিম জাহান ছেয়ে ফেলে। তাতারী আক্রমণ মুসলিম জাহানের জন্য ছিল এক মহাদুর্যোগ যার ফলে মুসলিম বিশ্বের ভিত্তিই নড়বড় হয়ে যায়। মুসলিমরা ছিল হতবিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এক ধরনের ত্রাস ও নৈরাজ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছিল। একবার তো প্রায় গোটা মুসলিম জাহানই (বিশেষ করে এর প্রাচ্য ভূখণ্ড) এ মর্মবিদারক ফেতনার আওতায় চলে এসেছিল। ঐতিহাসিক ইবন আছিরও এই ঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর মনের অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া প্রচ্ছন্ন করতে পারেনি। তিনি লিখেছেন:

"এ এমনই এক দুর্ঘটনা ও এমনই এক মসীবত যে, দুনিয়ার ইতিহাসে এর কোন নযীর পাওয়া যাবে না। এ ঘটনার সম্পর্ক গোটা মানব সমাজের সঙ্গে। যদি কেহ দাবি করে, আদম (আ) এর পর থেকে আজ অবধি দুনিয়ার বুকে এ ধরনের নির্দয় ঘটনা আর একটিও ঘটেনি তবে তা ভুল হবে না। আর তা এজন্য যে, ইতিহাসে এর সমপাল্লার কোন ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় না। দুনিয়া কেয়ামত পর্যন্ত (ইয়াজুজ মাজুজ ভিন্ন) কখনো যেন এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ না করে। ঐ সব বর্বর পশু কারোর প্রতি এতটুকু কৃপা দেখায় নি। তারা নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করেছে, মহিলাদের পেট চিরেছে এবং গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করেছে। লা-হাওলা ওলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি'ল আলিয়ই'ল আযিম। এ দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা ছিল যেন বিশ্বগ্রাসী! মহাপ্লাবন আকারে এটা দেখা দেয় এবং দেখতে দেখতেই তা গোটা

পৃথিবীটাই যেন ছেয়ে ফেলে।"[১৯৬] ৬৫৬ হিজরিতে এ বন্য ও বর্বর তাতারীরা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে এবং এর অস্তিত্ব লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

ঐতিহাসিক ইবন কাছীর বাগদাদের ধ্বংস ও তাতারীদের ব্যাপক গণহত্যা ও হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা লিখতে গিয়ে বলেন: "চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাগদাদে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসের রাজত্ব চলে। চল্লিশ দিন পর তৎকালীন বিশ্বের গৌরবোজ্জ্বল ও জমজমাট এ শহরটি এমনভাবে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয় যে, মাত্র গুটি কয়েক লোকই সেখানে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বাজার ও পথ-ঘাটগুলো ছিল মানুষের লাশে পূর্ণ। লাশের এক একটি স্তুপ ছোটখাটো একটি টিলার মত মনে হচ্ছিল। এসব লাশের ওপর বৃষ্টিপাত হলে তা ফুলে আরও বীভৎস আকার ধারণ করে। গোটা শহর ভর্তি গলিত লাশের গন্ধে এলাকার আবহাওয়াই দূষিত হয়ে পড়ে। ফলে চতুর্দিকে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সিরিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। দূষিত আবহাওয়া ও মহামারীর কারণে আরও বহু লোক মারা যায়। বাগদাদে তখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ধ্বংস-এ তিনের রাজত্ব চলছিল।"[১৯৭]

৪.২.১০ মিসরীয় সেনাবাহিনীর মুকাবিলায় তাতারীদের পরাজয়

ইরাক ও সিরিয়া দখলের পর তাতারীদের লক্ষ্য স্বাভাবিকভাবেই মিসরের দিকে ছিল। তখন মিসরই ছিল একমাত্র দেশ যা তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। মিসরের সুলতান আল-মালিকুল মুজাফফর সায়ফুদ্দীন কুতুয পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন, এবার নির্ঘাত মিসরের পালা। তাতারীরা যদি আগেভাগেই তাঁর ওপর চড়াও হয়ে বসে তাহলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। অতএব, মিসরের অভ্যন্তরে থেকে আত্মরক্ষার পরিবর্তে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শামে তাতারীদের হামলা পরিচালনা পরিচালনা করাটাকেই তিনি সমীচীন মনে করলেন। অনন্তর ৬৫৮ হিজরির পবিত্র মাহে রমযানের ২৫ তারিখে আয়ন-ই জালূত নামক স্থানে তাতারীদের সঙ্গে মিসরের মুসলিম ফৌজের তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার বিপরীত এ যুদ্ধে তাতারীদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং তাঁরা পালাতে থাকে। মিসরীয় ফৌজ পলায়নরত তাতারিদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ব্যাপক হারে তাদের কচুকাটা করে। বিপুল সংখ্যক তাতারী মুসলিমগণের হাতে বন্দীও হয়। এ প্রসঙ্গে আবুল হাসান আলী নদভী বলেন: "সায়ফুদ্দীন কুতুয-এর পর আল-মালিকুজ-জাহির বায়বারস কয়েকবার তাতারীদের উপর্যুপরি পরাজিত করেন এবং গোটা সিরিয়া থেকে তাদেরকে

১৯৬. *জামেউল উসূল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১৯৭. হাফেয ইব্ন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ* (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি:/১৪১৩হি:), খ. ১৩, পৃ. ৩০৪

উৎখাত ও বহিষ্কৃত করেন। এভাবে 'তাতারীদের পরাজয় অসম্ভব' এই প্রবাদ বাক্যটি মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।"[১৯৮]

৪.২.১১ মুসলিম জাহানে তাতারী হামলার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

তাতারী আক্রমণের ফলে মুসলিম জাহানে এমন এক ধাক্কা লাগে যা সামাল দেবার জন্য বহু সময়ের দরকার ছিল। তাতারী হামলার ফলেই মুসলিমগণের চিন্তা শক্তিতে নির্জীবতা ও উদাসীনতা এবং তবিয়তে হতাশা ও স্থবিরতা জন্ম নেয়। এ হামলার ফলে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য, রচনা, নৈতিক চরিত্র ও আচার-আচরণ ও সামজিকতা সব কিছুর ওপর প্রভাব পড়েছিল। জ্ঞান ও সাহিত্য ভাণ্ডারে নতুন নতুন দিক রচনা, সংস্কার, নির্মাণ ও উন্নয়ন সাধনের পরিবর্তে এখন জ্ঞানী-গুণী ও দ্বীন-ধর্মের ধারক-বাহকেরা কোনমতে বর্তমান পুঁজির রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাযতের যুক্তি সম্মত করার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং মানব সভ্যতার এ ছিল এক বিরাট দুর্ভাগ্য যে, দুনিয়ার নেতৃত্বের বাগডোর সে সব মূর্খ ও বন্য জাতিগোষ্ঠীর হাতে গিয়ে পড়েছিল যাঁদের না ছিল কোন আসমানি ধর্ম আর না তারা কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিরই মালিক ছিল। তাদের নেতৃত্বাধীনে কোন প্রকার জ্ঞানগত ও ধর্মীয় উন্নতির আশা করা যেতে পারে না।

তাদের ইসলাম কবুলের পর যদি ও মুসলিমরা তাদের ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তপাতের হাত থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও মিলেছিল, ইসলাম শাসক শ্রেণীর ধর্ম বনে গিয়েছিল, কিন্তু এইসব নও মুসলিম তাতারীদের মধ্যে আর যা-ই হোক, ধর্মীয় ও তত্ত্বগত নেতৃত্ব দেবার এবং ইসলামী ইমামতের যোগ্যতা ও সামর্থ্য ছিল না। এ যোগ্যতা ও সামর্থ্য সৃষ্টি হওয়ার জন্য এক দীর্ঘ সময়ের দরকার ছিল। সে মুহূর্তে এমন একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত উন্নত মনোবলসম্পন্ন মুজাহিদ চরিত্রের অধিকারী জাতিগোষ্ঠীর প্রয়োজন ছিল যারা পতনোন্মুখ মুসলিম জাহান কে সামাল দিতে পারেন, তাদের মধ্যে নতুন জীবন ও নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন এবং মুসলিম জাহানের নেতৃত্ব প্রদানে এগিয়ে আসতে পারেন।

৪.২.১২ নেতৃত্বের ময়দানে উসমানী তুর্কীদের আগমন

কিছুকাল পরেই হিজরী ৮ম শতাব্দীতে উসমানী তুর্কীরা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হয়। তারা দুনিয়াকে সাধারণভাবে ও মুসলিমগণের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে নিজেদের দিকে সে সময় আকর্ষণ করে যখন সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ হিজরী ৮৫৩ সনে/ ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের অজেয় রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয় কর নেন।

---

১৯৮. *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

এ ঘটনা মুসলিমগণের মধ্যে এক নতুন আবেগ-উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তুর্কীরা যাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল উসমানী রাজবংশ-এর যোগ্য ছিল যে, তাদের ওপর মুসলিম জাতির নেতৃত্বের ব্যাপারে, মুসলিমদের শক্তিকে আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে, দুনিয়ার বুকে তাদের হৃত সম্মান ও মর্যাদা পুনুরুদ্ধারের ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করা হবে। যে কনস্টান্টিনোপল বিগত আটশত বছর ধরে বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বে ও মুসলিমগণের নিকট অজেয় ছিল, তুর্কীরা তা-ই জয় করে। এটা ছিল তাদের পারঙ্গমতা, শক্তি-সামর্থ্য ও সাময়িক উদ্ভাবনী শক্তির চরমোৎকর্ষ লাভেরই প্রমাণবহ। তারা যে সামরিক শক্তি ও সমরোপকরণের ক্ষেত্রে সমকালীন পৃথিবীর তামাম জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় অগ্রগামী ও শ্রেষ্ঠ ছিল এটা ছিল তাঁর সুস্পষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু তাদের মধ্যে এ সামর্থ্য বিদ্যমান ছিল, তারা তাদের লক্ষ্য হাসিলের নিমিত্ত জ্ঞান ও কর্মের শক্তি ও ইজতিহাদের দ্বারা কাজ নিতে পারে এবং জাতির যিনি নেতৃত্ব দেবেন তাঁর জন্য এ সমস্ত গুণ থাকা অপরিহার্য শর্তও বটে।

পাশ্চাত্য লেখক Baron Carra de Vaux সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন: The victory of muhammad, the conqueror, was not a gift of fortune or the result of the estern Empire having grown weak, the sultan had been preparing for it for a long time. He had taken advantage of all existing scientific knowledge. The cannon had justbeen invented and he decided toequip himself with the biggest cannon in the world and for this he acquired the services of a hungarian engineer who constructed a canoon that could fire a ball weighing 300 k.g.s to a distence of one mile. it is saaid that this cannon was pulled by 7oo men and took two hours to be loaded, Muhammad marched upon Constantinople with 300000 soldiers and a strong artillery, His fleet, which besieged the city from the sea, consisted of 120 warships, By great ingenuity the Sultan resolved to send a part of his fleet by land. He launched seventy ships into the sea from the direction of Qadim Pasha by carrying them over wooden boards upon which fat had been applied (to meke them slippery.)

অর্থাৎ, "এ বিজয় কেবল ভাগ্যের জোরে কিংবা আকস্মিকভাবে হঠাৎ করে অর্জিত হয়নি। আর কারণ কেবল বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের দুর্বলতাই ছিল না। আসল কারণ ছিল এ, সুলতান মুহাম্মদ অনেক আগে থেকেই এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং

তাঁর যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতগুলো শক্তি ছিল সে সবের সাহায্য নিচ্ছিলেন। সে সময় নতুন নতুন কামান আবিষ্কার হচ্ছিল। তিনি সে যুগে যত বড় বিরাট ও শক্তিশালী কামান তৈরি করা সম্ভব তাঁর জন্য চেষ্টা চালান। এজন্য তিনি হাঙ্গেরির জনৈক ইঞ্জিনিয়ারকে কাজে লাগান। তিনি সুলতানের চাহিদানুযায়ী এমন একটি কামান তৈরি করেন যার সাহায্যে তিনশ কিলোগ্রাম ওযনের গোলা এক মাইল দূরে নিক্ষেপ করা যেত। এ কামান টেনে নেবার জন্য সাতশত লোকের প্রয়োজন পড়ত এবং এতে গোলা ভর্তির জন্য দু ঘণ্টা সময়ের দরকার হতো। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ যখন কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য বহির্গত হন তখন তিন লক্ষ সৈন্য তাঁর অধীনে ছিল আর ছিল বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী কামান বহর। একশ বিশটি জাহাজসম্বলিত তাঁর নৌবহর কনস্টান্টিনোপলকে সমুদ্রের দিকে অবরোধ করে রেখিছিল। তিনি তাঁর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেন সামরিক বহরের একটি অংশ স্থলভাগ দিয়ে উপসাগর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি কাঠের গুড়িগোলোকে চেঁছে-ছুলে তার উপর চর্বি মাখিয়ে তার উপর দিয়ে জাহাজ বহর টেনে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। আর এভাবে কাসেম পাশার অধীনে ৭০ টি জাহাজ সমুদ্রে ভাসিয়েছিলেন।"[১৯৯]

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ সম্পর্কে ইউরোপ এতটা ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল যে, তাঁর ইন্তিকালে রোমের পোপ আনন্দ উৎসব করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনদিন অব্যাহতভাবে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার নির্দেশ জারী করেছিলেন।"[২০০]

৪.২.১৩ তুর্কীদের অধঃপতন

তুর্কি জাতির দুর্ভাগ্য যে, উন্নতি-অগ্রগতি ও উত্থান যুগেই তুর্কীদের পতন শুরু হয়ে যায় এবং প্রাচীন জাতিগুলোর পুরাতন রোগ-ব্যাধিতে তারাও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের পরস্পরের ভিতর হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা দেখা দিল। সুলতান স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে লাগলেন। শাসকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিগড়ে যায়। চারিত্রিক অধঃপতন শুরু হয়ে যায়। প্রশাসকবৃন্দ ও সিপাহসালার জাতি ও সাম্রাজ্যের সঙ্গে বেঈমানী ও গাদ্দারী করতে থাকে। জাতির মধ্যে আরামপ্রিয়তা ও আয়েশী জীবনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হতে থাকে। মোটের উপর পতনোন্মুখ জাতির সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হয়ে যায় সে সবের বিস্তারিত বিবরণ তুর্কিদের ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে মিলবে।[২০১]

---

১৯৯. Baron Carra de Vaux, *Islamic thinkers* (Paris: G. Beauchesne, 1909), V. 1, P. 210

২০০. *ফালসাফা-ই তারীখুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

২০১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪

৪.২.১৪ তুর্কি জাতির স্থবিরতা ও পশ্চাৎপদতা

সবচেয়ে বড় যে রোগটি তুর্কীদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে জড়তা ও স্থবিরতা এবং সমরশাস্ত্র, সামরিক সংগঠন ও উন্নতি-অগ্রগতির ক্ষেত্রে তারা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল কুর'আন মাজীদের আয়াত:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

অর্থাৎ, "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের ওপর এবং তোমাদের শত্রুদের ওপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের ওপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন।"[২০২]

এমতাবস্থায় যখন তারা ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহ ও জাতি-গোষ্ঠীগুলোর মাঝে ঘেরাও অবস্থায় ছিল তখন তাদের মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এর সে সব উপদেশ সব সময় স্মরণ রাখা দরকার ছিল যা তিনি মুসলিমগণকে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তোমরা কখনো এ কথা ভুলবে না, তোমরা কিয়ামত অবধি বিপদের মুখোমুখি অবস্থায় রয়েছে এবং এক গুরুত্বপূর্ণ পথের প্রান্তদেশের ওপর দাঁড়িয়ে আছ। এজন্য তোমাদেরকে সব সময় হুশিয়ার থাকতে হবে, সদাসতর্ক থাকতে হবে, সশস্ত্র অবস্থায় থাকতে হবে। কেননা তোমাদের চতুর্দিকে শত্রু। তাদের দৃষ্টি রয়েছে তোমাদের ওপর, তোমাদের দেশের ওপর। কিন্তু নিতান্তই আফসোসের বিষয়, তুর্কীরা নিশ্চিন্তে বসে রইল। স্বস্থানে নিশ্চিন্ত হয়ে আসন গেড়ে রইল। অপর দিকে ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠী কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌছল। প্রখ্যাত মনীষী আবুল হাসান আলী নদভী তুর্কীদের এ জ্ঞান ও শিক্ষারাজ্যের স্থবিরতা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন:

"পৃথিবীর ওপর যতদিন মুতাকাল্লিমদের দর্শনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল তুরস্কের জ্ঞানী-গুণী ও উলামায়ে কিরাম নিজেদের কাজ নেহায়াত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে থাকেন। সুলায়মানিয়া মাদরাসা ও সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ মাদরাসা সে সময় প্রচলিত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান শাস্ত্রের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগত কালামশাস্ত্রের শেকল ভেঙ্গে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপন করল যা দুনিয়ার জীবনে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল তখন আলেম উলামা সম্প্রদায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের আর যোগ্য রইল না। তারা মনে করতেন যে, এয়োদশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান সে অবস্থায় ছিল সেখান থেকে তা আর এক-কদম ও

২০২. আল-কুর'আন, ৮ : ৬০

সামনে অগ্রসর হয়নি। এ ধরনের ধারণা উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় জেঁকে বসে থাকে। তুরস্ক অপরাপর মুসলিম দেশগুলোর আলিম-উলামার এ ধরনের ধ্যান-ধারণা ইসলামী প্রেরণার সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ রাখে না। কালাম শাস্ত্রীয় দর্শন কিংবা ইলমে কালাম চাই তা খ্রিষ্টানদের হোক অথবা মুসলমানদে হোক তা গ্রীক দর্শনের ওপর স্থাপিত। এর ওপর কম বেশি এরিস্টোটলের এ দর্শন ছিল পৌত্তলিক দর্শন।"[২০৩]

পাশ্চাত্য জগত যখন প্রকৃতির অধ্যয়ন পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে করতে শুরু করল তখন গির্জার পোপরীদের হুশ-জ্ঞান লোপ পাবার দশা। এদিকে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ায় সাদৃশ্য বড় বড় আবিষ্কার-উদ্ভাবন হতে লাগলো আর ওদিকে খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের মনে ভীতির সৃষ্টি হলো, এবার গির্জার রাজত্ব শেষ হবার পালা!

ধর্ম ও বিজ্ঞানের এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্টান গির্জাকেই আপোসকামিতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। গির্জা তাঁর স্কুল ও ধর্মীয় পাঠশালা-গুলোর সিলেবাসে বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যা আগে একেবারেই ইসলামী মাদরাসা গুলোর মতই ছিল, বিজ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু এর সাথে সাথে সে ইন্দ্রিয়াতীত দর্শনকেও পরিত্যাগ করেনি। ফল হলো, গির্জার প্রভাব শিক্ষিত শ্রেনীর ওপর ন্যূনতম পক্ষে একটি অংশের ওপর বহাল থাকে। ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট পাদরিরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ নতুন শাখাগুলোতে পারদর্শী হতেন এবং নতুন যুগের যুবকদের সঙ্গে যে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে পারতেন।

উসমানীয়দের এখানে আলিম-উলামাদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। তারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করে নি, বরং নতুন চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা তাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়নি। এদিকে পতন যুগে তাদের রাজনৈতিক ব্যস্ততা এতটা বৃদ্ধি পায় যে, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ঝামেলায় জড়াবার মত তাদের ফুরসত ছিল না। সোজা প্রেসক্রিপশন ছিল, এরিস্টটলের দর্শনের ওপর আসন গেড়ে বস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বুনিয়াদ দলীল-প্রমাণের ওপর থাকতে দাও। অনন্তর ইসলামী মাদরাসাগুলোর ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সে রঙই টিকে থাকে যা ছিলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

৪.২.১৫ মুসলিম বিশ্বের সাধারণ বুদ্ধিভিত্তিক ও জ্ঞানগত অধঃগতি

জ্ঞানগত জড়তা, স্থবিরতা ও বুদ্ধিভিত্তিক পশ্চাৎপদতা সে সময় কেবল তুর্কীদের শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় মহলেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না, বরং পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এক জ্ঞানগত বিপর্যয়ের শিকার ছিল। তাদের মস্তিষ্ক ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত এবং

২০৩. *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

তাদের স্বভাব-প্রকৃতি নিভু নিভু প্রায় দৃষ্টিগোচর হতো। জড়তা ও বিষণ্নতা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আকাশকে ছেয়ে রেখেছিল। যদি সতর্কতার সাথে অষ্টম শতাব্দী থেকে এ বুদ্ধিভিত্তিক পশ্চাতপদতার সূচনা না ধরা হয়, তবুও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হিজরি ৯ম শতাব্দীই ছিল শেষ শতাব্দী যখন চিন্তার ক্ষেত্রে নতুনত্ব, ইজতিহাদী তথা উদ্ভাবনীশক্তি এবং সাহিত্য, কাব্যে, দর্শনে ও শিল্পকালায় শ্রেষ্ঠত্ব ও সৃষ্টিশীলতার চিহ্ন চোখে পড়ে। এটাই ছিল সে শতাব্দী যে শতাব্দীতে ইবনে খালদুনের মুকাদ্দামার ন্যায় গ্রন্থ মুসলিম জাহান লাভ করে।

হিজরী ১০ম শতাব্দীতে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে উদাসীনতা ও নির্জীবতা, অন্ধ আনুগত্য তথা তাকলীদ ও অনুকরণের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। এ উদাসীনতা ও পশ্চাৎপদতা কোন বিশেষ শাখা বা কোন বিশেষ শাস্ত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট ছিলো না। ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, রচনা, ইতিহাস, শিক্ষা পাঠক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থা সব কিছুই কমবেশি এর দ্বারা প্রভাবিত দৃষ্টিগোচর হয়। বিগত শতাব্দীগুলোর আলিম-উলামাদের আলোচনা ও জীবনী গ্রন্থসমূহ পাঠ করুন, শত শত নামের মধ্যে এমন এক জনের নাম মেলা ভার হবে যাকে ক্ষণজন্মা প্রতিভা হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে কিংবা বিশেষ শাখায় কোন মূল্যবান সংযোজন ঘটিয়েছেন।"[২০৪]

বিগত শতাব্দীগুলোতে কয়েকজনকে এর বাইরে রাখা যায় যারা নিজেদের যুগে সাধারণ শিক্ষাগত ও বুদ্ধিভিত্তিক মানের দিক দিয়ে বহু ঊর্ধ্বে অবস্থান করতেন, যারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে কিংবা শিক্ষার ময়দানে বিরাট কোন বিপ্লবাত্মক অবদান রেখেছেন অথবা জ্ঞানের জগতে যুগান্তকারী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, ব্যতিক্রম এ মনীষীগণের সকলেই ভারতীয় উপমহাদেশের। এদের অন্যতম শায়খ আহমাদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফেছানী যার লিখিত মাকতূবাত ইসলামের ইলমী ও ধর্মীয় পুজির ভাণ্ডারে এক মূল্যবান সংযোজন ঘটিয়েছে এবং যিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছেন।দ্বিতীয় জন হলেন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী যার লিখিত হুজ্জাতুল্লাহ বালিগা, ইযালাতুল খিফা, আল-ফাওযুল-কাবীর ও রিসালাতুল ইনসাফ নামক গ্রন্থ স্ব স্ব ক্ষেত্রে একক ও অনন্য। তৃতীয়জন তাঁরই পুত্র শাহ রফীউল্লাহ দেহলভী যার 'তাকমীলুল আহযান' ও 'রিসালা আসরারুল মুহব্বত' নামক গ্রন্থ কতক বিষয়ে নতুন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা পেশ করেছে। চতুর্থজন হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী যার 'মানাসাবে ইমামত' ও 'আবাকাত' নামক দুটি গ্রন্থ ইজতিহাদী গ্রন্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে এবং স্ব স্ব বিষয়বস্তুর ওপর অতুলনীয় গ্রন্থ। তেমন ফিরিঙ্গী মহলের খান্দান ও ইউরোপের কোন কোন শিক্ষাক্রমের ধারা আপন মেধা ও সৃষ্টিকুশলতার ক্ষেত্রে খুবই বিশিষ্ট দেখতে পাওয়া যায় এবং তারা

২০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪

তাদের সমকালীন শিক্ষিত মহলের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছেন। কিন্তু তাদের মেধা ও পাণ্ডিত্য পাঠ্যসূচির সীমা খুব কমই অতিক্রম করে।

কেবল ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, কাব্য ও সাহিত্য তাঁর পেলবতা ও সজীবতা হারিয়ে ফেলেছিল এবং এসবের ওপরও তাকলীদ তথা অন্ধ অনুকরণ প্রিয়তা জেঁকে বসেছিল। রচনা ও গদ্য সাহিত্যকেও কৃত্তিমতা, লৌকিকতা, ছন্দের তাবেদারী, শব্দের কচকচানি ও অলংকার বাহুল্য নিষ্প্রাণ ও নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল। বন্ধুদের কাছে লিখিতপত্র, ইতিহাস গ্রন্থ ও দাফতরিক লেখালেখি ও ফরমানগুলো ও এ সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলো না। কোথাও কোথাও সাহিত্য ও রচনার এমন কোন নমুনা পাওয়া যেত না সে যুগের সাধারণ রুচি থেকে স্বতন্ত্র ও নীচু মানের চেয়ে কিছুটা উন্নত দৃষ্টিগোচর হয়। মাদ্‌রাসাগুলোও অন্য বিদ্যালয়গুলোকেও পঠন জড়তা ও অন্ধ আনুগত্যের শিকার এবং এক ধরনের জ্ঞানগত ও চিন্তাগত পতনের হাতে বন্দী দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের আলিমগণের জ্ঞান-বিদ্যামণ্ডিত ও রুচিসম্বলিত কিতাবগুলো পাঠ্যসূচি থেকে ক্রমান্বয়ে বাদ দেয়া হয়। সেগুলোর স্থলে পরবর্তী যুগের আলিমগণের লিখিত ইজতিহাদী মর্যাদায় অনুত্তীর্ণ কিতাবাদি পাঠ্যসূচিভুক্ত হয়। এসব গ্রন্থের লেখকরা ছিলেন পূর্ববর্তী যুগের আলিমগণের নিছক অন্ধ অনুকরণকারী, পাদটিকা রচয়িতা ও ভাষ্যকার। ফলে মতন তথা মূল পাঠের স্থান দখল করে টীকা-ভাষ্য যে সবের রচনায় ঐ সব লেখক বা গ্রন্থকার কাগজ সম্পর্কে অত্যন্ত মিতব্যয়ীতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং সাধারণের পক্ষে বোধগম্য ও প্রাঞ্জল সুস্পষ্ট ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে ইশারা-ইঙ্গিত ও সুক্ষ্ম রহস্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এ সবের থেকে সে জ্ঞানগত ও বুদ্ধিভিত্তিক পতনের পরিমাপ করা যাবে না যা সমগ্র মুসলিম জাহানের ওপর ছেয়ে ছিল এবং যা থেকে তাঁর কোন দিক ও জীবনের কোন শাখাই মুক্ত থাকে নি।

৪.২.১৬ ইউরোপের শিল্প বিপ্লব, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও মুসলিম বিশ্ব

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই তুর্কীরা অবনতি, অধঃপতন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা ও স্থবিরতার শিকার হয়ে গিয়েছিল। মানব ইতিহাসের এটাই সে গুরুত্বপূর্ণ যুগ যার প্রভাব পরবর্তী শতাব্দীগুলোর ওপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। এ ইউরোপ তাঁর দীর্ঘ নিদ্রা থেকে আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে ওঠেছিল এবং প্রবল জোশে ও পাগলের ন্যায় ওঠে পড়ে অলসতা ও অজ্ঞতার এ দীর্ঘ যুগের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হচ্ছিল। তারা জীবনের প্রতিটি শাখায় জ্যামিতিক গতিতে উন্নতি করছিল। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ আয়ত্ত, সৃষ্টি জগতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার পর্দা উন্মোচন এবং অজানা সমুদ্র ও ভূখণ্ড তারা আবিষ্কার করছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাদের বিজয় ও জীবনের প্রতিটি শাখায় তাদের আবিষ্কার-উদ্ভাবন অব্যাহত ছিল। এ সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে তাদের ভেতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় বড় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, আবিষ্কারক ও উদ্ভাবকের জন্ম হয়।

এদের মধ্যে কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও। কেপলার ও নিউটন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। পর্যটক ও নাবিকদের মধ্যে কলম্বাস, ভাস্কো দাগামা ও ম্যাগলিন-এর মত উদ্যমী, সাহসী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যারা নতুন পৃথিবী, নতুন নতুন সাগর ও অজানা অনেক দেশ আবিষ্কার করেন। জাতিসমুহের ইতিহাস এ যুগে নতুনভাবে বিন্যস্ত হচ্ছিল। এ আমলের এক একটি মুহূর্ত কয়েক দিনের এবং এক একটি দিন কয়েক বছরের সমতুল্য ছিল। এ যুগসন্ধিক্ষণে যে প্রস্তুতির একটি মুহূর্ত খুইয়েছে কার্যত তাঁর সুদীর্ঘকাল নষ্ট হয়ে গেছে। নিতান্তই আফসোসের বিষয়, মুসলিমগণ এ সময় কয়েকটি মুহূর্ত নয়, বরং কয়েকটি শতাব্দী নষ্ট করেছে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠী এ সময় একটি মিনিট নয়, এক একটি সেকেন্ডের মূল্য দিয়েছে এবং এর থেকে ফায়দা উঠিয়েছে এবং শতাব্দীকালের দূরত্ব বছরে অতিক্রম করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের ময়দানে তুর্কীদের পশ্চাৎপদতার পরিমাপ এথেকে করা যাবে, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর পূর্বে তুরস্কে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সূচনাই হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রেস, মুদ্রণ যন্ত্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ফৌজি প্রশিক্ষণের জন্য নতুন ধরনের স্কুলের সঙ্গে পরিচিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত তুরস্ক নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও উন্নতি-অগ্রগতি সম্পর্কে এতটাই অপরিচিত ছিল যে, রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের অধিবাসীরা যখন তাদের রাজধানীর আকাশে বেলুন ওড়াতে দেখতে পেল তখন তারা একে যাদু কিংবা যাদুর ঘুড়ির বেশি ভাবতে পারেনি। এ সময় ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পর্যন্ত প্রতিযোগীতায় তুরস্কের মুকাবিলায় অনেক এগিয়ে গিয়েছিল, এমনকি কি মিসর পর্যন্ত কোন কোন উপকারী বিষয়ে উপকৃত হবার ক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। তুরস্কের চার বছর আগেই মিসর রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক টিকেটের প্রচলনও তুরস্কের কয়েক মাস আগে মিসরে ঘটেছিল।

আবুল হাসান আলী নদভী বলেন: "অতঃপর মুসলিমগণের পতন কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রেই ছিল না, বরং এ পতন ছিল সাধারণ ও সর্বব্যাপী যা মুসলিমদের আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছিল, এমনকি সমর বিজ্ঞান ও সামরিক নৈপুণ্যের দিক দিয়েও তারা ইউরোপের তুলনায় পিছিয়ে গিয়েছিল, অথচ একদিন তারা এক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিল এবং সমর ক্ষেত্রে তুর্কীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের স্বীকৃতি সারা দুনিয়া দিত। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও ইউরোপ এগিয়ে যায়। তাঁরা তাদের গবেষণা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও উন্নত ব্যবস্থাপনার বদৌলতে সমর শাস্ত্রের ময়দানে তুরস্কের তুলনায় এগিয়ে যায়। ফলে ইউরোপ ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী ফৌজকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এতে করে দুনিয়ার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়, তুর্কিদের সামরিক শক্তি ইউরোপের খ্রিষ্টীয় জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এ পরাজয় তুরস্কের উসমানী

হুকমতের চোখ কিছুটা হলেও উন্মোচিত হয়। তারা কতিপয় ইউরোপীয় সমর বিশেষজ্ঞের সহায়তায় সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত ও প্রশিক্ষিত করে তোলার কাজ শুরু করে।"[২০৫]

কিন্তু সংস্কার ও উন্নয়নের মূল পদক্ষেপের সূচনা করেন সুলতান তৃতীয় সলীম উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায়। শাহী প্রাসাদের বাইরে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুলতান নতুন ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কায়েম করেন যেখানে তিনি নিজেই ক্লাস নিতেন। নিজাম-ই জাদীদ নামে তিনি এক নতুন ফৌজের ভিত্তি রাখেন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কিছুটা পরিবর্তন আনেন। কিন্তু তুর্কি জাতি ও সাম্রাজ্যের জড়তা ও স্থবিরতা এতটাই প্রকট ছিল যে, পুরাতন ফৌজ বিদ্রোহ করে সুলতানকেই হত্যা করে ফেলে। অতপর এ সংস্কারমূলক অভিযানে সুলতান ২য় মুহাম্মদ এবং তারপর সুলতান ১ম আব্দুল মজীদ প্রতিনিধিত্ব করেন। তুর্কী জাতি অতঃপর উন্নতি-অগ্রগতির পথে কিছুটা অগ্রসর হয়।

অগ্রগতির ময়দনে তুর্কী মুসলিমগণ যে দূরত্বটুকু অতিক্রম করে তাঁর সাথে ইউরোপীয়দের দূরত্বের মুকাবেলা করেন যা তারা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে অতিক্রম করেছিল। উন্নতি-অগ্রগতির ময়দানের এ দু'য়ের দৌড় প্রতিযোগিতা কচ্ছপ ও খরগোশের দৌড়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে পার্থক্য কেবল এতটুকুই, খরগোশ (এখানে ইউরোপ কে বুঝানো হয়েছে) সদাজাগ্রত ও ধাবমান আর অপরদিকে কচ্ছপ (এখানে তুর্কী সহ সমগ্র মুসলিম জাহান) তাঁর ধীর গতি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তন্দ্রা ও নিদ্রার মাঝে কিছুটা বিশ্রাম খোঁজে।

এ প্রসঙ্গে নাদভী বলেন, "অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে মরক্কো, আলজিরিয়া, মিসর, ভারতবর্ষ ও তুর্কিস্তানে প্রাচ্যের মুসলিম জাতিগোষ্ঠী এবং পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠী ও শক্তিগুলোর মধ্যে যে সংঘাত-সংঘর্ষ দেখা দেয় তাঁর ফয়সালা মূলত ১৬ শ ও ১৭ শ শতাব্দীতেই হয়ে গিয়েছিল এবং এর ফলাফল কী হবে তার ভবিষ্যদ্বাণী ও তখনই করে দেয়া যেতে পারত।"[২০৬]

---

২০৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯
২০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয়

পৃথিবীর দেশে দেশে চলছে হানাহানি। পশ্চিমাদের কূটচালে মুসলিমগণ পর্যুদস্ত। আরবের পেটের ভিতর 'বিষফোঁড়া ইসরাইল ছড়ি ঘোরাচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতির চিন্তাশীল নেতারা ইসলামের অগ্রগতি রোধে মিশনারি তৎপরতা, ধর্মবিদ্বেষী এনজিও, হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির প্রসার, নাস্তিকতা প্রচার, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক উস্কানি, মুসলিম জন্মহার কমানো, নাগরিকত্ব বাতিলসহ নানাবিধ কার্যক্রম শুরু করেন। এছাড়াও, জনসংখ্যা বা উঠতি শক্তি বাধাগ্রস্ত করার জন্য গণহত্যার মতো কর্মসূচি দিতে ও দ্বিধাবোধ করে না। পাশাপাশি আদর্শিক দিক দিয়ে মুসিলমগণের মাঝে উম্মাহর অবস্থান এবং ইসলাম সম্পর্কে অনেক অজ্ঞতা রয়েছে। নিচে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

৫.১ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি

বিশ্ব ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, নবুওয়্যাতের যুগের পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে অত্যন্ত সাফল্য জনকভাবে নবুওয়্যাতের পদাঙ্ক অনুসারী খেলাফতী শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। এরপরে যে রাজতান্ত্রিক যুগের আভাস দেওয়া হয়েছিল দীর্ঘ দিন যাবত দুনিয়াবাসী সে শাসন ব্যবস্থা দেখারও সুযোগ পেয়েছে। এ রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের প্রেক্ষাপটে যেসব শাসন ব্যবস্থা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা যে নামেই পরিচিত হোক না কেন মূলতঃ সেটি যুলুমতন্ত্রের নামেই অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

এক সময় পৃথিবী সমাজতান্ত্রিক ব্লক ও ধনতান্ত্রিক ব্লকে বিভক্ত হয়েছিল। মূলত: দুই তন্ত্রেরই মূল ভিত্তি ছিল জড়বাদ ও বস্তুবাদ, যা মানুষে মানুষে হানাহানি দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি ছাড়া মানুষকে প্রকৃত শান্তি কোনদিন দিতে পারেনি আর পারবেও না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শোষণমূলক ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহই জন্ম দিয়েছিল সমাজতন্ত্রের। এ সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা মানব জাতিকে চূড়ান্তভাবে এ সত্য উপলব্ধির সুযোগ করে দেয় যে, মানব রচিত কোন মতবাদ কোন তন্ত্র-মন্ত্রই মানুষের সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায়, ইনসাফ, নিশ্চিত করতে পারবে না, অবসান ঘটাতে পারবে না যুলুম, শোষণ, নীপিড়ন, নির্যাতনের। সমাজতন্ত্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মবিলুপ্তির পর আবার বিশ্ব পুঁজিবাদের করাল গ্রাসে নিপতিত হোক মানব সভ্যতার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আজকের এক কেন্দ্রিক বিশ্বে নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার প্রতিষ্ঠার নামে নতুন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিশ্বায়নের নামে ঔপনিবেশিক শাসনের চেয়েও জঘন্যভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। এরফলে সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত

অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলোর দুর্ভোগ বাড়ছে। বিশেষভাবে গোটা মুসলিম বিশ্ব আজ এর ফলে চরম অসহায় ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে।

বিশ্ব পরিস্থিতির এ পর্যায়ে জাতিসঙ্ঘ একটা অকার্যকর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মূলতঃ এ প্রতিষ্ঠান এক কেন্দ্রিক বিশ্বের নিয়ামক শক্তির রাবারস্ট্যাম্পে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে অতীতের দুই কেন্দ্রিক বিশ্বের অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক বিশ্বের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তৃতীয় শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তাও মূলত এখন বিলুপ্ত প্রায়। মুসলিম উম্মাহকে হেফাযতের জন্য বিশ্বব্যাপী অর্থবহ ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলার জন্য যে ও.আই.সি. গঠিত হয়েছিল ১৯৬৯ সনে, তাও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সংকট মোকাবেলায় তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। বর্তমান গোটা মুসলিম বিশ্ব যে আগ্রাসী শক্তির লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে তার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া মুসলিম জাহানের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণে এ পরিস্থিতি উত্তরণের আপাতত কোন উপায় আছে বলেও মনে হয় না। তাই সঙ্গত কারণে মুসলিম বিশ্বে চলছে এক চরম হতাশা। মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে যে যুগটাকে যুলুমতন্ত্রের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এটাই সে যুগ। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। মুসলিম বিশ্বের ওপর এ যুলুম নির্যাতনের হাত সম্প্রসারিত হচ্ছে তথাকথিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে। এ অধ্যায়টি ইতিহাসের সর্বশেষ অধ্যায় নয়। তাই আপাতঃ দৃষ্টিতে পরিস্থিতি যতই নাজুক হোক না কেন, রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তির প্রেক্ষাপটে অবশ্যই আসবে ইসলামের যুগ, খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাতের যুগ।

এ প্রসঙ্গে মতিউর রহমান বলেন, "মুসলিম দেশগুলো যখন এক এক করে ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে, ঠিক তখনি পরাশক্তির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে ইয়াহুদীরা ফিলিস্তিনে অবৈধ ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক সুদূর প্রসারী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মুসলিম বিশ্বের স্নায়ুকেন্দ্রে অবৈধ ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের দেশান্তরে বাধ্য করার জন্যই মূলত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সূচনা করা হয়েছে। অথচ, আজ এ সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে ইসলামী ব্যক্তিত্ব, সংগঠন তথা গোঁটা মুসলিম সমাজকে। বর্তমান বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলো মূলত: ইয়াহুদীবাদী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। সে সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার ওপরও তাদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বায়ন, মুক্ত বাজার, অর্থনীতি, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি শ্লোগানের আড়ালে রয়েছে তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও নীল নকশা বাস্তবায়নের কূট কৌশল। মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিবিদ,

বুদ্ধিজীবী, আমলা ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মগজ ধোলাই করে তারা মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামী জাগরণ ঠেকাতে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধের অথবা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই যথেষ্ঠ সফল হয়েছে। বেশ কিছু দেশে রাষ্ট্র শক্তির মাধ্যমে তারা ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ক্ষেত্রেও বড় রকমের সাফল্য অর্জন করেছে। ভবিষ্যতে যাতে আর কোথাও ইসলামী আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সে জন্যে তারা তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে বিশ্ব জনমত বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টাকে ব্যাপকতর করেছে।"[২০৭]

৫.২ মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা ঔপনিবেশিক শাসন আমলের চেয়েও করুণ এবং ভয়াবহ। ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রগতিবাদী ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিল। আজকের দিনে ষাটের অধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও প্যালেস্টাইনের নির্যাতিত মানুষের পক্ষে যুলুমবাজ সন্ত্রাসবাদী ইয়াহুদিদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্যের সুযোগ নেই। এমনকি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র সমূহেও জায়নবাদী, ইয়াহুদীবাদী গোষ্ঠীর খবরদারী ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিমদের স্বাধীন দেশে ইসলামের কথা বলতে, ইসলামের দাবী তুলতে অজানা অদৃশ্য শক্তির হাতের ইশারায় কৃত্রিম বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইয়াহুদী খ্রীষ্টান পরিচালিত এন. জি. ও.-দের অবাধ কার্যক্রমের সুযোগ দেয়া হলেও ইসলামী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে ন্যক্কারজনকভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত মুসলিম ধনী দেশগুলোর দানশীল ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত দানে পরিচালিত বদান্যতামূলক কাজের ওপরেও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার খবরদারী অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ইসলামী সংস্থাগুলো গরীব মুসলিম জনপদে মানবিক সাহায্য সহায়তা করতে গেলেও তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পশ্চিমাদের ভাষায় উগ্রপন্থী ধর্মীয় মৌলবাদের অবস্থান আবিষ্কারের জন্যে জঘন্যতম তথ্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। বানোয়াট তথ্যের ভিত্তিতে সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নির্লজ্জ ও নগ্ন হস্তক্ষেপ উদ্বেগ জনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার পরিণতি সুদূর প্রসারী হওয়ায় আজ প্রায় সর্বত্র মুসলিম জনপদ আতংকগ্রস্ত। এ পরিস্থিতিকে বলতে গেলে সকলেই উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে, সকলের মধ্যে এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছ। কিন্তু মুখ খুলে সত্য কথাটি প্রকাশ করার সাহস-হিম্মত খুব কম লোকেরই আছে। মুসলিম বিশ্বের প্রায় সবদেশে জ্ঞানপাপী একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী ছাড়া বাকি সকলেই এ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ লালন করছে। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তার প্রকাশও করছে। কিন্তু

২০৭. মতিউর রহমান, *মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য* (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২), পৃ. ৩২-৩৩

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার মত সৎসাহস তাদের আছে বলে মনে হয় না। বর্তমান বিশ্বের ঘোষিত আন্তর্জাতিক আবহাওয়া ও পরিমণ্ডল মুসলিম নেতৃত্ববৃন্দকে বিবেকের বিরুদ্ধে, উম্মাহর স্বার্থের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে ও বাধ্য করছে।

এ পরিস্থিতির ফলে একদিকে কিছু লোক আপোষকামিতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। ক্ষেত্র ভেদে কিছুলোক চরমপন্থা গ্রহণেও বাধ্য হচ্ছে। এ চরমপন্থা গ্রহণের পেছনেও ইসলামের চিহ্নিত দুশমনদের পরিকল্পনাই কার্যকর হচ্ছে। তাদের সৃষ্টি করা পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতিতে এক শ্রেণীর মানুষ চরমপন্থা বেছে নিতে বাধ্য হতে পারে এবং এটা হলে তাদের লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে এটা জেনে বুঝেই তারা এ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। এমতাবস্থায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর কিছু বান্দাকে এগিয়ে আসতে হবে। আপোষকামিতার শিকার হওয়াও চলবে না, চরমপন্থা ও অবলম্বন করা যাবে না। মধ্যম পন্থায়ই উত্তম পন্থা, ইসলামী পন্থা। দ্বিধা সংকোচ পরিহার করে আল কুর'আনে ঘোষিত মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে ইসলামের সঠিক দাওয়াত, নির্ভেজাল দাওয়াত, পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত উপস্থাপনের সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। আধুনিক বিশ্ব পরিস্থিতিকেই সামনে রেখে যৌক্তিক, বুদ্ধিভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তবতা ও অপরিহার্যতা তুলেধরার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালাতে হবে। সত্যের সাক্ষ্য বলতে যা বুঝায় তার সার্থক বাস্তবায়নে আল্লাহর একদল বান্দাকে নিরলস ভূমিকা পালন করতে হবে। মুসলিম উম্মাহর মৌলিক পরিচয় হলো, শেষ নবীর প্রতিনিধি হিসেবে তারা সকলেই দায়ীইলাল্লাহ। এ দায়ীইলাল্লাহর ভূমিকা পালনে সবাইকেই, বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে উদ্যোগী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এ দাওয়াতী তৎপরতাই ইসলামী শক্তির উৎস ও মুসলিম উম্মাহর উত্থানের পথ প্রশস্তকারী।

মতিউর রহমান বলেন, "মুসলিমগণের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও সুখকর নয়। বাইরের শক্তির সৃষ্ট পরিস্থিতির আকার আকৃতি ও প্রকৃতি থেকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আরো ভয়াবহ। মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে যারা রাষ্ট্র, প্রশাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে বিবেচিত তাদের মধ্যে রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, ইসলামী আদর্শের প্রতি আস্থাহীনতা এবং পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির অন্ধঅনুকরণ প্রবণতা। তাদের আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ ও ক্ষমতায় টিকে থাকা সহ বিভিন্নমুখী সুযোগ-সুবিধা ভোগের মানসিকতা মূলত ইসলামের চিহ্নিত দুশমনের ষড়যন্ত্র চক্রান্তের হাতকে এভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত করেছে। বিশেষ করে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বের মুসলিমগণের মনে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অব্যাহত প্রচেষ্টা এ পরিস্থতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। তার সাথে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে এক শ্রেণীর আলেমদের অযৌক্তিক মতপার্থক্য,

সংকীর্ণতা এবং কূপমণ্ডূকতা । এদের মধ্যে দ্বীনের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অপরিপক্কতা, ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র ও কৌশল অনুধাবনে ব্যর্থতা ইসলামের দুশমনদের হাতকে শক্তিশালী করে চলেছে। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সাথে বলতে হয়, অনুসন্ধানে জানা গেছে কখনোকখনো ক্ষুদ্র স্বার্থে এঁরা ইসলামের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিরোধী পক্ষের ক্রীড়নকের ভূমিকাও পালন করছে। উম্মাহর প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে এদের মধ্যে বাস্তব জ্ঞান বুদ্ধির যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ বিরোধী বিভিন্নমুখী তৎপরতা সম্পর্কে তাদের ন্যুনতম ধারণাও আছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠী স্বার্থের ব্যাপারে এরা এতটাই অন্ধ যে, জাতীয় স্বার্থ ও উম্মাহর স্বার্থ নস্যাৎ করতেও তাদের মধ্যে কোন দ্বিধাবোধ সৃষ্টি হয় না।"[২০৮]

দ্বীনের উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও কোন কোন মহলের একদেশদর্শিতা এবং ইসলামের মৌল শিক্ষার পরিপন্থী কার্যক্রম জনমনে বিভ্রান্তি, অনৈক্য ও নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে থাকে। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাছে অনেকের উপস্থাপনা বিরক্তি ও বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। ইসলাম বিরোধী বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বের হাতিয়ারকে শক্তি যোগায়। দ্বীনের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপের উপাদানও সরবরাহ করা হয়। মুসলিম উম্মাহর ওলামায়ে হক ও মোখলেছ দ্বীনদার ব্যক্তিদেরকে এ অবস্থার নিরসনে কার্যকর, সোচ্চার এবং বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। জনগণের মাঝে ইসলামের প্রতি আবেগ থাকলেও ইসলামের সঠিক ধারণা ও চেতনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ইসলামের সঠিক ধারণার অভাব সবচেয়ে বেশি। এমনকি এক শ্রেণীর ধর্মীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও সঠিক ধারণা সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়। এসব লোক ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত চতুর্মুখী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে। তাই বাইরের সৃষ্ট সমস্যার মোকাবিলার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ এ পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতিও আমাদের মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের মাঝে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত উপস্থাপন, ওলামায়ে কিরামের মধ্যকার মতপার্থক্যকে সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং সর্বস্তরের জনমনে ইসলামের সঠিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটানোর কার্যক্রম যুগপৎভাবে পরিপূর্ণ গুরুত্ব সহাকারে আঞ্জাম দিতে হবে। অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উন্নয়ন ছাড়া বাইরের শক্তির মোকাবেলা করা কখনো বাস্তবসম্মত হতে পারে না।

---

২০৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩

৫.৩ পরিস্থিতির গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম পরিচয় বহনকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৫০ কোটি। মুসলিমরা যেসব দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠএবং এ সুবাদে যেসব দেশ মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত তার সংখ্যাও ষাটের অধিক। এ ছাড়া পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশে ও মুসলিমদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত যেসব দেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তার অনেকগুলো দেশেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও চলামান বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলিমদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় মুসলিম দেশগুলো ঔপনিবেশিক শাসন আমলের চেয়েও দ্রুত খারাপ পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

অতি সম্প্রতি এবং নিকট অতীতের মধ্যপ্রাচ্য সংঘটিত ঘটনাসমূহ ভবিষ্যতে আরো ভয়াবহ পরিস্থিতির ইঙ্গিত বহন করছে।একটি তৈল সমৃদ্ধ সম্ভাবনায় আরব মুসলিম দেশ বিধর্মীদের সামরিক আগ্রাসনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। সেখানে আজ যা কিছু ঘটছে, তার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হলেও মুসলিম দেশ সমূহে এর তেমন কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন মুসলিম দেশই এ পরিস্থিতির মোকাবেলায় সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে এবং চলাকালে বিভিন্ন মুসলিম দেশে এ অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হলেও বর্তমানে তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। নিকট অতীতে ইরাকের কুয়েত আক্রমণকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বের যেসব গুরুত্বপূর্ণ দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভিযান পরিচালনার এবং নিজ সেনাবাহিনী রাখার সুযোগ গ্রহণ করে, তার সুদূর প্রসারী ভয়াবহ পরিণাম-পরিণতি মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিকে কোথায় নিয়ে যাবে তা অনুমান করা কঠিন।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে টু-ইন টাওয়ার ধ্বংসের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে সারা দুনিয়াব্যাপি মুসলিমদের বিড়ম্বনা ও হয়রানির পরিস্থিতি জন্ম দিয়েছে। এ ঘটনাটি অবশ্যই নিন্দনীয়। মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে এর নিন্দা করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত এ ঘটনার আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোন তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। অথচ এ ঘটনার সূত্র ধরেই আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন,লিবিয়া ও ইরাকের মুসলিম জনপদ ইতিহাসের জঘন্যতম যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এ পরিস্থিতি আর কত দূর গড়াবে, কোথায় গিয়ে এর শেষ হবে কেউ জানে না।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি বড় রকমের ভয়াবহ সংকটের মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। অথচ মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। হয়তো তারা এ বিষয়টি আদৌ উপলব্ধি করতে পারছেন না, নতুবা তারা ধরেই নিয়েছেন এ মুহূর্তে তাদের করার কিছুই নেই।

চলমান এ বিশ্বপরিস্থিতি শুধু মুসলিমগণের জন্যই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে বিষয়টিকে এতোটা সীমাবদ্ধভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। এর পরিণতিতে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সার্বিকভাবে বিপর্যস্ত হবে মানবতা, মনুষ্যত্ব। অতএব মানবতা মনুষ্যত্বের এ ক্রান্তিকালে উত্তরণের জন্য বিশ্ববিবেককে জেগে ওঠতে হবে। মতিউর রহমান বলেন, "বিশ্ব-বিবেককে জাগিয়ে তোলার জন্য বিবেকবান কিছু মানুষকে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এ অগ্রণী ভূমিকা পালনের মূল দায়িত্ব তাদের, যারা মুসলিম পরিচয় বহন করছে। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ইউরোপ আমেরিকার মত দেশে মানুষের জাগ্রত বিবেকের যৎকিঞ্চিত প্রকাশ ঘটলেও মুসলিম বিশ্বে এর কোন প্রকাশ এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়। অথচ জাতি হিসেবে বা উম্মাহ হিসেবে মানবতা ও মনুষত্যের এ দুর্দিনে মুসলিমদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের কথা। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল মুসলিম উম্মাহর মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহর ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সে দায়িত্ব পালনে অনীহা এবং ব্যর্থতাই মুসলিম উম্মাহর এ অসহায় অবস্থার জন্ম দিয়েছে। এটা শুধু মুসলিম উম্মাহর জন্যই নয় বরং গোটা মানব জাতির জন্য একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। এ পরিস্থিতি উত্তরণের স্বার্থে মুসলিম উম্মাহকে তার আত্মপরিচয় উপলব্ধি করতে হবে এবং সে সাথে উম্মাহ হিসেবে তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।"[২০৯]

৫.৪ পাশ্চাত্য নেতৃত্ব ও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর মুসলিমদের পর পাশ্চাত্যের সে সব জাতিগোষ্ঠী নিজেদের হাতে তুলে নেয় যাদের কাছে প্রথম থেকেই হিকমতে ইলাহীর কোন পুঁজি ও সহীহ-শুদ্ধ ইলম-এর কোন স্বচ্ছসুন্দর ঝর্ণাধারা ছিল না। নবুওয়্যাতের আলোক-শিখা সেখানে মূলত পৌছেই নি, পৌছতে পারেনি। হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষামালার আলোক-শিখা যা সেখানে পৌছেছিল তা বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যা-বিবৃতির অন্ধকার আবর্তে হারিয়ে যায়। তারা সে আসমানী আলোর শূন্য স্থান রোম ও গ্রীসের দফতরে রক্ষিত অন্ধকার দ্বারা পূরণ করে। ইন্দ্রিয় পূজা, আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরত্ব, ভোগ-বিলাসপ্রবণতা, স্বদেশ নিয়ে বাড়াবাড়ি, সীমাহীন ব্যক্তিস্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা গ্রীস থেকে এবং ঈমানী দুর্বলতা, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, শক্তি সম্পর্কে পবিত্রতার ধারণা ও সাম্রাজ্যবাদের প্রেতাত্মা রোম থেকে স্থানান্তরিত হয়। বৈরাগ্যবাদের পাগলামি বস্তুবাদের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গির্জাধিপতিদের ভোগ-বিলাস ও দুনিয়াদারী ধর্মাধিকারীদের প্রতি মানুষের অনাস্থা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে। সরকার ও গির্জার মধ্যকার টানাটানি ও টানাপোড়েন জাতীয় মেযাজের মধ্যে বিদ্রোহ ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে এবং ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে।

---

২০৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০-১১

অন্যদিকে জীবনের সঠিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মিশন ও বিশ্বজয়ী কোন পয়গাম না থাকায় আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়, পরিণত হয় জাতীয় বৃত্তি ও পেশায়। এ সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "জাতীয় জীবন স্থায়ী রাখবার জন্য অপর জাতির প্রতি ঘৃণা ও ভীতির আবেগ প্রকাশ পায় এবং একদিকে সমগ্র প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের মুকাবিলায় প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। অপরপক্ষে অভ্যন্তরীণ জাতীয়তার সীমারেখা গোটা পাশ্চাত্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেলাঘরে রূপ দেয় এবং এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীর মাঝে একটি সীমারেখা টেনে দেয়। এর বাইরে যে মানুষ থাকতে পারে তার কল্পনাও করা যেত না। সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র বিশ্বকেই দাস বিক্রির এক বাজার এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুনিয়াটাকে কামারের চুলা বানিয়ে দেয় যেখানে সব সময় আগুনের খেলা চলে, লোহা উত্তপ্ত করে ও পিটিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র বানানো হয়।"[২১০]

এসব ধর্মহীন জাতিগোষ্ঠীর রাজত্বকালে মানুষ সে ধর্মীয় অনুভূতি থেকেও মাহরূম হতে থাকে যা অপরাপর মানবীয় অনুভূতির সঙ্গে প্রাচ্যের হাজারো বছরের জীবনে অপরিহার্য প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লাহ প্রাপ্তির আকাঙ্খার সাধারণ রুচির স্থলে জাগতিক কামনার ব্যাধি বাসা বাঁধে। আচার-ব্যবহার, মৌলিক ও সত্যিকার মানবিক গুনাবলী ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে বিরাট রকমের অধঃপতন দেখা দেয়। মোটকথা, লোহা-লক্কড় ও ধাতব পদার্থের সর্বপ্রকার উন্নতি ঘটে আর মনুষ্যত্বের ঘটে সার্বিক অধঃপতন।

৫.৫ বিশ্বব্যাপী জাহিলিয়াত

এ সময় এমন কোন শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায় কিংবা দল সাধারণ মানুষের সামনে নেই যে, এ সব পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে আকীদাগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত মতপার্থক্য পোষণ করে এবং তাদের জাহিলী দর্শন ও বস্তুবাদী জীবন-ব্যবস্থার বিরোধী। এমন জাতি, সম্প্রদায় কিংবা দল এ মুহূর্তে না ইউরোপে আছে আর না আছে এশিয়া কিংবা আফ্রিকায়। ইউরোপের জার্মান হোক কিংবা এশিয়া মহাদেশের কোন জাপানী অথবা ভারতীয় অধিবাসী, সকলেই এ জাহেলী দর্শন ও এ বস্তুবাদী জীবন-ব্যবস্থার সমর্থক ও ভক্ত বিশ্বাসী। আর তা না হলেও বিশ্বাসী সমর্থকে পরিণত হতে যাচ্ছে। থাকলো সে সব রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ যা এ মুহূর্তে বিভিন্ন দর্শন কিংবা যুদ্ধের আকারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা শুধুই এ নিয়ে যে, এ বস্তুপূজার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে?

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "এক জাতির পৌরুষ ও জাতীয় মর্যাদাবোধ এটা সইতে রাজী নয়, অন্য জাতি দীর্ঘকাল ধরে দুনিয়ার বুকে নেতৃত্বের আসনে

---

২১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫

অধিষ্ঠিত থাকবে, জীবন-সমস্যা ও সমূহ কল্যাণ থেকে ফায়দা লুটবে এবং বিশ্বের বাজার ও নয়া নয়া ঔপনিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসবে, অথচ শক্তি-সামর্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি ও যোগ্যতার দিক দিয়ে সে কারোর পেছনে নয় কিংবা কারোর চেয়ে কম নয়। থাকলো এ যে, সে স্বয়ং অপর কোন মনযিলের দিকে অগ্রসর হতে এবং অন্য জাতিগোষ্ঠী গুলোকে নিয়ে যেতে চায়, পৃথিবীর বুকে ন্যায়নীতি, শান্তি ও ইনসাফ কায়েম করতে চায় এবং দুনিয়ার গতিমুখ ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদিতার দিক থেকে ঘুরিয়ে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিকে, চরিত্রহীনতা থেকে আখলাক-চরিত্রের দিকে এবং নফস-পরস্তী ও শয়তান পূজার দিক থেকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর দিকে পাল্টে দিতে চায়। তা এ গরীব এর দাবিদার যেমন নয়, তেমনি কখনো এর আকাঙ্ক্ষীও নয়।"[২১১]

৫.৬ মুসলিমগণ জাহিলিয়াতের মিত্র

জাহিলিয়াতের প্রাচীন ও বংশগতসূত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমগণ এ যুগে দুনিয়ার অনেক প্রান্তেই জাহিলিয়াতের মিত্রে পরিণত হয়েছে। তারা নিজেদের বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছে এবং দুনিয়ার কোন কোন অংশে তারা ঐ সব পাশ্চাত্য জাহিলী জাতিগোষ্ঠীর নিমিত্ত স্বেচ্ছা প্রণোদিত খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং দিচ্ছে। জাহিলিয়াতের এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কী হতে পারে যে, কোন কোন মুসলিম জাতি ও সাম্রাজ্য এবং কতকগুলো মুসলিম দল ঐ সব জাতিগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যকে নিজেদের সাহায্যকারী, সমর্থক ও অভিভাবক এবং সত্য, ন্যায় ও ইনসাফের পতাকাবাহী মনে করতে শুরু করেছে, যারা এ যুগে জাহিলী আন্দোলনের নিশান বরদার এবং যারা জাহিলিয়াতের মরা লাশে জীবনের নতুন প্রাণ স্পন্দনের সঞ্চার করেছে। সাধারণ মুসলিমগণ দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের ধারণাই পরিত্যাগ করেছে এবং মুসলিম জনতার নেতা হবার পরিবর্তে জাহিলিয়াতের কাফেলার সর্দার হবার ধারণাতেই তুষ্ট এবং এতেই তারা গর্ব অনুভব করছে।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "সাধারণ মুসলিমগণের মধ্যে পাশ্চাত্যের মধ্যে পাশ্চাত্যের জাহিলী নীতি-নৈতিকতা ও আচার-আচরণ এভাবে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে যেভাবে গাছের শিরা-উপশিরার মধ্যে পানি ও তারের মধ্যে বিদ্যুৎ দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ তার পরিপূর্ণ শান-শওকতের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার অন্ধ আনুগত্য জীবনের এমন এক পিপাসা যা মেটার নয় এবং এমন এক ক্ষুধা যা দূর হবার নয়, সৃষ্টি হতে চলেছে এমন এক জাতির মধ্যে যার কাছে পারলৌকিক জীবনই আসল জীবন। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার প্রভাবে পরকালের ধারণা প্রতিদিনই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে চলছে এবং ইহলৌকিক

২১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬

জীবনের গুরুত্ব ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্মান, গৌরব, গর্ব, অহংকার ও উচ্চ মর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতায়, সমুন্নতি ও নেতৃত্ব লাভের প্রয়াসে উৎসাহী ও প্রগতিশীল মুসলিমরা ইউরোপের উন্নত লোকদের পদাংঙ্ক অনুসারী। নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রের ওপর স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তাকে প্রাধান্য দেবার ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে এবং বস্তুপূজারী জাতিগুলোর অনুসরণে বাহ্যিক ও ফাঁকা প্রদর্শনীর বাতিক বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের গোলামী, শক্তি ও সম্পদের সামনে মস্তকাবনতি ও শাহপরস্তীর ক্ষেত্রে কোথাও এ তৌহীদবাদী ও মুজাহিদ উম্মাহকে অংশীবাদী কাফের মুশরিক ও দাসসুলভ মনেবৃত্তিসম্পন্ন জাতিগুলো থেকে খুব বেশি আলাদা হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় না।"[২১২]

৫.৭ দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতিবন্ধকতা

ইসলাম যে একটি মিশনারী ধর্ম-একথা কারও অজানা নয়। দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে। নিঃস্বার্থ ধর্ম প্রচারক, আমানতদার ব্যবসায়ী ও সত্যনিষ্ঠ সুফী-দরবেশের তাবলীগের বরকতে বহু মানুষ ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন। একমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে এমন নতুন অতিথি এসেছেন, যারা পরবর্তীতে নিজেদের সৃষ্টিশীল মেধা ও অসাধারণ যোগ্যতার বলে মুসলিম বিশ্বের নযীরবিহীন ভূমিকা পালন করতে সমর্থ্য হন।

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক অমুসলিম স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এর কারণ হচ্ছে যুক্তি নির্ভর শিক্ষা, তাওহাদীবাদী চেতনা, সামাজিক ন্যয়বিচার ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শের ফলে ইসলাম অপরাপর ধর্মের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতা ও বর্ণপ্রথার আদৌ কোন স্থান নেই। পবিত্র কুর'আন, সীরাতে রাসূল এবং ইসলামের শিক্ষা গণমানুষের অন্তর ও বিবেককে জয় করে নিয়েছে। পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি যদি এভাবে চলতে থাকতো, তাহলে সম্ভবত পুরো বিশ্বে ইসলাম বৃহত্তর ধর্মীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতো। পরবর্তীতে অসহিষ্ণুতা ও অনাস্থার এ অনুভূতি ইসলামের দওয়াত ও তাবলীগের পথে বিরাট এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে দিল।"[২১৩]

---

২১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৯

২১৩. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০১৫), পৃ. ১৪২

৫.৮ সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জ

নব্য সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এটি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ বা আগ্রাসন যা আফগানিস্তান ও ইরাকে দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক আইনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অধিকার ছিল না আফগানিস্তান আক্রমণ করার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দেশ যারা কোনো প্রকার আন্তর্জাতিক আইন মানে না। তারা ইরাক দখল করে নিয়েছে। তারা চাচ্ছে রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে বিশ্বকে শাসন করতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় তাদের আদেশ নিষেধকেই মেনে চলতে হবে, তাদের ইচ্ছামতো চলতে হবে। বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ কিংবা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-এর মাধ্যমেও তারা সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে নিবিড় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নব্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কৌশলের ফলশ্রুতিতে মুসলিম বিশ্ব ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে।

৫.৯ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ

মুসলিম বিশ্ব নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের কবলে পতিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের চটকদার স্লোগানের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যাতে সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক দাসে পরিণত হয় তার সবরকম কৌশল উদ্ভাবন করেছে সাম্রাজ্যাবাদী শক্তি। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্যিক সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এমনকি জাতিসঙ্ঘ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশকে উন্নয়নের নির্ভরশীল তত্ত্বে এর অনুসারীতে পরিণত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এম এ সাঈদ বলেন,"মুসলিম বিশ্ব গোটা বিশ্বের ষাট শতাংশ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের কারণে শক্তিশালী করতে পারেনি। বিশ্বের মজুদ তেলের ৭৫%, গ্যাসের ৩৩% ফসফেটের ৭৫ % টিনের ৬০ % এবং ম্যাংগানিজের ৩৫% এর মালিক হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্ব আজও পশ্চাৎপদ। পাশ্চাত্যের তথা উন্নত বিশ্বের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সঞ্চিত মূলধন। মুসলমানগণের অর্থেই পশ্চিমারা আজ লাভবান হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদীরাই নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে। গ্লোবালাইজেশন শ্লোগান মাত্র। মূল কথা হচ্ছে, শক্তিশালী পাশ্চাত্যের পণ্য বিক্রি করা। ফ্রি ট্রেডের কথা বলে তারা এটি করছে, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ পাশ্চাত্যের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করে কাজ করছে। এদের ষড়যন্ত্রেই মুসলিম বিশ্ব অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সচ্ছলতা ও উন্নতির ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি।"[২১৪]

২১৪. এম এ সাঈদ, *আত তারীখুল ইসলামী ওয়া তারীখু ইলমিল হাদীস* (ঢাকা: আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স, ২০১৪), পৃ. ১৯৯

৫.১০ বুদ্ধিভিত্তিক চ্যালেঞ্জ

বুদ্ধিভিত্তিক চ্যালেঞ্জ মুসলিম বিশ্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বুদ্ধিভিত্তিকভাবে পাশ্চাত্য ইসলামকে সন্ত্রাসী বলে গ্রাস করার চেষ্টা করছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনের ওয়াল্ড ট্রেট সেন্টার, টুইন টাওয়ার ও নিউইয়র্কের পেন্টাগনে ভয়াবহ বিমান হামালার ঘটনায় কোনো কিছু প্রমাণ না হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যে মুসলিমগণ আক্রমণের শিকার। এখনো কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেনি আসলে কে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ঘটিয়েছে। মার্কিন সরকার একটি ফরমাল জুডিশিয়াল তদন্ত পর্যন্ত এখনো করেনি। বিচার বিভাগীয় কোনো কমিশন করেনি। তদন্ত না করে, কোর্টে প্রমাণ না করে মুসলিমগণের দায়ী করা হচ্ছে। টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদ ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে আক্রমণ করার একটি হাতিয়ার মাত্র। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদের পোশাকে ইসলাম ও মুসলিমগণের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে।

৫.১১ সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলিম বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে লক্ষণীয় হচ্ছে ফ্রান্সের মতো একটি দেশ আইন করে হিজাব নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এটি প্রমাণ করে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কোন পর্যায়ে যেতে পারে। তারা শালীনতাকে সহ্য করতে পারে না। তারা নগ্নতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের সংগ্রাম শালীনতার বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক সাংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলেই মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে হু হু করে বিদেশী অর্থে প্রতিপালিত বিশেষ গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিরাট অংশ বিদেশী স্কলারশিপ, পদক, খেতাব, পুরস্কার এবং নগদ অর্থপ্রাপ্তির লোভে লালায়িত হয়ে আত্মবিক্রয় করে বিদেশের গোলামে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে অবস্থান করে আগ্রাসী শক্তির স্বার্থে তারা নিজেদের মেধা নিয়োজিত করে রেখেছে, কেননা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি যুদ্ধ, যা মুসলিম দেশ সমূহের নতুন প্রজন্মের ইসলামী চেতনা বিশ্বাসে চরম আঘাত হানছে।

৫.১২ সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদের চ্যালেঞ্জ

আজ ইসলামী উম্মাহর প্রধানতম বাস্তব চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদিবাদ চক্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এ চক্র মুসলিম বিশ্বকে পদানত করে রাখার, দুর্বল করে রাখার, দমিয়ে রাখার যাবতীয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে। তারা যেকোন মূল্যে ইসলাম ও মুসলিম উত্থানকে রুখতে চায়। তাদের এ পদক্ষেপে তারা এতো বেশি উন্মুক্ত হয়ে আছে যে, সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে ইসলামকে ঠেকানোর প্রশ্ন জড়িত। সেখানে

তাদের বিঘোষিত তথাকথিত গণতন্ত্র, মানবাধিকার কোন কিছুই জলাঞ্জলি দিতে পরোয়া করছে না। বসনিয়া, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, মিসর ইত্যাদি ঘটনাএর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৫.১৩ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমা জগতের কর্তৃত্ব

এক সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিমগণের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তীতে মুসলিমগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অমনযোগিতা ও পতন অন্যদিকে ইউরোপে জাগরণের সূত্র ধরে পশ্চিমা জগত মুসলমানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানের সূচনা করে। তারা বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি লাভ করেছে। গোটা দুনিয়া আজ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। এম এ সাঈদ বলেন, "বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিএ সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্ব এদিক থেকে ভীষণভাবে পিছিয়ে রয়েছে।"[২১৫]

৫.১৪ প্রচার মিডিয়ার ওপর পশ্চিমা কর্তৃত্বের চ্যালেঞ্জ

বিশ্বব্যাপী প্রচার মিডিয়ার ওপর কর্তৃত্বস্থাপনের মাধ্যমে পশ্চিমা জগত তথ্য ও মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদের এক ব্যাপক জাল বিস্তার করেছে। এরা তথ্য বিকৃতি ও তথ্য প্রচারে কাজ করেছে সুকৌশলে। এরা চালাচ্ছে নানা কায়দায় ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা। এরা নগ্নতা, অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফী মানবজাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার ঘৃণ্য কাজটি করে যাচ্ছে। এরা নিয়ন্ত্রণ করেছে দুনিয়ার সবকটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ও টিভি নেটওয়ার্ক। ফলে তাদের উৎস থেকে মুসলিম বিশ্বকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে সংবাদ ও তথ্য। তাদের দেয়া তথ্য ও প্রচারণার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ। এ সম্পর্কে এম এ সাঈদ বলেন," সাম্রাজ্যবাদীরা দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিম উম্মাহকে তথাকথিত মৌলবাদ টেররিস্ট বলে প্রচার চালিয়ে ইসলাম সম্পর্কে এক ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির ব্যাপক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও জাগরণকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করে এরা বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার কৌশল গ্রহণ করছে।"[২১৬]

৫.১৫ অশ্লীল শিল্পকলার প্রসার

এম এ সাঈদ বলেন, "পৃথিবীতে আগেও অশ্লীলতা ছিল। কিন্তু অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফী আজকের মতো কখনো গণরূপ পায়নি। অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফিকে আজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ

---

২১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০
২১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১

শিল্পকলা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কাব্য সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প চারুকলা প্রতিটি শিল্পকর্মের মাধ্যমে জীবনবিমুখ বস্তুবাদী, ভোগাবাদী পর্ণোগ্রাফী দর্শনের প্রসার ঘটানো হচ্ছে। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সিনেমা ও টিভি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এসব ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে যুব চরিত্র, বাড়ছে মাদকাশক্তি, ছড়াচ্ছে মরণঘাতি রোগ। ধর্ম বিমুখবিকৃত লেখকরা আর্টের নামে ধ্বংস করে দিচ্ছে সমাজকে, মানবতাকে। আর এসবকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমে। এসব হচ্ছে সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের পথে তীব্র বাধা। বর্তমান যুগে অশ্লীল শিল্পকলার প্রসার মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে।"[২১৭]

৫.১৬ বিশ্বব্যাপী বাজার দখল ও পুঁজিবাদের আধিপত্য বিস্তার

মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী চক্র সব সময়ই মুসলিম বিশ্বের বাজার দখলের চেষ্টা চালিয়েছে। কমিউনিজমের পতনের পর এ প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয়েছে। এখন চলছে বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। তারা ইতোমধ্যেই মুসলিম বিশ্বের বিরাট বাজার দখল করে নিয়েছে। মুসলিম বিশ্ব আজ সামান্য পণ্যের জন্য ও তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে। অধিকন্তু পুঁজিবাদের বিপুল শক্তি ও উপকরণ ব্যয় হচ্ছে ইসলামের উত্থান ঠেকাবার জন্য।

৫.১৭ শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা

বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি প্রকট সমস্যা, মুসলিম বিশ্বকে ইসলামের আলোকে উন্নত ধরনের যুগোপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, কেননা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামের প্রয়োজন পূরণ করছে না, এজন্য তা সংস্কার করতে হবে, আলেমদেরকে এ ব্যাপারে ইসলামের কথা,দেশের কথা চিন্তা করে সংস্কারের কাজে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে হবে।

৫.১৮ চরমপন্থার সমস্যা

মুসলিম বিশ্বের পরবর্তী সমস্যা হলো চরমপন্থার সমস্যা। কেননা চরমপন্থা ইসলামের পথ নয়, ইসলাম মধ্যম পন্থায় বিশ্বাসী, অতীতকালে মুসলিমগণের মধ্যে খারেজীদের উদ্ভব হয়েছিল, তারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক চরমপন্থী ছিল,এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও চরমপন্থী ছিল। তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে চরমপন্থা অবলম্বন করে, মুসলিমগণকে এ ধরনের চরমপন্থা থেকে রক্ষা করতে হবে, মুসলিম উম্মতের জন্য কল্যাণ হচ্ছে চরমপন্থা পরিহার করা।

---

২১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১

৫.১৯ অপব্যাখ্যার সমস্যা

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সামনে আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো অপব্যাখ্যার সমস্যা। এখন কুর'আন ও হাদিসের অসংখ্য অনুবাদ বেরিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে যারা অনুবাদ পড়েন তাদের মনে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নানান প্রশ্ন জাগছে, তাতে তারা নিজেরাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। অথচ সমস্যা হচ্ছে, ব্যাখ্যা করার যে মূলনীতি এবং বিধান সেসব তারা জানে না। এজন্য দরকার ফিকহ, উসূলুল ফিকহ জানা। এজন্য উসূলুল ফিকহ এর সহজবোধ্য বইও প্রকাশ করতে হবে।

৫.২০ গণতন্ত্রের অভাব

মুসলিম বিশ্বের আরেকটি মূল সমস্যা হচ্ছে গণতন্ত্রের অভাব। স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সামরিক শাসন মুসলিম বিশ্বে এখনো বলবৎ আছে। এটি পাশ্চাত্যের কাছে মুসলিমগণের খারাপ ইমেজই তুলে ধরে। মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্র নিয়ে যে বিতর্ক তা দূর করতে হবে। ইসলামে প্রকৃতপক্ষে কোনো রাজতন্ত্র নেই। বিশ্বের প্রায় সকল ইসলামী দল গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে। তারা নির্বাচনকে ক্ষমতা পরিবর্তনের বৈধ পথ বলে মনে করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী দলগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হচ্ছে অনেকটা ইসলামী খেলাফতের পদ্ধতির মতো।

৫.২১ নারীকে ভোগপণ্য হিসেবে উপস্থাপন ও নারীর ক্ষমতায়ন

জাহেলিয়াতের যুগে নারীদেরকে নিছক ভোগ্যপণ্য হিসেবে গণ্য করা হতো। ইসলামে নারীকে সম্মানার্থে মায়ের জাতি হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। ইসলামের শাশ্বত এ রীতিকে বাতিল করার লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমসমূহে নারীকে অর্ধনগ্ন আকারে উপস্থাপন করে আকর্ষণীয় ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা হয়। এভাবে সমাজে যৌনাচার ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুসলিম নারীর সম্ভ্রম ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় হিজাব। বর্তমানে এসে পশ্চিমারা ইসলামী সংস্কৃতির এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির বিরুদ্ধে নানামুখী প্রচারণা চালায়। তারা একে প্রগতির অন্তরায়, সন্ত্রাসীর মুখোশ ইত্যাদি অপপ্রচার চালিয়ে মুসলিম নারীকে পর্দা থেকে বাইরে আনতে চায়। একই সাথে নারী পুরুষের সহশিক্ষায় উৎসাহিত করে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয় পশ্চিমারা। পশ্চিমাদের আগ্রাসনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হলো নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক শ্লোগান। এ শ্লোগানের মাধ্যমে তারা মুসলিম সমাজের পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়। মায়ের জাতিকে ঠেলে দেয় মাঠে ময়াদানে রাজনীতিতে। ভোগপণ্য হিসেবে নারীকে কত ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রদর্শন করে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন করা যায় তার মহড়া চলছে।

৫.২২ অশ্লীল আকাশ সংস্কৃতির বিস্তার

মুসলিম জাতিসত্তা এবং এর শাশ্বত সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ইহুদি, খ্রিষ্টানরা। এর অংশ হিসেবে আকাশ সংস্কৃতির নামে ভোগ্যবাদী পৌত্তলিক ও নগ্ন বিজাতীয় সংস্কৃতিকে কৌশলে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। 'সংস্কৃতির উল্টো ছাতা' নামে খ্যাত ডিশ অ্যান্টিনার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে যৌনোদ্দীপক সিনেমা, নাটক, নাচ-গান, মডেলিং, সুন্দরী প্রতিযোগীতা, নগ্নতা, বেহায়পনা ইত্যাদির বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। এভাবে ইসলামী তাহযীব তমদ্দুনের মূলোৎপাটন ঘটিয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো হচ্ছে।

৫.২৩ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ভাস্কর্য সংস্কৃতির বিস্তার

পশ্চিমাদের প্রভাবে মুসলিম বিশ্বেও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটছে। খেলার মাঠে স্থায়ী প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। বিভিন্ন স্থাপনা, মিনার, ঐতিহাসিক স্থানে শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন ইত্যাদি নামে যেসব প্রদীপ বেদী স্থাপিত হচ্ছে তা মূলত অগ্নি উপাসক গ্রীক ও হিন্দু সংস্কৃতিরই অংশ। শিরকী এ সংস্কৃতির বিস্তারের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের জনগণের মৌলিক বিশ্বাসে চির ধরানো হচ্ছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে পশ্চিমা অনৈসলামিক সংস্কৃতির আগ্রাসনের আরেকটি দিক হলো ভাস্কর্য ও মূর্তি স্থাপন। সংশ্লিষ্ট দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের মূর্তি তৈরী করে দেশের বিভিন্ন স্থান, ঐতিহাসিক জায়গা, মিনার, সড়ক, দ্বীপ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়। এভাবে দেশব্যাপী মূর্তির বিস্তার ঘটিয়ে দেশবাসীকে মূর্তিপূজারী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুসারীরা।

৫.২৪ সৌন্দর্যের বাণিজ্যিক প্রদর্শনী

সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে পশ্চিমারা মিস ওয়ার্ল্ড, মিস ইউনিভার্স, মিস এশিয়া মিস আমেরিকা,প্যাসিফিক ইত্যাদি নির্বাচন করে নির্বাচিতদেরকে পুরস্কৃত করে থাকে। এর নির্বাচন পদ্ধতি এমন, যেখানে নিরাবরণ নারীদেহের প্রদর্শনী হয়। বিচারকরা তদের দেহের উন্নততর গঠন ও আনুষঙ্গিক প্রকাশ ভঙ্গিমার জন্য পুরস্কৃত করে থাকে। এর ফলে নারীদেরকে বাণিজ্যিকভাবে ভোগপন্য রূপান্তরের মাধ্যমে ব্যভিচারের বিশ্বায়ন করা হচ্ছে। পশ্চিমা সংস্কৃতির এহেন উলঙ্গ প্রকাশ মুসলিম বিশ্বেও গভীর ভাবে প্রভাব ফেলেছে। অনেক মুসলিম দেশের মুসলিম মেয়েরা এতে অংশগ্রহণ করে। আবার অনেক মুসলিম রাষ্ট্র এর আয়োজকদের ভূমিকা পালন করে ইসলামের শালীনতার শাশ্বত বিধানকে ভূলুণ্ঠিত করতে দ্বিধা করছে না।

৫.২৫ ফ্যাশন শো সংস্কৃতি

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে পোশাক প্রদর্শনীর নামে নারী পুরুষ বিভিন্ন অশালীন পোশাকে সজ্জিত হয়ে দর্শকদের সামনে অঙ্গভঙ্গিমা প্রদর্শন করে। সুসজ্জিত মডেল তরুণীদের ক্যাট ওয়াক আর দর্শনীয় ভঙ্গিমায় দেহের প্রদর্শন দর্শকদের মাঝে উন্মত্ততা সৃষ্টি করে। মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা সমাজের এসব বেহায়াপনার ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। এর ফলে মুসলিম সমাজে অবাধ যৌনাচার, গার্লফ্রেন্ড কালচার, লিভ টুগেদার ও সমকামিতার মত ভয়াবহ ক্ষত মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিমগণের তথাকথিত সভ্যকরণের প্রক্রিয়ায় পশ্চিমা মিডিয়া মুসলিমদের সমাজে এসব অনৈতিক সম্পর্কের বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

৫.২৬ বিজ্ঞাপন সংস্কৃতি

বিজ্ঞাপন পণ্য বাজারজাতকরণের একটি মাধ্যম হলেও মুসলিম তাহযীব তমুদ্দন ধ্বংসে এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। প্রায় সকল পণ্যের বিজ্ঞাপনে অপরিহার্যভাবে ব্যবহার হয় মডেল তরুণীরা। এ ব্যাপারটি বর্তমানে প্রায় বিনা চ্যালেঞ্জে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের মিডিয়াতেও ঢুকে পড়েছে। এর মাধ্যমে তরুণী নারীদেরকে আকর্ষণীয় ভোগ্যপণ্য হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়। এভাবে মুসলিম নারীর হিজাব রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। পর্দাহীনতা, অবাধ যৌনাচার, নারী পুরুষের স্বাধীন মেলামেশা ইত্যাকার অনৈসলামিক রীতির বিস্তার মূলত নারী বিজ্ঞাপন সংস্কৃতির বিস্তারেরই ফল।

৫.২৭ পারিবারিক বন্ধন ছিন্নকরণ

পশ্চিমা সামাজিক প্রথার প্রভাবে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে পারিবারিক প্রথায় ভাঙ্গন সৃষ্টি হচ্ছে। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে। মুসলিম পারিবারিক বন্ধনের ঐতিহ্যকে ভূলুণ্ঠিত করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও পশ্চিমা ধাঁচে গড়ে ওঠছে বৃদ্ধাশ্রম। এর ফলে বার্ধক্যকবলিত পিতা মাতাকে সেবা যত্ন করার আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে তাদেরকে নির্মমভাবে পরিবার ও সমাজচ্যুত করা হয়।

৫.২৮ পশ্চিমা গণতন্ত্রের বিকাশ

একবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শক্তি মুসলিম বিশ্বে তাদের স্বার্থানুকূল গণতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় অব্যাহতভাবে প্রচার প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। কোন মুসলিম দেশে তাদের পক্ষের ধর্মনিরপেক্ষ বা ইসলামবিরোধী সেক্যুলার দল নির্বাচিত হলে তাদেরকে সহায়তা করে পশ্চিমা শক্তি। কিন্তু তাদের স্বার্থের বিপরীতে কোন ইসলামী দল নির্বাচনে নির্বাচিত হলে তাদেরকে পতন ঘটানোর সবরকমের ষড়যন্ত্র ও প্রচার প্রপাগান্ডা চালায় এবং ইসলামপন্থী সরকারের পতন ঘটায় আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শক্তি। নিকট

অতীতে আলজেরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই এ নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া করে দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে তারা। এর ফলে গোটা বিশ্বকে এমন এক পল্লীতে রূপান্তর করার চেষ্টা করছে যার নেতৃত্ব রয়েছে মার্কিনীদের হাতে আর কর্তৃত্বে রয়েছে ইহুদিরা।

৫.২৯ বিভিন্ন দিবস পালন

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহে বিভিন্ন দিবস পালনের রেওয়াজ চালু হয়েছে। যেমন-বিশ্ব ভালবাসা দিবস, এপ্রিল ফুল ইত্যাদি। এমনিভাবে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আরোপিত বিভিন্ন দিবস পালিত হয়। এসব দিবস পালনের মাধ্যমে মুসলিমদের আকিদা ও আমলগতভাবে বিভ্রান্ত করা হয়। সামজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। বেহায়পনা, যৌনাচার বৃদ্ধি পায়।

৫.৩০ জাতিসংস্থা ও বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার ভূমিকা

জাতিসংঘ, এর বিভিন্ন শাখা, ইউরোপীয় ও আমেরিকার বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা এমনকি ইসরাইলী সংস্থা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানামুখী সাহায্য ও উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতা চালায়। নারী উন্নয়ন, শিক্ষা কর্মসূচী, সামাজিক নিরাপত্তা জাল তথা এনজিও ইত্যাদির নামে মুসলিমদের শিক্ষা, সামাজিক ঐতিহ্য, হিজাব প্রথা, মৌলিক বিশ্বাস প্রভৃতি ধ্বংস সাধনে ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা তাদের আরোপিত শর্তাবলী দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং সরকারকে তাদের তাবেদারে পরিণত করে।

৫.৩১ মুসলিমগণের আত্মমূল্যায়ন

ইবনে খালদুন 'আল মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে 'উমরান' তত্ত্বে দেখিয়েছেন, সমাজ তার নিজস্ব গতিতে বিকশিত হবে। প্রযুক্তি নির্ভর আজকের বিশ্ব সে বিকশিত সমাজেরই স্বরূপ। কিন্তু মুসলিম মনীষী বিশেষত বর্তমান নেতৃত্ব বিকাশমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়েছে। ফলে পশ্চিমা বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক বিবর্তন, সকল ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে। মুসলিম বিশ্ব তাদের সর্বমুখী আগ্রাসনের শিকার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের কারণ

ইসলামকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ অবর্ণনীয় কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। একপর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মাধ্যমে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে মুসলিমগণ এসে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে নিজেদেরকে দূরে ঠেলে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে দ্বীন সম্পর্কে যথার্থ ও মৌলিক ইসলামি জ্ঞানের অভাব বৃদ্ধি পায়। দ্বীনি ইলমের স্বল্পতা, দ্বীনের বিধি-বিধানের রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থতা এবং তার উদ্দেশ্য ও চেতনা অনুধাবনে অপরাগতাই তাদেরকে চরম্পন্থার জন্ম দেয়। এভাবে শরিয়তের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য না বুঝে মুসলিমরা ইচ্ছামতো বিভিন্ন অভিমত গ্রহণ করে। যার ফলে নিজেদের মধ্যে বিপর্যয়ের সূচনা শুরু হয়। মুসলিম উম্মাহ্‌র মাঝে অধঃপতনের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ ছিল নতুন নতুন পরিস্থিতিতে ইজতিহাদ করার প্রক্রিয়া তখন সমাজে প্রচলিত ছিল না। ফলে সমস্যার সমাধান ও ইসলামের মূল বিশ্বাসের মাঝে কোনও যোগসূত্র ছিল না। এক পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহ্‌ ইসলামকে কেন জীবনাদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছে তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা থেকে দূরে সরে যায়। নিচে মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের সূচনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

৬.১ বিশ্বব্যাপী ইসলামের জাগরণকে স্তব্ধ করে দেয়ার নানামুখী ষড়যন্ত্র ও মুসলিম বিশ্বের অজ্ঞতা

অস্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামের জাগরণ আসেনি। ইসলামের সৌন্দর্য ও দ্বীনের সুমহান প্রচারকগণের মানবিক আচরণের প্রতি মুগ্ধ হয়ে অমুসলিম বিশ্বে মানুষ আজো দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। মুসলিমদের শান্তিপূর্ণ দাওয়াতের ফলে সমকালীন বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান ইউরোপ মহাদেশে যে হারে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ইসলামের জাগরণ হচ্ছে, এতে ইসলাম বিদ্বেষীরা রীতিমত শঙ্কিত। সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপে ইসলামের জাগরণ সম্পর্কিত কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরা হলো:

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত টাইমস সাময়িকীর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, "ইউরোপে নতুন মুসলিম ও নতুন মসজিদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলছে। এসব মসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত আযানের সুমধুর ধ্বনি ভেসে আসছে। রোমে তিনকোটি ডলার ব্যয়ে সুরম্য একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের জন্য জমি বরাদ্দ করেছে সে দেশের সরকার। ফ্রান্সে মসজিদের সংখ্যা প্রায় এক হাজারটি। অথচ ১৯৭০ সালে সেখানে মাত্র ডজন খানেক মসজিদ ছিলো। টাইমস সাময়িকীর রিপোর্ট অনুযায়ী ইউরোপে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায়

সত্তর লাখ। ব্রিটেনে প্রায় একশ-এর মতো পাবলিক স্কুলে শিশুদের সিলেবাসে ইসলামিয়াত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিম জার্মানিতে পশ্চিমা ধাঁচে পরিচালিত স্কুলগুলোতেও এক তৃতীয়াংশ মুসলিম শিশু লেখাপড়া করছে। বর্তমানে ওলামায়ে কেরাম ও তাবলীগের প্রতিনিধি দল ব্যাপকভাবে ইউরোপে সফর করছেন। মুসলিমগণও তাঁদের সভা সমাবেশে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করছেন। কুর'আন পড়ার প্রবণতা আগের চেয়ে বহুগুণে বেড়ে গেছে। অন্য এক তথ্য থেকে জানা যায়, ইউরোপে প্রায় ২.৫ কোটি মুসলিম বাস করছে। এদের মধ্যে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ রাশিয়ায়, পঁচিশ লক্ষ পশ্চিম ইউরোপের অন্য দেশগুলোতে এবং প্রায় ৭০ লক্ষ পশ্চিম ইউরোপে বাস করেন। এভাবে ইউরোপে ইসলাম আজ দ্বিতীয় ধর্ম। এর মধ্যে ইংল্যান্ডে ৭০ লক্ষ, ফ্রান্সে ৫০ লক্ষ এবং চল্লিশ লক্ষেরও অধিক মুসলিম জার্মানিতে বাস করছেন। জার্মানিতে মুসলিমগণের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এতে আগামী বিশ বছরে জার্মানিতে মুসলিম জনসংখ্যা সকল ধর্মালম্বীকে ছাড়িয়ে যাবে বলে জার্মান চ্যান্সেলর মার্কেল মন্তব্য করেছেন। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ব্রিটেনে মসজিদের সংখ্যা হচ্ছে ৬০০ এর ওপর এবং সেখানে ৪০০ এর মতো ইসলামি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। ১৯৬৩ সালে ব্রিটেনে মাত্র তিনটি মসজিদ ছিলো। আর এসব মসজিদে শুধু ফজর, মাগরিব ও এশার জামা'আত হতো। তখন ব্রিটেনে জুম'আর নামাজের প্রচলন ছিল না। সে সময় থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩০ বছরে ৫৭৫ টি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এসব মসজিদে ৫ ওয়াক্ত নামাজ ও নিয়মিত জুম'আর নামাজ আদায় করা হয়। ফ্রান্সে ১৩০০ মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং ১৬০০ টি ইসলামি প্রতিষ্ঠান দাওয়াতি কাজ করছে। সে দেশে জাতীয় পর্যায়ে মুসলিমদের নিজস্ব ১ টি রেডিও চ্যানেলও রয়েছে। নওমুসলিমদের দিক থেকে ফ্রান্স ইউরোপের সর্বশীর্ষে। ফ্রান্স সরকারের ধারণা-যেভাবে ফ্রান্সে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ১৫ বছরের মধ্যে ফ্রান্সে মুসলিমদের সংখ্যা ৮০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। ইতালীতে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ, মসজিদের সংখ্যা ৪৫০ টি এবং অনেকগুলো দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছে।"[২১৮]

জার্মানিতে মসজিদের সংখ্যা ১৪০০০ টি। ২০০১ সাল পর্যন্ত কানাডায় মুসলিগণের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৯/১১'র ঘটনার পর সুইজারল্যান্ডে ৬০০০ খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে এক তথ্য থেকে জানা যায়। আমেরিকার একটি স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ হবে মুসলিম। খ্রিস্টান পাদ্রী মাজুলিনীর মতে, মানুষ যেভাবে ইসলামের প্রতি ধাবিত হচ্ছে তাতে ভবিষ্যৎ

২১৮. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *মুসলিম উম্মাহর সংকট উত্তরণের উপায়* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৫), পৃ. ১৪-১৫

হবে ইসলামের। টাইমস সাময়িকীর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৫ সাল নাগাদ গোটা বিশ্বে মুসলিমগণের সংখ্যা হবে ৩৫.৫ ভাগ। তখন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হবে ২০.২ ভাগ।"[২১৯]

এটি অমুসলিম বিশেষ করে ইসলাম বিদ্বেষীদের জন্য একটি আতঙ্কের সংবাদ বটে। এ অবস্থায় মুসলিম জাগরণকে রুখে দেয়ার জন্য ইসলাম বিদ্বেষীরা সম্মিলিতভাবে কাজ করে চলেছে এবং মুসলিমদের মধ্যে উগ্রবাদ ছড়িয়ে দেয়ার নানা অপকৌশল চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ইউরোপের বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের কাছে এ বার্তাটি তুলে ধরতে চায় যে, ইসলাম একটি সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী ধর্ম। আর এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য তারা অত্যন্ত সচেতনভাবে মুসলিম জাতিকেই ব্যবহার করছে। আজ ইসলামের নামে যেসব সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে এটি ইসলাম বিদ্বেষীদের গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল বলে অনেকে মনে করেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে যারা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তাদের সৃষ্টির ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এদের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণার বীজ ইসলাম বিদ্বেষীরাই বপন করেছে, যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ সম্পর্কে সামীম মোহাম্মদ আফজাল বলেন, "মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে পাশ্চাত্য বিশ্বের জনগণের কাছে ইসলামের সুমহান শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ব, কল্যাণ, মানবতাবোধ, মৈত্রী, সহমর্মিতা, উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতার বাণী যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারেনি। এ ব্যর্থতার সুযোগই ইসলাম বিদ্বেষীরা কাজে লাগাচ্ছে। তাই ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখতে হলে সন্ত্রাস ও ভ্রাতৃঘাতি হানাহানির পরিবর্তে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য, শান্তি ও মানবতার বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা একান্ত জরুরী।"[২২০]

৬.২ বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া

দার্শনিকভাবে দেখলে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া। আল্লাহ নিজেই বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ অর্থাৎ, "হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?।"[২২১]

সত্যিকার অর্থেই বেশির ভাগ মানুষ বাস্তবে স্রষ্টাকে ভুলে গিয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকায় নাস্তিকের সংখ্যা অনেক। রাশিয়া পূর্বে অফিসিয়ালি নাস্তিক ছিল। এখনো সেখানে নাস্তিকতার হার কম নয় বরং অনেক হবে। অন্যদিকে যারা বিশ্বাসী বলে দাবি করে তাদের মধ্যেও

২১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
২২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
২২১. আল কুর'আন, ৮২ : ৬

অনেকে সন্দেহবাদী। অর্থাৎ বলবে না স্রষ্টা নেই কিন্তু বাস্তবে স্রষ্টাকে স্মরণ করবে না বা তাঁর আদেশ মেনে চলবে না। স্রষ্টাকে মেনে চলে, এ রকম লোকের সংখ্যা খুব কম। স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়ার ফলে দুটি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। একটি হলো বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা। আরেকটি হলো গোঁড়া সেকুলারিজম। সেটিও স্রষ্টাকে প্রায় অস্বীকার করার কাছাকাছি একটি অবস্থা। বিশ্ব সংকটের মূলে কাজ করেছে এ দুটি একদিকে বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা এবং অন্যদিকে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

শাহ আব্দুল হান্নান এ সম্পর্কে বলেন, "স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়ার প্রভাব শিক্ষাব্যবস্থার ওপরেও পড়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সেকুলারিজমের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান বিজ্ঞান শিক্ষাতে রয়েছে সেকুলারিজমের গভীর ছাপ। ইউরোপের পণ্ডিতরা এমনকি বর্তমানে মুসলিম বিজ্ঞানীরাও তাদের বইগুলো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' দিয়ে শুরু করেন না। কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা বিশাসী না হওয়ায় অথবা সেকুলার হওয়ায় কিংবা স্রষ্টায় বিশ্বাস করা তাদের কাছে একটি লজ্জার বিষয় হওয়ায় তারা স্রষ্টার কথা উল্লেখ করেন না।"[২২২]

আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক ভালো দিক আছে, অনেক অবদান আছে। কিন্তু এর পেছনে কাজ করছে এমন একটি মন যেটি স্রষ্টার প্রশ্নে, আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়বাদিতায় ভুগছে, স্রষ্টাকে স্পষ্ট স্বীকৃতি দিচ্ছে না, আল্লাহর নাম উল্লেখ করছে না, এটি উল্লেখ করা সভ্যতাবিরোধী মনে করছে, এটি একটি পশ্চাৎপদ ব্যাপার মনে করছে। এ, যে ধারণা এটি কালচারকে খারাপ করে ফেলছে। কালচারে সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার প্রভাব পড়ছে।

শাহ আব্দুল হান্নান বলেন, "দারিদ্র্য বিশ্বের একটি বড় সংকট, দারিদ্র্যের কারণে মানুষের একটি বিরাট অংশ ভালো হতে পারে না। এ সংকটের মূলেও রয়েছে আল্লাহ্কে না মানা, বস্তুবাদ এবং সেকুলারিজম। মানুষ বস্তুবাদী হয়ে গেছে। গরিবের জন্য, দারিদ্র দূর করার জন্য কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সে উপলব্ধি করছে না। অনেকেই দারিদ্র্য দূর করার জন্য ওয়াদা করে থাকেন। আসলে তারা ওয়াদা করার জন্য ওয়াদা করেন, কথা বলার জন্য বলেন। সত্যিই কি কার্যকরভাবে তারা এগুলো চান? বিশেষ করে দেশের পুঁজিবাদীরা এগুলো চান না বলেই মনে হয়। কারণ পুঁজিবাদের তত্ত্বে গরিবের কথা নেই প্রফিটের কথা আছে, মুক্তবাজারের কথা আছে। সেখানে সরকারি হস্তক্ষেপ না করার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়ার মাধ্যমে বাজারের বিকৃতি দূর করার কথা পুঁজিবাদী তত্ত্বের কোথাও নেই। গরিবের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে–এটি পুঁজিবাদের কোথাও বলা নেই। যদিও এটি

২২২. শাহ আব্দুল হান্নান, মুসলিম বিশ্ব সমসাময়িক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ (ঢাকা: বুকমাস্টার প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ৬

এখন পুঁজিবাদী দেশে করা হচ্ছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা তারা নিচ্ছেন পুঁজিবাদের কাঠামো থেকে বের হয়ে এসেই। উপনিবেশবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদও এসেছে বস্তুবাদ থেকেই। নিজের ভোগ ও জাতির ভোগের প্রেরণা থেকেই এসবের উৎপত্তি। এ সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে শোষণ করা। এ যে বস্তুবাদী স্বার্থপরতা এবং পুঁজিবাদ–এসব পরস্পর বিছিন্ন নয়। এ সবকিছু মিলে মানুষকে দায়িত্বহীন বানিয়েছে, তাকে ভোগবাদী করে তুলেছে। দায়িত্বশীল কাদেরকে বলা যেতে পারে? যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করেন এবং দুনিয়াকে শোষণ করেন না।"[২২৩]

সুতরাং সকল সমস্যার মূল কারণ যদি বলতে হয় তাহলে বলা যাবে, স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া। এজন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আহ্বান করেছেন আল্লাহ্‌কে মানো এবং বলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে মানুষের মধ্যে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। মুসলিমগণের এমনকি অমুসলিমগণের জন্যও বলতে হবে, যে কোনো ধর্মের প্রতি বিশ্বাস নাস্তিকতা থেকে ভালো। প্রত্যেক ধর্মের একটি এথিকস বা নীতিবোধ আছে। নাস্তিকতার কোনো নীতিবোধ নেই। এটি তো নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। নাস্তিক বিশ্বাস করে যে তার কোনো বিচার হবে না, তার কোনো জবাবদিহিতা নেই; সুতরাং দুনিয়ার যা ইচ্ছা সে করতে পারে। এ ধরনের লোক সমাজের জন্য ভয়ঙ্কর। এজন্য সবার মধ্যে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। আল্লাহকে চেনাতে হবে যতদূর সম্ভব। সঠিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবেই সমাজ তথা বিশ্ব থেকে স্বার্থপরতা দূর হতে পারে, সমাজের মূল রোগ তথা মূল সমস্যা দূর হতে পারে।

৬.৩ মুসলিম উম্মাহর যুবসমাজের মেধা ও শ্রমকে অকল্যাণে ব্যবহার করা

যুব সমাজ হচ্ছে বিশ্বের প্রতিটি জাতির প্রাণশক্তি। এ যুব সমাজের কর্মসংস্থান এবং তাদের মেধা ও শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবী সমৃদ্ধ হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর যে বিপুল যুব শক্তি একে যথাযথভাবে দ্বীনের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারার কারণে এ যুবশক্তিকে ইসলামের লেবাসধারী মুনাফিক গোষ্ঠী সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। অনেকেই যোগ্য কর্মসংস্থানের অভাবে অর্থ রোজগার ও বেঁচে থাকার তাগিদে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে তেলসম্পদ বিক্রি ও নানা অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জন করে আইএস নামক সংগঠনটি বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছে। যুব সমাজের অনেকেই উচ্চ বেতনের প্রলোভনে পড়ে আইএস নামক সংগঠনটিতে যুক্ত হচ্ছে বলে একাধিক তথ্য থেকে জানা যায়। যুব সমাজের বেকারত্ব ঘুচিয়ে তাদের মেধা ও

২২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

যোগ্যতাকে ইতিবাচক কাজে লাগাতে পারলে মুসলিম উম্মাহ পেতে পারতো একটি সুন্দর ও কল্যাণকর সমাজ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম সভ্যতা একদিন পৃথিবীকে আলোকিত করেছিল। যুব সমাজই ছিল তার কাণ্ডারি। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ বিপুল সম্ভাবনাময় যুব সমাজকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে আত্মঘাতী সন্ত্রাসের পথে। এটি মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করে দেয়ার একটি চরম খেলা ছাড়া কিছু নয়।

এ সম্পর্কে সামীম মোহাম্মদ আফজাল বলেন, "বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিস্তারের ফলে আজ এমন একটি অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে একজন মুসলিম যুবক অপরিচিত একজন মুসলিম যুবকের সাথে কথা বলতেও ভয় পায়, আতঙ্কে থাকে। তার মনে একটা অজানা আতঙ্ক কাজ করে এ অপরিচিত যুবকটি সন্ত্রাসী কি না? যদি তার দ্বারা কোনো সন্ত্রাসী কার্যক্রম সংঘটিত হয় আর ধরা পড়ে তাহলে পরিচয়ের কারণে তাকেও দুর্ভোগে পোহাতে হবে। এ যখন অবস্থা তখন যুব সমাজের ঐক্য হবে কিভাবে? দেশ জাতি ও উম্মাহর কল্যাণে তারা কিভাবে সম্মিলিত হয়ে কাজ করবে? এ সন্দেহ ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রটি তৈরি করেছে ইসলামের লেবাসধারী রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের অভিলাষী স্বার্থান্বেষী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। এ অবস্থায় যুবসমাজের মেধা, যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে ইতিবাচক বা কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করার জন্য তাদের যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী। প্রতিটি মুসলিম উম্মাহর সচেতন নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত বলে মুসলিম বিশ্ব মনে করে।"[২২৪]

৬.৪ নব্য সাম্রাজ্যবাদ

এ নব্য সাম্রাজ্যবাদী কারা বিশ্বের সব মানুষ জানে। আজ তারা চাচ্ছে রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে বিশ্বকে শাসন করতে। তারা চায় তাদের আদেশ নিষেধকেই মেনে চলতে হবে, তাদের মতো চলতে হবে। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক কিংবা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমেও এ রকম ডিকটেশন আসতে পারে।

এ প্রসঙ্গে শাহ আব্দুল হান্নান বলেন, "নয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রসঙ্গে আফগানিস্তানের পরিস্থিতিতে বলা যায় আন্তর্জাতিক আইনে আমেরিকার কোনো অধিকার ছিল না আফগানিস্তান আক্রমণ করার। আন্তর্জাতিক আইনে একটি রাষ্ট্রের আরেকটি রাষ্ট্র আক্রমণ করার কোনো অধিকার নেই। আমেরিকা একটি আক্রমণাত্মক শক্তি। তারা এমন একটি দেশ যারা কোনো প্রকার আন্তর্জাতিক আইন মানে না। বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন বলে, যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে তা জাতিসংঘে তোলা উচিত। আর জাতিসংঘ কোনোভাবেই একটি দেশের ওপর আক্রমণ করার কথা বলতে পারে না। খুব বেশি হলে

২২৪. *মুসলিম উম্মাহর সংকট উত্তরণের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

জাতিসংঘ অবরোধ কায়েম করার কথা বলতে পারে, এর বেশি কিছু নয়। নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব নিরাপত্তা রক্ষা করা, নিরাপত্তা বিঘ্ন করা কিংবা আক্রমণ করা নয়। এদিকে আমেরিকা শুধু আক্রমণ করছে তা-ই নয়; তারা বলছে বিন লাদেনকে তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু তারা তা বলতে পারে না। আমেরিকা আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে আফগানিস্তানে হামলা করে, শুধু তাই নয়, তারা বন্দিদেরকে হত্যা করা। তারা মাজারি শরীফে বোমাবর্ষণ করে বন্দীদেরকে হত্যা করেছে। প্রিজন রায়ট হয়েছে কিনা তার কোন প্রমাণ নেই, আর যদি হয়েও থাকে তাহলেও বোমাবর্ষণ করে কোনো প্রিজন রিভল্ট দমন করা হয় না। সাধারণত কয়েকদিন খাবার, পানি দেয়া হয় না। তারপর এর সমাপ্তি হয়। মি. রাম্সফিল্ড বলেছেন, Capture or kill and we have done the second thing. এ হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব আমেরিকান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জনাব বুশ থেকে আরম্ভ করে রাম্সফিল্ড এবং এর সাথে জড়িত সকল কমান্ডারদের উপর পড়বে। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রেসিডেন্ট বুশ, ব্লেয়ারসহ তাদের যেসব কমান্ডার, সৈন্যবাহিনী নর্দান এলায়েন্সে যারা জড়িত–এদের সবার বিচার হওয়া উচিত, দণ্ড হওয়া উচিত।"[২২৫]

তালেবানের নানারকম সমস্যা আছে। আফগান ও মুসলিম এলিটরা তাদের থেকে দূরে সরে গেছে। তারা টেলিভিশন ধ্বংস করে দিয়েছে, মেয়েদেরকে পড়তে দেয়নি, বুদ্ধমূর্তি মুসলিমগণের প্রতিবাদের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়েছে। পাঁচ বছরেও তারা কোন ইলেকশন করেত পারেনি। এমনকি কান্দাহারেও কোনো ইলেকশন করতে পারে নি। তারা তাদের কোনো বৈধতা সৃষ্টি করতে পারে নি। এসব সমস্যা সেখানে ছিল। কিন্তু এর মানে এ নয় যে বাইরের কোনো একটি শক্তি জোর করে আফগানিস্তানের সরকার পরিবর্তন করে দেবে।

ইরাক যুদ্ধ (মার্কিন অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম নামেও পরিচিত; অন্য নাম: অপারেশন টেলিক, ইরাক দখল) একটি যুদ্ধ যা ২০০৩ সালের ২০শে মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীর ইরাক আগ্রাসনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। এই আগ্রাসী বাহিনীতে অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, পোল্যান্ড এবং অন্যান্য কয়েকটি জাতির সৈন্যদল অংশ নিয়েছিল। ইরাক আক্রমণ করার জন্য তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ ও কোয়ালিশন বাহিনী যে কারণ দেখিয়েছিল তা হল: ইরাক ১৯৯১ সালের চুক্তি অমান্য করে গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণ করছে এবং তাদের কাছে এ ধরনের অস্ত্রের মজুদও আছে। তখন সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছিল, ইরাক যুক্তরাষ্ট্র, এর জনগণ এবং মিত্র রাষ্ট্রগুলোর জন্য বড় ধরনের হুমকি। পরবর্তীতে এ সমর্থক কর্মকর্তাদের প্রচন্ড সমালোচনা করা হয়। কারণ আগ্রাসনের পরে পরিদর্শকরা ইরাকে গিয়ে কোন ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্র খুঁজে পায়নি। তারা জানায়,

---

২২৫. *মুসলিম বিশ্বে সমসাময়িক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

ইরাক ১৯৯১ সালেই গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণ ত্যাগ করেছে, ইরাকের উপর থেকে আন্তর্জাতিক অনুমোদন সরিয়ে নেয়ার আগ পর্যন্ত তাদের নতুন করে গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণের কোন পরিকল্পনাও ছিল না। কোন কোন মার্কিন কর্মকর্তা দাবী করেন যে, সাদ্দাম হোসেন আল-কায়দাকে সহযোগিতা করছেন, কিন্তু এর পক্ষেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তার পরও আগ্রাসনের কিছু কারণ দেখানো হয়েছে। যেমন: ফিলিস্তিনের আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করা, ইরাকী সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং ইরাকের তেল সম্পদ অধিগ্রহণ করা। অবশ্য সর্বশেষ কারণটির কথা মার্কিন কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেছে।

আগ্রাসী বাহিনী আক্রমণ করার পরপরই ইরাকী সামরিক বাহিনী পরাজিত হয়। রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেন পালিয়ে বেড়ায়, অবশেষে ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে তাকে আটক করা হয়। ২০০৬ এর ডিসেম্বরে সাদ্দামের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। মার্কিন কোয়ালিশন বাহিনী ইরাক দখল করে সেখানে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের চেষ্টা চালায়। কিন্তু আগ্রাসনের পরপরই কোয়ালিশন বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং ইরাকের বিভিন্ন পন্থী দলগুলোর মধ্যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে অপ্রতিসম বিভিন্নমুখী আক্রমণের মাধ্যমে ইরাকী অভ্যুত্থানের সূচনা ঘটে। সুন্নি এবং শিয়া দলগুলোর মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় যা এখনো বিদ্যমান।

আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম লিবিয়া। একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ, অন্যদিকে সাংস্কৃতিগত প্রাচুর্যতায় ভরপুর ছিল দেশটি। দীর্ঘদিন ধরেই দেশটির শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফি। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে যে বিদ্রোহের আগুন লেগেছে তার আঁচ থেকে বাদ যায়নি সুখি-সমৃদ্ধ লিবিয়া। দেশটির একাংশ সরাসরি বিদ্রোহে নেমে গেছে গাদ্দাফির বিরুদ্ধে। আর তাদের সহায়তা করতে হাজির হয়েছে বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা জোট। বিভিন্ন পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমগুলোতে গাদ্দাফিকে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোন দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। কোনোটাতে তিনি রক্তপিপাসু দৈত্য আবার কোনোটাতে তিনি জল্লাদ স্বৈরশাসক। মিডিয়াগুলো প্রায়ই কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে পাগল স্বৈরশাসক এবং রক্তপিপাসু দৈত্য বলে অভিহিত করে আসছিল। কিন্তু এই অভিযোগগুলো কিসের ভিত্তিতে আর কেনইবা করা হয়েছিল। এ বিষয়টি সবারই জানা রয়েছে। লিবিয়ায় বসবাসরত আদিবাসী গোষ্ঠির সংখ্যা একশ পঞ্চাশেরও বেশি। এদের মধ্যে প্রধান দুটি গোষ্ঠী হলো মেঘারবা এবং ওয়াফাল্লাহ। মেঘাবরা গোষ্ঠি লিবিয়ার দক্ষিণের ত্রিপোলিতানিয়াতে বসবাস করে এবং ওয়াফাল্লাহ গোষ্ঠি বাস করে পূর্বের অংশে। মেঘাবরা ১৮৫৫-১৯১১ সাল পর্যন্ত তুর্কিশদের সহায়তয়া সবগুলো আদিবাসী গোষ্ঠিকে একত্রিত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। যার ফলে (১৯১১-৪৩) ইতালির কলোনিয়াল শাসকরা লিবিয়া ত্যাগে বাধ্য হয়। লিবিয়াতে প্রথম তেল আবিস্কৃত হয় ১৯৫৯ সালে। সেসময় লিবিয়ার ক্ষমতায়

ছিল সেনুসি আদিবাসী গোষ্ঠীর রাজা ইদ্রিস। লিবিয়ার তেল সম্পদ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার অধিকাংশই তেল কোম্পানিগুলো নিয়ে যেতো। ১৯৬৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর লিবিয়ার সাধারণ জনগণের সমর্থণ নিয়ে কর্নেল গাদ্দাফি এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে গাদ্দাফি বারগা আদিবাসী গোষ্ঠীর এক নারীকে বিয়ে করেন। আর এই বিয়ের মধ্য দিয়ে পুরো জাতিকে একত্রিত করেন গাদ্দাফি। ক্ষমতায় যাওয়ার পরপরই গাদ্দাফি লিবিয়ার তেল সম্পদ হতে প্রাপ্ত মুনাফা জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দেন। একই সঙ্গে লিবিয়াতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো কায়েম করেন। লিবিয়াতে কোনো বেকারত্ব ছিল না। আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ জিডিপির দেশ লিবিয়া। দেশটির মাত্র পাঁচ শতাংশেরও কম মানুষকে বলা যায় যে তারা দরিদ্র এবং তার চেয়েও কম মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেছিল। হল্যান্ডের চেয়েও দারিদ্যের হার কম লিবিয়াতে ছিল।

মুয়াম্মার আল গাদ্দাফি-লিবিয়ার এ নেতাকে উতখাতে নেমেছিল আমেরিকা ব্রিটেনসহ অন্তত ৩৫টি আগ্রাসী দেশ। সর্বাধুনিক সব অস্ত্র তারা ব্যবহার করছিল গাদ্দাফির পতনের জন্য। পশ্চিমা দেশগুলো অনেক আগে থেকেই গাদ্দাফিকে হটানোর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল এবং লিবিয়ার এই গণজোয়ারে বিদ্রোহীদের সমর্থন দিয়ে তারা গাদ্দাফিবিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে থাকে। পশ্চিমাদের সঙ্গে পেয়ে বিদ্রোহীরা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ২০১১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহীরা ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিল(এনটিসি) গঠন করে। পশ্চিমারা তেলসমৃদ্ধ লিবিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আশায় এনটিসিকে সমর্থন দান করেন এবং তাদের স্বার্থেই ২০১১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নিরাপত্তা পরিষদে লিবিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ১৭ মার্চ লিবিয়ায় নো ফ্লাই জোন কার্যকর শুরু হয়েছিল যেখানে ন্যাটোর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের বিমান হামলা হয়েছিল। এর নাম দেয়া হয় অপারেশন অডিসি ডন। একের পর এক বিমান হামলায় গাদ্দাফি বাহিনী ধীরে ধীরে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। এভাবে ধীরে ধীরে বেনগাজি, ত্রিপোলি ও বাব-আল আজিজিয়া বিদ্রোহীদের দখলে চলে আসে। ২০ অক্টোবর সেখানেই বিদ্রোহীরা গাদ্দাফিকে আহত অবস্থায় জীবিত আটক করে। এর কিছুক্ষণ পরই তার মৃত্যুসংবাদ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আর এভাবেই দীর্ঘ ৪২ বছরের গাদ্দাফি যুগের অবসান ঘটে। আর এভাবে মুসলিম বিশ্বে একের পর এক নাটকের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব।

নব্য সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে কোনো দেশের সরকারগুলো কিছু করবে না। তাদের অনেকেই বড় বড় শক্তিগুলোর পক্ষে এজেন্টের মত কাজ করছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে একমাত্র জনগণ এবং এজন্য জনগণের নেতাদেরকে সংগঠিত করতে হবে। এ কথা সত্য যে, নব্য সাম্রাজ্যবাদী সব জালেমদের সব সময় পতন হয়। নৈতিক মানবিকতা তা-ই বলে।

৬.৫ জেন্ডার ইস্যু

ইসলামের মধ্যে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, তা হলো জেন্ডার ইস্যু। এটি ইসলামের নারী-পুরুষের স্থান এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়। মেয়েদেরকে পিছনে রেখে ইসলাম কিংবা উম্মত অগ্রসর হবে, তা দিবাস্বপ্ন দেখা। ড. সাঈদ রামাদান, যাকে লিটল হাসান আল বান্না বলা হতো–তিনি উম্মতের তিনটি সমস্যার কথা বলেছিলেন। একটি হলো শরীয়াহ এবং ফিকহের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা। কুর'আন-সুন্নাহর বাধ্যতামূলক প্রকৃতির সাথে ফিকহের বাধ্যতামূলক নয় এমন প্রকৃতির পার্থক্য করতে না পারা এবং দু"টিকে এক করে ফেলা। দ্বিতীয় সমস্যা হলো মুসলিম নারীর দুর্দশা। নারীদেরকে তার যথাযোগ্য স্থান দিতে হবে। তাদেরকে সমাজ এবং ইসলামের কাজে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদেরকে মানবিক মর্যাদায় সমান মানুষ মনে করতে হবে। তাদের সকল অধিকার দিতে হবে। এ কথাগুলো তিনি বলেছিলেন ১৯৬৫ সালের দিকে। আজ থেকে অনেক আগেই তিনি এটি উপলব্ধি করেছেন। এটি বর্তমানে যেমন ড. ইউসুফ আল কারযাভির উপলব্ধি, তেমনি মুহাম্মদ আল গাজ্জালির মতো গ্রেট আলেমরাও একই কথা বলে গেছেন।

৬.৬ গণতন্ত্রের অভাব

স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র মুসলিম বিশ্বে আছে। এটি পাশ্চাত্যের কাছে মুসলিমগণের খারাপ ইমেজই তুলে ধরে। তাদের কাছে মনে হয় মুসলিমগণের স্বভাব হলো এমন। দোষ হলো মুসলিমগণের তারা দেখছে ইসলামই এমন। এর খারাপ প্রভাবটাই মুসলিমগণের ওপর পড়ে। কিন্তু এর সমাধান কি? ইসলামী আইনের আওতায় গণতন্ত্র শব্দটি বহু পূর্বেই স্বীকৃত হয়ে গেছে। ১৯৪৮ সালে যখন পাকিস্তানের সংবিধান হয় সেখানে Democracy, freedom, equality, social justice as enunciated by Islam shall fully observed বলে একটি ধারায় আলেমদের পরামর্শে যোগ করা হয়। আল্লামা ইকবালও গণতন্ত্রের চেয়ে ভালো বিকল্প নেই বলেছেন। ড. ইউসুফ আল কারযাভি, Islamic Movement, Political Freedom and Democracy লেখায় বলেছেন যে "এটিই ইসলামের নিকটতম পন্থা। যারা সন্দেহ করে জনগণের সার্বভৌমত্ব, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস, এ ধারণার কি হবে? এ সন্দেহের উত্তরে তিনি বলেছেন-

"আপনারা যদি এতোই ভয় পান তাহলে সংবিধানের একটি ধারায় লিখে দিন, কুর'আন ও সুন্নাহ বিরোধি কোনো আইন পাস করা যাবে না, তাহলে সমস্যার সমাধান হবে।

কাজেই গণতন্ত্র সম্পর্কে যারা বেশি ভয় পান তারা যদি গণতন্ত্র না বলতে চান তাহলে 'ইসলামী গণতন্ত্র' শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। অনেকে খেলাফত শব্দ ব্যবহার করতে চান।

কিন্তু প্রত্যেকটি ইসলামী রাষ্ট্রকে আলাদা আলাদা খেলাফত বলবেন কি না? তারপর সুস্পষ্ট করতে হবে খেলাফতের বিস্তৃত রূপ কী? পার্লামেন্ট থাকবে কি না? নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন হবে কি না? মৌলিক অধিকার কী হবে? এসব ধারণা সুস্পষ্ট না করে খেলাফত কায়েমের দাবী করায় জটিলতা সৃষ্টি করবে। যতদিন তা না করা হবে ততদিন পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণ ইসলামী রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্র পরিভাষা ব্যবহারের পক্ষে।"[২২৬]

৬.৭ কুর'আন এবং সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা

মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের অন্যতম আরেকটি দিক হলো কুর'আন এবং সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা। এমন এক সময় ছিল যখন কুর'আন এবং হাদিসের পর্যাপ্ত অনুবাদ ছিল না। এখন অনেক অনুবাদ হওয়ায় সমস্যা হয়েছে যে প্রত্যেকে হাদিস পড়ে তার একটি ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করেন, কিন্তু তারা জানেন না হাদিস কতো ধরণের। তারা জানেন না যে হাদিসের মধ্যে যদি সংঘাত দেখা দেয় তাহলে তা কীভাবে দূর করতে হবে। আবার কুর'আনের সঙ্গে হাদিসের যদি বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা কীভাবে দূর করতে হবে? এর ব্যাখ্যা পদ্ধতি না জেনেই তা করতে থাকে। কীভাবে 'তাআরুদ' (বিরোধ) দূর করতে হবে? হুকুমের মূল্য কী? সব হুকুমই কী ফরজ না মুস্তাহাব মাত্র? আমল হলেই কি ফরজ হয়ে যায়? এখন যারা শব্দের বিভিন্ন শ্রেণী (যেমন আম, খাস, হাকীকত, মাজায ইত্যাদি) জানবে না, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পদ্ধতি জানবে না, উসুল আল ফিকহ পড়বে না–তারা যদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তাহলে তা ভুল হবে। এজন্য উসুলের জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উম্মতের মধ্যে সমস্যা বেড়েছে। ধর্মীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ বেড়েছে। এজন্য প্রয়োজন অনেক সংখ্যক বড় আলেমের। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যারা ইসলামের মূল বিষয় জানে না তারা এক ধরনের মূর্খ। এ মূর্খতা থেকে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয় সেটি ইসলামের জন্য বিপজ্জনক। এ অবস্থা থেকে বাঁচার উপায় হলো উসূল আল ফিকহের জ্ঞান এবং নির্ভরযোগ্য ইসলামি সাহিত্য ছড়ানো। আর সাথে আধুনিক সমস্যা ও সভ্যতা জানে এমন গ্রেট আলেম তৈরি করা যারা লোকদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারবে। ড. কারযাভির মতো কিছু গ্রেট আলেম থাকার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের সকলে একটি মতে এসে পৌছেছেন। বাংলাদেশ সহ অন্যান্য মুসলিম দেশে আধুনিক সমস্যা ও সভ্যতা সম্পর্কে অবহিত অত্যন্ত উচ্চমানের আলিমের উদ্ভব হতে হবে। সেটি মুসলিম বিশ্বের জন্য কল্যাণকর হবে।

---

২২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৬.৮ চরমপন্থা বা উগ্রতা

কারযাভির মতো মুসলিম বিশ্বের প্রধান চিন্তাবিদরা মনে করেন মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন রকম চরমপন্থা বা উগ্রতা রয়েছে। এদের স্বভাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এরা একে অন্যকে সব সময় অভিযুক্ত করে। নিজের মতের বাইরে শুনতে চায় না। ইসলামের স্বভাব মধ্যপন্থা, চরমপন্থা নয়। চরমপন্থার ক্ষতি মুসলিমগণ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। এটি দূর করা খুবই প্রয়োজন।

যেখানে মুসলিম উম্মাহর ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা জরুরী সেখানে সময় কোথায় যে মুসলিমরা গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করবে। যেখানে মুসলিম বিশ্বে দারিদ্র্যতার সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা-সেখানে কার দাড়ি কতো বড় সেটি কোনো বিষয় হতে পারে না। কিছু লোক মুসলিমগণের প্রধান বিষয়সমূহের পরিবর্তে ছোট বিষয়গুলোকেই বেশি করে তুলে ধরতে থাকে। কিন্তু এটি মুসলিম উম্মাহকে বুঝতে হবে যে একটি বিল্ডিংয়ের কাঠামো দাঁড় করাবার পর সেটির বিন্যাস বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে আগে বিল্ডিংয়ের কাঠামো দাঁড় করাতে হবে। তেমনিভাবে যেখানে ইসলাম এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে ইসলামের মূল কাজ করার পরই অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে, যদি তা জরুরি মনে করা হয়। আর ততটুকু করা যেতে পারে যতটুকু ইসলাম জরুরি মনে করেছে। কিন্তু এখানে বাস্তব ইসলামের মূল স্পিরিটটিই নেই। সেটি উপড়ে ফেলা হয়েছে। তাহলে এ অবস্থায় কি সেসব মারজিনাল বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়?

ইসলামের একটি অন্যতম বিষয় হলো বিভিন্ন রকম চরমপন্থা যা ইসলামকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যারা চরমপন্থি তাদের অবস্থান কারোর হয় এ পাশে নয় ঐ পাশে, যে কোনো এক প্রান্তে। ফলে তারা কখনো সমন্বয় করতে জানে না। সমন্বয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সমন্বয় করা তখনই সম্ভব যখন মানুষ মডারেট হয়, মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। যখন তাঁরা একে অন্যের সাথে কথা বলে, আলাপ করে, একজন আরেকজনের কথা শোনে–তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েই কাজ করে। কিন্তু কট্টরপন্থা হলো উম্মতের মধ্যে এমন অবস্থান সৃষ্টি করা যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে না পারে।

৬.৯ যুদ্ধ ও সংঘাতের মাধ্যমে অস্ত্র ব্যসায়ীদের অস্ত্রের বাজার সৃষ্টি করা ও মুসলিম বিশ্বের অপরিপক্কতা

বর্তমান পুঁজিবাদী ও বস্তুবাদী বিশ্বের অর্থ রোজগারের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে মারণাস্ত্রের ব্যবসা। সংঘাত ও যুদ্ধ ছাড়া এ ব্যবসা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই তারা অস্ত্র ব্যবসার জন্য সার্বক্ষণিক নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কখনো মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে, কখনো স্বৈরাচার অপসারণের নামে, কখনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার

নামে, কখনো সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনের নামে–নানা দল-উপদল সৃষ্টি করে তাদের অস্ত্র ব্যবসার বাজারকে চাঙ্গা করে তুলে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে যেসব ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত পরিচালিত হচ্ছে এগুলোও মূলত তাদেরই সুদূরপ্রসারী নীল নকশা।

অস্ত্র ব্যবসার জন্য মুসলিম বিশ্বে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য হচ্ছে একটি উর্বর ক্ষেত্র। এখানে যদি সংঘাত ও সংঘর্ষ জিইয়ে রাখা যায় তাহলে দ্বিমুখী লাভ। প্রথমটি হচ্ছে–তেলসম্পদ নিজেদের দখলে নেয়া, তেলের অর্থ দ্বারা সংঘাত জিইয়ে রাখা এবং তেলসম্পদ নিঃশেষ করে মুসলিমগণের দেওলিয়া বানানো এবং মারণাস্ত্র বিক্রির অর্থ দ্বারা নিজেদের সম্পদশালী করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে–ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখে মুসলিমদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে জাতি হিসেবে তাদের দুর্বল করে দেয়া।

এ সম্পর্কে সামীম মোহাম্মদ আফজাল বলেন, "বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে আইএস নামক যে জঙ্গীবাদী গোষ্ঠী মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা তছনছ করে দিচ্ছে এদেরকেও পুঁজিবাদী বিশ্ব সৃষ্টি করেছে বলে বিভিন্ন মিডিয়ার সংবাদ থেকে জানা যায়। গত ১৮ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকের সচিত্র অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, "আইএস প্রতিষ্ঠার মূল হোতা হচ্ছে ইসরাইল। ইসলামী স্টেটের স্বঘোষিত খলিফা 'আবু বকর আল বাগদাদী' তিনি মুসলিম নন। তার আসল নাম 'আকা ইলিয়ট শিমন'–একজন ইহুদি। আমেরিকান ফ্রি প্রেসের প্রতিবেদনে জানা যায়, ইহুদি পিতা-মাতার কোলে জন্ম নেন বাগদাদী। এডওয়ার্ড স্নোডেনের ফাঁস করা তথ্যানুযায়ী বাগদাদীকে টানা ১ বছর সামরিক প্রশিক্ষণ দেয় 'মোসাদ'। একই সময়ে আরবী ভাষা ও ইসলামী শরীয়ার উপর কোর্স করেন বাগদাদী। এ সময় বাগদাদী ইবরাহীম ইবনে আওয়াদ ইবনে ইবরাহীম আল বদরী নাম ধারণ করেন।

তবে মোসাদ অত্যন্ত কৌশলে মধ্যপ্রাচ্যে বাগদাদী সম্পর্কে এ পরিচয় ছাড়িয়েছে যে, বাগদাদী ১৯৭১ সালের ২৮ জুলাই ইরাকের সামারায় জন্মগ্রহণ করেন, বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ-এ মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। এভাবেই সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে ধনী সংগঠন হিসেবে পরিচিত আইএস–এর উত্থান হয় ২০১৩ সালের জুনে। ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ-এর পরিকল্পনায় আইএস তৈরি করা হয়েছে। ইসরাইলী এ সংস্থাটির কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে আইএস–এর সকল শীর্ষস্থানীয় নেতারা। মোসাদের প্রশিক্ষণ কৌশলই আইএস তাদের যুদ্ধে ব্যবহার করছে। তারা অত্যন্ত কৌশলে বিশ্বব্যাপী ধর্মপ্রাণ মুসলিম তরুণদের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা ছড়িয়ে দলে ভিড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাচ্ছে এবং ইসলামকে একটি সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে পরিচিত করানোর জন্য পৃথিবীর নানা দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। অন্য একটি দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, "আইএস-এর মাধ্যমে

মুসলিমদের ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক সহিংসতা ঘটিয়ে ভূখণ্ড বাড়াতে চায় ইসরাইল।"[২২৭]

সম্প্রতি প্যারিসের ৬টি স্থানে একযোগে যে জঙ্গী হামলা হয় এর দায়িত্ব আইএস তাদের নিজেদের কাজ বলে স্বীকার করে নেয়। প্যারিসে এ ভয়াবহ হামলার পর একই সাথে কিউবার সাবেক নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো ও মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ সংবাদ সম্মেলন করে দু'জনেই বলছেন যে, আইএস ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী অস্ত্র। বিশ্বব্যাপী নিজেদের আধিপত্য বিস্তার ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য আইএস নামের এই ভয়ানক কাল সাপ মাঠে নামিয়েছে তারা। প্রতিবেদনটিতে বলা হয় যে, "ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও সন্ত্রাসকে পুঁজি করে সন্ত্রাসবাদ শব্দটির সংযোগ, মুসলিম দেশগুলোতে আইএস নানা ধরনের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু আন্তর্জাতিক মিডিয়া সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে মুসলিম দেশগুলোর সম্পর্ক খুঁজে নিতেই বেশি মরিয়া, বাস্তবতা হচ্ছে–বিশ্বের প্রতিটি সভ্য দেশ, তাদের সরকার প্রধান ও শান্তিপ্রিয় মানুষ বারবারই সন্ত্রাসবাদ ও নির্দিষ্ট কোনো ধর্মকে এক করে দেখে না। সন্ত্রাসের ধর্ম একটাই–সন্ত্রাসবাদ।"[২২৮]

৬.১০ ছোটখাট বিষয় নিয়ে মেতে থাকা

মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে ছোটখাট বিষয় নিয়ে মেতে থাকা। অথচ, বৃহৎ বিষয়গুলো এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, এগুলোর প্রতি উদাসীন উম্মাহর অস্তিত্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরিবেশ তথা সামগ্রিক সত্তাকে বিপন্ন করতে পারে। দাড়ি রাখা, গোড়ালির নিচে পর্যন্ত কাপড় পরা, তাশাহুদের সময় আঙ্গুল নড়ানো, আলোকচিত্র রাখার মতো ছোটখাট বিষয়গুলো নিয়ে অবিরাম বাড়াবাড়ি চলছে। এমন এক সময় এসব নিয়ে হৈ চৈ করা হচ্ছে যখন মুসলিম উম্মাহ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, কম্যুনিজম, ইহুদীবাদ ও খ্রীস্টবাদের নিরবিচ্ছিন্ন বৈরিতা ও অনুপ্রবেশের সম্মুখীন। ক্রীশ্চান মিশনারীরা মুসলিমদের ঐতিহাসিক ও ইসলামী চরিত্র ক্ষুন্ন করার জন্যে নতুন ক্রুসেড শুরু করেছে। দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে মুসলিমদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলিম ধর্ম প্রচারকরা চরম ভীতি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারজাভী বলেন, "আমি দেখেছি যারা শিক্ষাদীক্ষা অথবা জীবিকা অর্জনের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপে এসেছেন, তাঁরাও ছোটখাট বিতর্কিত বিষয়গুলো সাথে নিয়ে এসেছেন এবং এ নিয়ে মাথা ঘামান। এটা এক কথায় মর্মান্তিক! আমি নিজে দেখেছি এবং শুনেছি এসব বিষয় নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ বিষয়গুলো ইজতিহাদসাপেক্ষ। এগুলো এমন বিষয় যা নিয়ে ফকীহদের মত সর্বসম্মত হয় না। আমি

২২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
২২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

নিজেও এগুলোর ওপর বক্তব্য রেখেছি। যা হোক এসব নিরর্থক মাস'আলা-মাসায়েল নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ না করে প্রবাসীদের উচিত ইসলামের মূল সত্যকে আঁকড়ে ধরা। বিশেষ করে মুসলিম তরুণদের এদিকে আকৃষ্ট করা, তাদেরকে অবশ্য পালনীয় কাজগুলো করতে এবং কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা। এ দায়িত্বপালনে সফল হলে ইসলাম প্রচারে এক নতুন আশার সঞ্চার হবে।"[২২৯]

এটা দুঃখজনক যে, যারা এ ধরনের বিতর্ক ও সংঘাতের সূত্রপাত করেন তারাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিধি পালনে উদাসীন বলে অভিযোগ রয়েছে। মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য, স্ত্রী ও সন্তান প্রতিপালন, প্রতিবেশির সাথে সদ্ভাব, সঠিক ভাবে নিজ দায়িত্ব পালন, বৈধ ও অবৈধ বিচারে সতর্কতা, ইত্যাদি প্রশ্নে তাদের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু তারা নিজেদের মান উন্নত করার পরিবর্তে বিতর্ক সৃষ্টি করে খুব মজা পান। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে এক দারুণ বৈরিতা অথবা মুনাফিকীর ন্যায় আচরণ করতে হয়।

৬.১১ নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বাড়াবাড়ি

ইসলামি আইনশাস্ত্র ও শরিয়াহর জ্ঞানের অভাবে নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র নিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি দেখা দেয়। কুর'আন ও সুন্নায় এর বিরুদ্ধে পরিষ্কার সতর্ক বাণী রয়েছে। কুর'আন বলছে:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, "তোমাদের মুখ থেকে সাধারনতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলনা যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফল হবেনা।"[২৩০]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাহাবী এবং প্রাথমিক যুগের বুজুর্গানে দ্বীন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিসকে নিষিদ্ধ বা হারাম বলে ফতোয়া দিতেন না। কিন্তু চরমপন্থীরা তাৎক্ষণিকভাবে হারাম ফতোয়া দিতে যেন এক পায়ে খাড়া থাকে। ইসলামী আইনশাস্ত্রে কোনো বিষয়ে যদি দু'টো মত থাকে যদি একপক্ষে বলে মুবাহ, অন্য পক্ষে বলে মাকরূহ; চরমপন্থীরা এক্ষেত্রে মাকরূহকে সমর্থন করে পরহেযগারী যাহির করে। একপক্ষ যদি একটি বিষয়কে মাকরূহ এবং অন্যপক্ষ হারাম বলে ঘোষণা করে সেক্ষেত্রে গোঁড়া ব্যক্তিরা হারামের পক্ষ নিয়ে সাধুতার প্রমাণ রাখতে চায় অর্থাৎ সহজ ও কঠিনের মধ্যে তাঁরা শেষোক্তটাকে বেছে নেয়াই

২২৯. ড. ইউসুফ আল কারজাভী, *ইসলামী পুনর্জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন ২০১৪), পৃ. ৪৯

২৩০. আল-কুর'আন, ১৬ : ১১৬

অধিকতর তাকওয়ার লক্ষণ বলে মনে করে। তারা ইবনে আব্বাসের (রা.) মধ্যম মত অনুসরণের চেয়ে ইবনে উমরের (রা.) কঠোর মত গ্রহণে বেশি আগ্রহী। বস্তুত এ প্রবণতা মধ্যমপন্থার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই ফসল। এ সমস্ত বিষয়ে চরমপন্থা অবলম্বনের কারণে মুসলিমদের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

৬.১২ ভ্রান্ত ধারণা

ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে ও অগভীর জ্ঞান থেকেই মূলত বিতর্কের সূত্রপাত। এ জন্য ইসলাম, ঈমান, কুফর, নিপাক ও জাহিলিয়াত ইত্যাদির সঠিক সংজ্ঞা ও পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ড. কারজাভী বলেন, "ভাষাগত জটিলতা, বিশেষত আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তির অভাব বহুলাংশে বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত ধারণার জন্য দায়ী। ফলত অনেকেই রূপক ও প্রকৃত অর্থের মধ্যে তারতম্য উপলব্ধি করতে পারে না। ঈমান ও পূর্ণ ঈমান, ইসলাম ও প্রকৃত ইসলাম, বিশ্বাসে মুনাফিকী ও কর্মে মুনাফিকী, ছোট ছোট শিরক ও বড় বড় শিরকের মধ্যে তারা পার্থক্য করতে অক্ষম।"[২৩১]

৬.১৩ রূপকের উপর গুরুত্ব প্রদান

বর্তমান ও অতীতে মুসলিমদের বিপর্যয়ের অন্যতমএকটি কারণ হলো স্পষ্ট ভাষণের প্রতি উপেক্ষা করে রূপক অথের্র ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া। রূপক আয়াত হচ্ছে যেগুলোর গূঢ় অর্থ আছে। আক্ষরিক অর্থই শেষ কথা নয়। আর সুস্পষ্ট আয়াত হচ্ছে পরিষ্কার স্বচ্ছ দ্ব্যর্থহীন যার অর্থ বুঝতে বেগ পেতে হয় না। কুর'আনুল কারীম বলছে :

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থাৎ, "তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যকার রূপক গুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর,

২৩১. *ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

তারা বলেন: আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এ সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করেনা।"[২৩২]

ড. ইউসুফ আল কারজাভী বলেন, "প্রাচীন বিদ'আতি ও গোঁড়া লোকেরা এ রূপক আয়াতগুলোকে চূড়ান্ত প্রমাণ বলে মনে করেছে। তারা স্পষ্ট মৌলিক বক্তব্যগুলোকে উপেক্ষা করেছে। বর্তমান মুসলিম চরমপন্থীরাও তাই করছে। বিভিন্ন বিষয়ে তারা এর আলোকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাল-মন্দ, শত্রু-মিত্র ও কাফির-ঈমানদার নির্ধারণ করছে। ফলে এক মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সতর্ক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কেবল রূপক আয়াতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া জ্ঞানের অগভীরতা ছাড়া আর কিছু নয়। আল-খাওয়ারিজ এভাবে আত-তাকফিরের ফাঁদে পড়েছিলো। তারা তো সকল মুসলিমকে কাফের বলে মনে করতো কেবল নিজেরা ছাড়া। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা হযরত আলী (রা.) এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো, অথচ তারা তাঁরই সহচর ও সৈনিক ছিল। তাদের মধ্যে মত পার্থক্যের মূল কারণ ছিল আমীর মুয়াবিয়ার সাথে হযরত আলী (রা.) আপোস রফা। হযরত আলী (রা.)-এর সৈন্যদের সংহতি মুসলিমগণের জীবন রক্ষার জন্যে এ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিন্তু আল-খাওয়ারিজ কুর'আনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আপোস অগ্রাহ্য করে। আয়াতটি হচ্ছে :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه

অর্থাৎ, "আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না।"[২৩৩] আলী (রা.) তাঁর সে বিখ্যাত উক্তি দিয়ে জবাব দিলেন, "একটি সত্য বাণী বাতিলের জন্যে ব্যবহৃত। বস্তুত সকল আদেশ ও কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহ্‌র জন্যে–এর অর্থ এই নয় যে মানুষ ছোটখাট ব্যাপারে শরীয়াহর কাঠামোয় থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)ও আল-খাওয়ারিজের যুক্তি খণ্ডন করেছেন।"[২৩৪]

অতএব কুর'আন ও সুন্নাহকে গভীরভাবে ও সতর্কতার সাথে অনুধাবন না করলে বিপথগামী হওয়ার আশংকাই সমধিক। বাড়াবাড়ি ও অগভীর জ্ঞানের ফাঁদে পড়ে আজকাল এক শ্রেণীর লোক খারিজীদের মতো অন্যদেরকে কুফরীর ফতোয়া দিয়ে বসে। ইমাম আশ-শাতিবীর মতে শরীয়াহর তাৎপর্য সঠিকভাবে বোধগম্য না হওয়ার দরুনই এরূপ গোঁড়ামির উদ্ভব হয়ে থাকে।

---

২৩২. আল-কুর'আন, ৩ : ৭
২৩৩. আল-কুর'আন, ১২ : ৪০
২৩৪. *ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

৬.১৪ বিশেষজ্ঞ আলিমগণের শরণাপন্ন না হওয়া

মুসলিমগণের বিপর্যয়ের অন্যতম আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে তারা ভিন্ন মতালম্বীর কথা শুনতে মোটেও রাজী থাকে না কিংবা কোনো রকম আলোচনায় বসতে চায় না। তাদের অর্থাৎ গোঁড়াদের মত যে অন্যের মতের আলোকে বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বা বর্জন করা যেতে পারে তাও তারা স্বীকার করে না। তারা বিশেষজ্ঞ আলিমগণের কাছ থেকে কোনো শিক্ষা পায়নি। বই-পুস্তক, সংবাদপত্র ইত্যাদি হচ্ছে তাদের স্বল্প জ্ঞানের একমাত্র উৎস। এগুলো আলোচনা পর্যালোচনার সুযোগও তারা পায় না। ফলে তারা যা পড়ে তা থেকে ইচ্ছেমত সিদ্ধান্তে পৌছে। সুতরাং, তাদের পড়া ও সিদ্ধান্তে যে ভুল হবে তাতে আর সন্দেহ কি! কেউ কোথাও কখনো তাদের মতের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করলেও এগুলোর প্রতি কেউ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আশ-শারীয়াহ বুঝতে হলে যে নির্ভরযোগ্য আলিমগণের শরণাপন্ন হওয়া উচিত সে প্রয়োজনীয়তাও তারা স্বীকার করে না। কোনো মুসলিম তরুণ যদি একা একা এরূপ প্রচেষ্টা চালায় তবে তা হবে আনাড়ি সাঁতারুর মতো গভীর পানিতে ঝাঁপ দেয়া। বিশেষজ্ঞদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছাড়া শারীয়াহর জ্ঞান পূর্ণ হতে পারে না, বিশেষ করে সে সব ক্ষেত্রে যেগুলো নিয়ে মতভেদ আছে। এ কারণে অভিজ্ঞ আলিমগণ তাদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন যারা বিষয়বস্তু উপলব্ধি ছাড়াই কেবল কুর'আনের হাফিয হয়েছেন কিংবা কিছু বই পত্র পাঠ করে যাদের অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর হয়েছে।

ড. ইউসুফ আল কারজাভী বলেন, "এক শ্রেণীর এ তরুণদের বিভ্রান্তির জন্য পেশাদার আলিম ও পণ্ডিতরা বহুলাংশে দায়ী । তারা মনে করে এই আলিমগণ শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়েছে। তারা মনে করে এই আলিমগণ শাসকদের নির্যাতন, নিপীড়ন ও শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপের বিরোধিতা করার সাহস হারিয়ে ফেলেছে, বরং তারা মুনাফিকের মতো শাসকদের গর্হিত কাজের প্রশংসা ও সমর্থন করে। অথচ বাতিলকে সমর্থন না করে অন্তত তাদের নিশ্চুপ থাকাই নিরাপদ ছিল। এ সমস্ত কারণে মুসলিমগণের বিপর্যয় শুরু হয়।"[২৩৫]

৬.১৫ ইতিহাস, বাস্তবতা ও আল্লাহর সুনান সম্পর্কে সচেতনতার অভাব

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক সচেতনতার অভাব ছাড়াও বাস্তবতা, জীবন, ইতিহাস এবং আল্লাহর সৃষ্টির রীতি সম্পর্কেও যথার্থ সচেতনতার অভাব রয়েছে। এর অভাবে কিছু লোক অসাধ্য সাধন করতে চায়। যা ঘটতে পারে না তারা তাই কল্পনা করে এবং পরিস্থিতি ও ঘটনা প্রবাহের ভুল বিচার করে বসে যা আল্লাহর রীতি ও শরীয়তী চেতনার পরিপন্থী। তারা তাদের

২৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬১-৬২

স্বকল্পিত পন্থায় গোটা সমাজ কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে চায়। চিন্তাধারা, ঐতিহ্য, নীতি এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্যে তারা অসমসাহসিক পদক্ষেপ নেয়, এমনকি জীবনেরও ঝুঁকি নেয়। এর পক্ষে বিপক্ষে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তারা তা মোটেও বিবেচনা করে না। কারণ তারা মনে করে তাদের লক্ষ্য তো আল্লাহ্ ও তাঁর কালাম সমুন্নত করা। অতএব এসব লোকের পদক্ষেপকে অন্যরা "আত্মঘাতী" বা উন্মাদনাপূর্ণ বলে অভিহিত করলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

বস্তুত মুসলিমগণ যদি মুহূর্তের জন্যেও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতো তাহলে নিশ্চিতভাবে সঠিক পথ লাভ করতো। রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর তের বছরের মক্কী জীবন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, তিনি শুধু দাওয়াত দিয়ে ক্ষান্ত হননি, তিনশত ষাটটি মূর্তি থাকা সত্ত্বেও কা'বায় সালাত আদায় ও তাওয়াফ করতে বলেছেন। কেন এরূপ করলেণ? তিনি কাফিরদের তুলনায় তাঁর অনুল্লেখযোগ্য শক্তি ও অবস্থানের কথা ভেবে অতি বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি কখনোই কমান্ডো হামলা চালিয়ে পাথরের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার চিন্তা করেননি। তাহলে তো আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যেত। ঐ পদক্ষেপে কাফিরদের মন থেকে তো বহু ঈশ্বরবাদের ভূত মুছে ফেলা যেতো না। তিনি সর্বাগ্রে চেয়েছিলেন তাঁর স্বজাতির মনকে মুক্ত করতে-কা'বাকে মূর্তিমুক্ত করতে নয়। এ জন্য তাওহীদের শিক্ষা দিয়ে প্রথম তিনি মুশরিকদের মন পবিত্র করার লক্ষে সকল চেষ্টা সাধনা নিয়োজিত করেন।

৬.১৬ মুসলিম দেশসমূহ থেকে ইসলামের নির্বাসন

একজন নিষ্ঠাবান মুসলিমের কাছে বর্তমানে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শিক্ষা অনুসরণের অভাবে বিকৃতি, দুর্নীতি ও মিথ্যা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। মার্ক্সবাদের ও ধর্মনিরপেক্ষতার ছোবলে মুসলিম সমাজ বিপর্যস্ত। আধুনিক "ক্রুসেডাররা" ক্লাব, থিয়েটার, অশ্লীলতা, ছায়াছবি, নাচ-গান, মদ তথা সর্বক্ষেত্রে মুসলিমগণকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। সংবাদপত্রে তারা অনুপ্রবেশের জাল বিস্তার করছে। রাস্তাঘাটে অর্ধোলঙ্গ নেশাসক্ত নারীদের অবাধে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। আর এসবই হচ্ছে মুসলিম সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়ার সুগভীর চক্রান্তের ফল।

এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারজাভী বলেন, "মুসলিম দেশগুলোতে এমন সব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে যা শরীয়তে নিষিদ্ধ অথচ ভাব দেখানো হয় উম্মাহর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ উজ্জীবিত করাই এর লক্ষ্য। কিন্তু এসব আইনের উৎস শরীয়ত নয়, বরং ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই–এসব আইন আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে সিদ্ধ করে আর আল্লাহ্ যা সিদ্ধ করেছেন তাকে অসিদ্ধ ঘোষণা করে। আর এসব তথাকথিত আধুনিক আইন সব রকম দুর্নীতি ও অনাচারকে প্রশ্রয় দেয়। অন্যদিকে শাসকদের

কার্যকলাপও হতাশাব্যঞ্জক। তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে সন্ধি করে আর ইসলাম ও ইসলামপ্রিয় মানুষকে দলন করে। কদাচিৎ এদের মুখে ইসলামের কথা শোনা যায় নিছক ধর্মীয় উপলক্ষ্য ছাড়া তাও আবার সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে।"[২৩৬]

মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা আরো করুণ। তরুণরা তাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের কি অসহনীয় বৈষম্য! কেউ কোনোভাবে জীবন ধারণ করছে, এমনকি ঔষধপথ্যও সংগ্রহ করতে পারছে না কিংবা মাথা গোঁজারও ঠাই নেই। অন্যদিকে বিত্তবানরা লাখ লাখ টাকা মদ ও নারীর পেছনে ঢালছে, বড় বড় প্রাসাদে বাস করছে কিংবা অনেক সময় খালিই রেখে দিচ্ছে। বিদেশী ব্যাংকে তারা কোটি কোটি ডলার গোপনে সঞ্চয় করছে। তারা তেলের টাকা অপহরণ, পাশ্চাত্যের সাথে সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর সাথে লেনদেন করে বিত্তের পাহাড় গড়ছে। আর এ অর্থ তারা জুয়া ও নারীর পিছনে অকাতরে ব্যয় করছে। এর একটি অংশও যদি তারা দরিদ্র মানুষের জন্যে দান করতো তাহলে হাজার হাজার মানুষের অন্ন ও আশ্রয়ের সংস্থান হতো। অথচ এ সুবিধাভোগী শ্রেণী দিনে দুপুরে ডাকাতির মতো জনগণের সম্পত্তি অপহরণ করে চলেছে। সুদ, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি তো আছেই কিন্তু এদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করার কেউ নেই। আইনের হাত থেকে বাঁচার রাস্তাও তাদের জন্য সহজ। সুতরাং এ নিদারুণ পরিস্থিতি সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে, এতে আর সন্দেহ কি! আর এ সুযোগের জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকে সর্বনাশা মার্ক্সবাদীরা। তখন তারা বিকল্প হিসেবে শ্রেণী সংগ্রামের কাজ জারি করে দেয়।

৬.১৭ ইসলামী দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা

ইসলাম শুধু নিজেকে সৎ হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা দেয় না, অন্যকেও সংশোধনের তাগিদ দেয়। মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দেয়া ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টাকে এ কারণে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলিমকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলাম প্রচারের কাজে অংশ নিতে হবে। এ জন্যে কুর'আনে বলা হয়েছে:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থাৎ, "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করেন–জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করেন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার

২৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।"[২৩৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও প্রত্যেক সাহাবী ছিলেন ইসলাম প্রচারক। কুর'আন আরো বলেছে:

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থাৎ, "বলে দিন এ আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[২৩৮]

দাওয়াতী কাজে ভীতিপ্রদান ও বাধা সৃষ্টিও চরমপন্থী মনোভাব সৃষ্টির প্রধান কারণ। বিশেষ করে যখন ধর্ম নিরপেক্ষতা ও মার্ক্সবাদ প্রচারে কোনো বাধা দেয়া হয় না; বরং সকল সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয় তখন এটাকে কিছুতেই সহজভাবে মেনে নেয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এ কারণে যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ইসলামী বিপ্লবের কাজে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই, কোন সরকারেরও থাকতে পারে না। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতেই ইসলামকে পরিপূর্ণ বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে গিয়ে সেন্সরশীপ ও নানারকম দলনের শিকার হতে হচ্ছে। সেখানে কেবল দরবেশ মার্কা ইসলাম ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেয়া হয়। এদের ইসলামের চেহারা হচ্ছে পশ্চাৎপদতা ও অবজ্ঞায় এবং আচার-অনুষ্ঠান, বিদ'আতী কাজ কর্ম, শাসকতোষণ এবং শাসকদের গদী বহাল রাখার দোয়ার মধ্যে সীমিত। আর এভাবে দুর্নীতিপরায়ণ শাসকরাও এ ধরণের ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় অতি উৎসাহী। এভাবে অন্যায় অবিচার শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদকে তারা স্যাবোটাজ করার অপচেষ্টা চালায়। মার্ক্স সম্ভবত এ অর্থে দাবী করেছিলেন, "ধর্ম জনগণের জন্য আপিম।"[২৩৯]

কিন্তু কুর'আনুল কারীম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন যে ইসলাম রেখে গেছেন তা হচ্ছে সত্য, শক্তি, সম্মান মর্যাদা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জিহাদের প্রতিভূ। আর শাসকরা এ ইসলামকে ভয় পায়; কারণ তাদের অনাচার-অবিচারের বিরূদ্ধে কী জানি কখন বিদ্রোহ দেখা দেয়! পক্ষান্তরে এ ইসলাম তার অনুসারীদেরকে বলে:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ

২৩৭. আল-কুর'আন, ১৬ : ১২৫
২৩৮. আল-কুর'আন, ১২ : ১০৮
২৩৯. *ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

অর্থাৎ, "তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতো না।"[২৪০]

৬.১৮ ধর্মীয় অনুভূতির অভাব

প্রাচীন প্রাচ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্যের মধ্যে এ এক বিরাট মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য প্রাচ্য ধর্মীয়বোধ ও অনুভূতির ধারক বাহক গণ আর পাশ্চাত্য এর ধারক বাহক গণ উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে সাথে ধর্মীয়বোধ ও অনুভূতি খুইয়ে বসেছে এবং যখন কোন লোকের কোন ইন্দ্রিয় নষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তখন তার সমগ্রবোধ ও অনুভূতি যা কেবল উক্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত তা বেকার হয়ে যায়, থাকা নাথাকা সমান হয়ে যায়। যে ব্যক্তি শ্রবণ শক্তি থেকে বঞ্চিত তার জন্য শব্দের জগত থাকা নাথাকা সমান এবং কথা বলার এ বিশাল জগত তার কাছে নীরব কবরস্থান মনে হবে। দৃষ্টি শক্তিহীনের কাছে বর্ণ-বৈচিত্রে ভরপুর এ জগত অর্থহীন, রঙের পার্থক্য তার কাছে কোন অর্থই বহন করেনা। ঠিক তেমনি যিনি ধর্মীয়বোধ রহিত–তার সেসব অনুভূতি, চেতনা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়াও নিষ্ফল মনে হবে যা কেবল ধর্মীয় অনুভূতি ও বোধেরই পরিণতি হিসেবে দেখা দেয়। তার কাছে পারলৌকিক জীবন, পরকালীন শাস্তি, পূণ্য, জান্নাত, জাহান্নাম, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি, তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি ও সংযম, পবিত্রতা, চিরস্থায়ী মুক্তি, ধ্বংস ইত্যাদি সবই অর্থহীন শব্দ বলেই মনে হবে। তার কাছে এমন কোন আহ্বানের মধ্যে আদৌ কোন আকর্ষণ ও দিলের টান থাকবেনা যার সম্পর্ক তার অনুভূত বিষয়াদি, নগদলাভ ও ফূর্তি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

দীনের দাওয়াত প্রদান কারীদেরকে প্রতিটিযুগে ও আম্বিয়ায়ে কিরামগণ স্ব স্ব দাওয়াতী যুগে–সেসব লোকের বেলায় সবচাইতে বেশি কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে যেসব লোকের ক্ষেত্রে তাদের দাওয়াত, পাহাড় বিচূর্ণ কারী ও লৌহ প্রাকারকে মোমের মত দ্রবীভূত কারী ব্যথা-ভরা ওয়ায আদৌ কোন ক্রিয়া সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা ছিল সে সব লোক যারা ধর্মীয়বোধ ও অনুভূতি থেকে মাহরূম হয়ে গিয়েছিল এবং যাদের দিলের অঙ্গারধানিকা এমনভাবেই ঠাণ্ডা ও শীতল হয়ে গিয়েছিল যে, কোন ভাবেই আর তাতে উত্তাপ সঞ্চারের সম্ভাবনা ছিলনা। যারা ধর্ম ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, তারা এ সম্পর্কিত কোন কথা শুনবেনা, এ নিয়ে ভাববেনা, যারা তাদের যুগের দাঈ ও মুবাল্লিগদের পাথরকে মোমের মত গলিয়ে দেবার মত ওয়ায-নসিহত শুনে অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেছিল:

---

২৪০. *আল-কুর'আন*, ৩৩ : ৩৯

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوث অর্থাৎ, "আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না।"[২৪১] অথবা যাদের দৃষ্টি বস্তুগত সমতল থেকে হাকীকত পর্যন্ত তথা অন্তর্গত সত্য পর্যন্ত পৌছুবার যোগ্য নয় এবং যারা পয়গম্বরের সর্বসাধারণের পক্ষে বোধগম্য বক্তৃতা শোনার পর যা তাদেরই ভাষায় করা হয়েছিল, অত্যন্ত সাদামাঠা ও সরলভাবে বলেছিল:

مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا অর্থাৎ, "আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই, আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দূর্বল ব্যক্তি রূপে মনে করি।"[২৪২]

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এমন এক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে যাদের পার্থিব কর্মব্যস্ততা ও মগ্নতা কিংবা দুনিয়ার ভোগের মোহ তাঁদের জীবনে ধর্মের জন্য এতটুকু জায়গা অবশিষ্ট রাখেনি। অনেক অনুসন্ধান চালাবার পরও যারা ধর্মের দাওয়াত দেন সে সব দাঈ ও মুবাল্লিগদের জন্য তাদের মন ও মস্তিষ্কে এতটুকু জায়গাও মেলেনি যা দিয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক আহ্বান তাদের ভেতর পৌছানো যায়। যেমন কোন লোকের যদি গান শোনার মত কান ও কাব্যের জন্য সূক্ষ্ম রুচিবোধ না থাকে তাহলে তার জন্য গানের সর্ববিধ কলা-কৌশল ও পৃথিবীব্যাপী চিত্ত-চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী কাব্যও বেকার ও নিষ্ফল প্রমাণিত হবে। ঠিক তেমনি যে ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনা হারিয়ে ফেলেছে তার জন্য নবী-রাসূলগণের গোটা দাওয়াত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের যাবতীয় ওয়ায-নসীহত ও উপদেশ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও গল্পকাহিনী সবই হবে ফলশূন্য।"[২৪৩]

৬.১৯ আল্লাহ–অনুসন্ধানী মানসিকতার বিশ্বব্যাপী অভাব

পূর্বে আল্লাহ–অনুসন্ধানী মানসিকতা ব্যাপকভাবে পাওয়া যেত। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ দ্বীন-ধর্মের খোঁজে ও আল্লাহওয়ালা মানুষের তালাশ করতে গিয়ে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছে যেত। দুনিয়াদারী ও বস্তুবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে যাবার পর ধর্মীয় প্রবণতা ও আল্লাহ–অনুসন্ধানী মানসিকতার কেন্দ্র ঐ সব মহাপুরুষের সত্তা ও তাঁদের আবাসিক স্থান গুলো ছিল যারা অলসতা ও বস্তুবাদের বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রে মনুষ্য জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-উপদ্বীপ কায়েম করে রেখেছিলেন যেখানে তারা মানুষকে বস্তুবাদের এ ঘূর্ণিয়মান বিষয়সমূহ থেকে বের করে এনে তাদেরকে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দিতেন এবং তাদের ভেতর প্রলয়-তুফানের মুকাবিলা করার যোগ্যতা, সামর্থ্য ও শক্তি সৃষ্টি করতেন।

---

২৪১. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৩৯
২৪২. আল-কুর'আন, ২৩ : ৩৮
২৪৩. আল-কুর'আন, ১১ : ৯১

মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান ও কেন্দ্রীয় শহরের প্রায় সর্বত্রই এমন সব ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন যাঁদের বরকতময় সত্তা ছিল অন্ধকার সমুদ্রে আলোক মিনার। মানুষ পতঙ্গের ন্যায় আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (র.)-এর আধ্যাত্মিক নয়া উপনিবেশ গিয়াছপুর ছিল এর একটি সর্বোত্তম উদাহরণ, যিনি ঠিক রাজধানীতে আটজন শক্তিশালী সুলতানের শাসনামলে প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তাঁর স্বনিয়ন্ত্রিত হুকূমাত কায়েম রেখেছেন যেখানে সিজিস্তান থেকে শুরু করে অযোধ্যা পর্যন্ত সব জায়গার আল্লাহ্–সন্ধানী মানুষ পড়ে থাকত।

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সে যুগে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার কিছুটা আগে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর সাথী মাওলানা আব্দুল হাই, মাওলানা ইসমাইল শহীদ ও তাঁদের একনিষ্ঠ মুবাল্লিগবৃন্দ মুসলিমগণকে আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান, মুসলিমগণ আগ্রহ ও উদ্দিপনার সঙ্গে এ আহ্বানে সাড়া দেয় এবং এ জামাতের আমীরের চারপাশে একত্রিত হয়, উন্নত মন ও উদার মানসিকতা নিয়ে প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং নিজেদের ধর্ম প্রেম ও বিনয়ের প্রমাণ দিয়েছিল, এরপর যেভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামের সকল দিকে সর্বোত্তম ফুলের সুবাস তার কাছে এসে পৌছে গিয়েছিল যা ১২৪৬ হিজরির ঘটনায় বালাকোটের মাটিতে মিশে গিয়েছিল এর থেকে বেশ ভালভাবে ধারণা করা যায়, সে অধঃপতনের যুগেও মুসলিমদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি, ধর্মের প্রতি কতটা আগ্রহ, মনের টান ও আল্লাহ্কে পাবার জন্য কতখানি পাগলপারা নেশা, কী পরিমাণ মন-মানসিকতা এবং কতটা ভাল যোগ্যতা ও সামর্থ্য ছিল।"[২৪৪]

কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভোরের শুকতারা এক এক করে নিভতে শুরু করে। এক প্রদীপ থেকে আরেক প্রদীপ জ্বলবার চিরাচরিত ধারা থেমে যায়। এবং সে প্রদীপটুকু অবশেষে নিভে যায়। বর্তমানে মানুষের মন থেকে সে আগ্রহ উদ্দীপনা হারিয়ে যায়, যে আগ্রহ উদ্দিপনা একদিন সুদূর বুখারা ও সমরকন্দ থেকে ইলম পিয়াসীদের দ্বারা আবৃত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এসে জীবনে আল্লাহ্কে পাবার কোন উপায় থাকলো না। হৃদয় ও আত্মার জায়গাও পেট ও পাকস্থলী দখল করে নেয়। জীবনের সমস্ত উন্নত, পবিত্র ও সূক্ষ্ম বিষয় চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যায়।

৬.২০ দুনিয়া কামনার রোগ

বর্তমান যুগ আল্লাহ্কে চাওয়ার পরিবর্তে দুনিয়া চাওয়ার যুগ এবং তার চাইতেও অধিক দ্রুতিগতিতে এসেছে এ যুগ। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ক্ষমতায়নের এ যুগে দুনিয়া কামনা ও

২৪৪. *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

উদর পূজার যে তুফান এসেছে তার জন্য রোগ-ব্যাধি ও প্রলাপের চাইতে কমতম কোন শব্দসমষ্টি যথেষ্ট নয়। বিত্ত-সম্পদের এ এক অতৃপ্ত ক্ষুধা ও না মেটবার মত পিপাসা যাকে রাক্ষুসে ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলাই সঙ্গত। জীবনের কামনা বাসনা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবন মান এত উন্নত হয়ে গেছে যে, মানুষ দুনিয়ার লোভে আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে তাঁকে স্মরণ করার মত একটু ও সময় পায় না। সম্পদের যত পাহাড়ই সে গড়ুক, সম্মান ও পদমর্যাদার যত শীর্ষেই সে আরোহন করুক, কোথাও সে তৃপ্ত নয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ক্ষমতার এ যুগে মূলত না প্রকৃত জ্ঞানের প্রতিই মানুষের আগ্রহ আছে, আর না আছে ধর্মের প্রতি কোন আকর্ষণ অথবা অন্য কোন কিছুর প্রতি কোনরূপ সূক্ষ্ম চাহিদা। একমাত্র পেট যার দৈর্ঘ্য এক বিঘতের বেশী নয়, জীবনের সকল ব্যাপ্তি ও প্রশস্ততাকে ঘিরে রেখেছে। কল্পনার জগতে পুস্তক রচনাকারী সুখ স্বপ্নের অধিকারী লেখক যা খুশী লিখুক, ব্যস্ত জীবনে এ মুহূর্তে কেবল একটিই সক্রিয় শক্তি এবং একটিই জীবন্ত সত্যের সাক্ষাত পাওয়া যায় আর তা হলো পেট কিংবা পকেট।

কোন যুগ ও যামানার রুচি, স্বাদ ও সাধারণ প্রবণতা ও জীবনের সত্যিকার সমস্যার সঠিক পরিমাপ সেসব গ্রন্থ থেকে করা যায় না যেসব গ্রন্থ সে যুগে লেখা হয়, কিন্তু কোন কোন সময় এসব গ্রন্থের লেখকরাও তাঁদের একক রুচি কিংবা জাতির কোন ক্ষুদ্র দলের প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন এবং কোন কোন সময় ঘটনাবলীর পরিবর্তে আপন কামনা বাসনাকে ঘটনা হিসেবে পেশ করে থাকেন। যুগের রুচি ও প্রবণতা, সঠিক পরিমাপ দৈনন্দিন জীবন, খোলামেলা ও অসংকোচ-আলোচনা, বৈঠকী আলাপের বিষয়বস্তু এবং লোকের সাথে মেলামেশাও দেখা-সাক্ষাতে হয়ে থাকে।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী এ প্রসঙ্গে বলেন, "এ মূলনীতিকে সামনে রেখে রেলপথের দীর্ঘ সফরে, সকাল-সন্ধায় পায়চারীর মুহূর্তে, খানা কিংবা চায়ের টেবিলে সবুজ পার্ক ও ভ্রমণ কেন্দ্রগুলোর ইতস্তত পদচারনা ও আড্ডার সময় এবং বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খোলামেলা ও অন্তরঙ্গ আলোচনার মুহূর্তে কান লাগালে শুনা যায়, মুসলিম জাতি কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে? শুনতে পাওয়া যায়, কথা হচ্ছে বেতন বাড়লো কিংবা কমলো, অফিসারদের সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বদলি, তাদের মেযাজ-মর্জি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা, ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভালাভ, ব্যাংকের লেনদেন, সুদের হার, কোম্পানির শেয়ার, শেয়ার বাজার, বীমা কোম্পানির পলিসি, পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড, চাকুরী থেকে অব্যাহতি কিংবা অবসর গ্রহণের পরবর্তী অবস্থা, চাকুরী সম্ভাবনা, জেতার নানা ঘটনা, সৌভাগ্যবানদের নিয়ে ঈর্ষা, ভাগ্যহতদের ব্যাপারে আফসোস এবং এ জাতীয় বিষয়

নিয়ে কথা ছাড়া হাজার চেষ্টা করলেও এর বাইরে অন্য কোন বিষয় আলোচনা করতে দেখতে পাওয়া যায় না।"[২৪৫]

অথবা দেখা যায়, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও পর্যালোচনা হচ্ছে, কিন্তু কোন নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। কোন ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থার ওপর নীতিগত সমালোচনা এবং কোন সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা ও আশাবাদ এতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্যের লোকেরা এ ব্যাপারে অগ্রণী এবং ভারতের হিন্দুরা প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের হুবহু অনুসারী। দুঃখের ব্যাপার হলো, মুসলিমরাও এখন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।

৬.২১ নৈতিক অধঃপতন

মুসলিম সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এতটা দৃঢ়, মযবুত, স্থায়ী ও গভীর ছিল আজকে তা কল্পনা করাও অনেক কঠিন। পিতামাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, সন্তানের বড়দেও প্রতি ছোটদের ভক্তি-শ্রদ্ধা, ছোটদেও প্রতি স্নেহ মমতা, নারীদের সতীত্ব, স্বামীর আনুগত্য ও তার বিশ্বস্ততা, যুবকদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সততা, আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা, দেখা-সাক্ষাত, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মিত আমলসমূহ আদায়, পোশাক-পরিচ্ছেদ ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সাম্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য ত্যাগ, কুরবানী ও সংবেদনশীলতা ইত্যাদি কিন্তু কালের বিবর্তনে আজ সহজে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ছে। বর্তমানে এসে মুসলিমরা পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়ে নানামুখী তৎপরতা চালাচ্ছে যা পুরোপুরী ইসলামে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ আসাদ লিখেছেন:

"পশ্চিমের সামাজিক জীবনে বর্তমানে যে নিগূঢ় পরিবর্তন ঘটছে তাতে দিনের পর দিন উপযোগবাদী নীতিবোধ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠছে। কারিগরী যোগ্যতা, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদী দলীয় বোধের মত বস্তুবাদী সমাজ কল্যাণের সাথে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট সকল দিককে দেয়া হচ্ছে উচ্চ মর্যাদা এবং কখনো কখনো তার মূল্য অহেতুক অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে; সন্তান বাৎসল্য বা দাম্পত্য জীবনের বিশ্বস্ততার মত যেসব গুণকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত নিছক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হতো সে সবের গুরুত্ব দ্রুত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কারণ সমাজের ওপর সেসবের নিবিষ্ট বস্তুবাদী কল্যাণ দেখা যাচ্ছে না। শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য বলিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধনের চূড়ান্ত প্রয়োজন অনুভূত হতো যে যুগে, আধুনিক পাশ্চাত্যে তার স্থান অধিকার করেছে ব্যপকতরো শিরোনামযুক্ত এক নতুন সমাজ সংহতির যুগ। যে সমাজ অপরিহার্য রূপে শিল্প বিজ্ঞান প্রভাবিত এবং যা দ্রুত ক্রমবর্ধমান গতিতে শুধু যান্ত্রিক ধারায় গড়ে ওঠেছে, সেখানে পিতার প্রতি পুত্রের আচরণের কোন বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব থাকতে পারেন না, যতক্ষণ ব্যক্তি বিশেষ তার আচরণে

---

২৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮

পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্ক সমাজের নির্ধারিত সাধারণ শালীনতার সীমার মধ্যে থেকে কাজ করে। ফলে পাশ্চাত্যের পিতা প্রতিদিন পুত্রের ওপর তার কর্তৃত্ব ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছে এবং সম্পূর্ণ ন্যায়সংগভাবে পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। যে যান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত প্রবণতা রয়েছে ব্যক্তি বিশেষের ওপর অপরের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা লোপ করার, তার বিধান তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করছে এবং প্রকৃতপক্ষে তাকে অচল করে দিচ্ছে। কারণ উপরিউক্ত ধারণার ন্যায়সঙ্গত বিকাশের খাতিরে পারিবারিক সম্পর্কের সুযোগ-সুবিধাও লোপ পেতে বাধ্য।"[২৪৬]

৬.২২ হীনমন্যতা

মুসলিম প্রাচ্যে মানুষের উন্নতি-অগ্রগতি ও চরমোৎকর্ষের মান ছিল খুবই উন্নত। এজন্য দ্বীন দুনিয়া, ইল্‌ম ও আমলের সমন্বয়ে বহুবিধ মানবীয় গুণ দ্বারা ভূষিত এবং মানবীয় উৎকর্ষ এমন বহু বিক্ষিপ্ত শাখা-প্রশাখার সম্মিলন অনিবার্য ছিল যার মধ্যে এ যুগের হীনমন্যতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টি পরস্পরবিরোধী মনে করে থাকে। কোন মানুষের মধ্যে একই সময় এসব গুণের যে সমাবেশ ঘটতে পারে তা কল্পনা করতেও অধিকাংশ অক্ষম।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "পাশ্চাত্যের বস্তুগত ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির যুগে মানুষের জীবনের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ এবং দৃষ্টান্তমূলক কল্পনা বর্তমানে এসে অনেক নেমে গেছে। কেবলই ভাল খাবার, ভাল বেশ-ভূষা ও পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান, সমাজে সম্মানিত ও বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে পরিগণিত হওয়া এবং সমশ্রেণীর লোকদের মধ্যে সম্মান ও পদমর্যাদা লাভই জীবনের একমাত্র আদর্শে পরিণত হয়েছে। নবী-রাসূলদের জীবন-চরিত আজ মানুষের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেছে। দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয়, মেধা ও জ্ঞানগত, আধ্যাত্মিক ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষ, হালাল রুযী উপার্জন প্রভৃতির ন্যায় গুণে গুণান্বিত লোকদের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ও প্রাধান্য লোপ পেয়েছে। এমন সব লোকের প্রভাব তাদের মস্তিস্কের ওপর জেঁকে বসেছে এবং আদর্শ, নমুনা ও জীবনে সফলতা লাভের চূড়ান্ত কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দৃষ্টি ও কল্পনার সামনে পাহাড়সম দাঁড়িয়ে গেছে যারা নৈতিক চরিত্র ও মেধাগত দিক দিয়ে ত্রুটিযুক্ত, কীর্তিকাণ্ডের দিক দিয়ে অত্যন্ত অধঃপতিত, জ্ঞানগত উৎকর্ষ ও যথার্থ গুণাবলী থেকে মাহরূম, চারিত্রিক মানের দিক দিয়ে নিচ ও সাধারণ পর্যায়ের, নীচু শ্রেণীর মানুষ কিংবা অর্থনৈতিক জীব এবং টাকা উপার্জনের চেতনাহীন ও নিষ্প্রাণ মেশিন। দৈহিক আরাম-আয়েশপ্রিয়তা এতটা প্রাধান্য লাভ

২৪৬. মুহাম্মদ আসাদ,*'সংঘাতের মুখে ইসলাম'*, অনুবাদঃ আব্দুল মান্নান সৈয়দ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১), পৃ. ৩১

করে এবং ক্রীড়া-কৌতুক জীবনের এমন এক বিরাট অংশে জুড়ে বসে যে, ইবাদত-বন্দেগী, ধর্মীয় অবধারিত কর্তব্যসমূহ পালন ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনাদির দিকে মনোনিবেশ করার জন্য আর কোন অবকাশ থাকেনি।"[২৪৭]

৬.২৩ গোঁড়ামি ও চরমপন্থা অনুসরণ

গোঁড়ামি বা চরমপন্থা এমনিতেই সৃষ্টি হয় না। এর উৎপত্তির পিছনে অনেক কারণ বিদ্যমান। এর মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, বুদ্ধিভিত্তিক প্রভৃতি কারণ রয়েছে। এর কোনটা প্রত্যক্ষ আর কোনটা পরোক্ষ, কোনটার মূল সুদূর অতীতে আবার কোনটার উৎপত্তি সাম্প্রতিক কালে। এগুলো চরমপন্থীর ব্যক্তিগত জ্ঞান, শিক্ষা দিক্ষা, তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির কারণে সৃষ্টি হয়। কখন ক্ষমতাশীল সরকারের দুর্নীতির কারণেও গোঁড়ামি ও চরমপন্থা বিস্তার লাভ করে থাকে। এক্ষেত্রে তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থান্ধতা, ইসলাম ও মুসলিমগণের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, দেশের জনগণের অধিকার হরণ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করা ইত্যাদি চরমপন্থা ও উগ্রপন্থার জন্ম দেয়।

৬.২৪ কুর'আন না বুঝা

আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বমানবের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য যে সকল কিতাব যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন তার নির্ভেজাল, অবিকৃত ও প্রকৃত রূপটি এখন আর পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যেত তাহলে দেখানো যেত যে, পরবর্তী প্রত্যেক নবী-রাসূলের নিকট প্রেরিত বাণী পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের নিকট প্রেরিত বাণীর চেয়ে অধিক বিকশিত ও পূর্ণতর ছিল। এভাবে পূর্ববর্তীর চেয়ে পরবর্তীর অধিকতর বিকাশের ধারাবাহিকতাতে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট প্রেরিত বাণীতেই আধ্যাত্মিক চেতনা পরিপূর্ণ মহিমায় বিকশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[২৪৮]

মুসলিমগণের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হচ্ছে সঠিকভাবে কুর'আন মাজিদেও অর্থ না বুঝা। তারা কুর'আন পঠন ও পাঠদানে মশগুলে থাকে, কিন্তু কুর'আন অনুধাবন করেনা এবং তাঁর উদ্দেশ্য জানেনা। আল্লাহতা'আলা কুর'আনের মধ্যে মানবজাতির জন্য সব বিধি-বিধান

---

২৪৭. *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০-৩০১

২৪৮. আল-কুর'আন, ৫ : ৩

বর্ণনা করেছেন কিন্তু মুসলিম জাতি কুর'আন কে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ এবং অনুকরণ কওে না। যদি তারা কুর'আন কে পরিপূর্ণ রূপে অনুসরণ করত তাহলে তারা বর্তমানে এসে পথ ভ্রষ্ট হতো না।

৬.২৫ দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানের অভাব

মুসলিমদের বিপর্যয়ের মৌলিক কারণগুলোর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে দ্বীন সম্পর্কে যথার্থ ও মৌলিক ইসলামি জ্ঞানের অভাব। দ্বীনি ইলমের স্বল্পতা, দ্বীনের বিধি-বিধানের রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থতা এবং তার উদ্দেশ্য ও চেতনা অনুধাবনে অপরাগতা চরমপন্থার জন্ম দেয়। এভাবে শরিয়তের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য না বুঝে ইচ্ছামতো অভিমত গ্রহণ করে। এ দিকেই হাদিসে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন:

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নিবেন না, বরং তিনি আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে জ্ঞানকে উঠিয়ে নেবেন। ফলে কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না। তখন মানুষ মূর্খদেরকে নেতা বানাবে। মানুষ তাদের কাছে দ্বীনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। তখন তারা না জেনে ফতোয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরা বিভ্রান্ত হবে এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করবে।"[২৪৯] মূলত অহংকারযুক্ত অল্পবিদ্যা পূর্ণ অজ্ঞতার চেয়ে অত্যধিক বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। কারণ অল্পবিদ্যার অধিকারী কস্মিনকালেও তার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে না। শুধু তাই নয়, তারা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে।

৬.২৬ শরীয়ত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

মুসলিম বিপর্যয়ের আরেকটি কারণ হচ্ছে শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহ ভুল বা বিকৃতভাবে অনুধাবন করা। ইসলাম অনুধাবনের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা, ইসলামি শরীয়ত ও রিসালাতের মূল উদ্দেশ্য অনেকের কাছে অস্পষ্ট থাকার কারণে শরীয়তের অনেক বিধান সম্পর্কে তারা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। তারা শরীয়তের দলিলসমূহকে ভ্রান্তভাবে বুঝত, যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের অনুধাবনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইবেন আব্বাস (রা.) তাদের সাথে আলোচনা করে যখন তাদের কাছে দলিল সমুহের সঠিক অনুধাবন উপস্থাপন

২৪৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, অধ্যায়: কিতাবুল ইলম, পরিচ্ছেদ: কাইফা ইয়াকবিদুল ইলম, হাদীস নং - ১০০

করলেন তখন তাদের মধ্যে যারা ফিরে আসার তারা ফিরে এসেছিল। পরবর্তীতে কিছু মানুষ গোমরাহির পথ বেঁচে নিয়ে মুসলিম বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করে।

৬.২৭ সুস্পষ্ট দলিল বর্জন করে দ্ব্যর্থবোধক দলিলের অনুসরণ

মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের আরেকটি কারণ হচ্ছে সুস্পষ্ট দলিল বর্জন করে মুতাশাবিহ বা দ্ব্যর্থবোধক দলিলের অনুসরণ করা। বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ কওে না। যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান তারাই এরূপ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

অর্থাৎ, "সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপক গুলোর।"[২৫০] চরমপন্থীরা সাধারণত মুতাশাবিহ দলিলের অনুসরণ করে চলে। তারা এসব দলিল দ্বারা নিজেদের হীন উদ্দেশ্য সফল করতে সচেষ্ট হয়। তারা বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ধারণেও মুতাশাবিহ দলিলের ওপর নির্ভর করে। ফলে বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের মূল্যায়নে, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে, মুমিন বা কাফের প্রমাণে মারাত্মক ভ্রান্তিতে উপনীত হয়। সুতরাং, কুর'আন হাদীস ভালোভাবে অনুধাবন না করলে বিপথগামী হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

৬.২৮ প্রবৃত্তির অনুসরণ করা

মুসলিমগণের বিপর্যয়ের আরেকটি কারণ হচ্ছে প্রবৃত্তির অবুসরণ করা। আর মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে, কুরআন হাদীস অনুসরণ না করে প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হয়। মুসলিমগণের পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী করার ক্ষেত্রে শয়তানের দুটি পদ্ধতি রয়েছে, যা মানুষকে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট করতে সে প্রয়োগ করে। প্রথমত, যদি মুসলিম ব্যক্তি চরমপন্থি ও অবাধ্য হয় তাহলে তার নিকট অবাধ্যতা ও প্রবৃত্তিকে সে সুশভিত করে উপস্থাপন করে, যাতে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স.) অনুসরণ থেকে দূরে থাকে। দ্বিতীয়ত, যদি মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স.) অনুগত ও ইবাদত করে, তাহলে শয়তান গোঁড়ামি ও চরমপন্থাকে তার সামনে সুন্দর করে উপস্থাপন করে, যাতে দ্বীন পালনে সে বিভ্রান্ত হয়।

মূলত শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণাই চূড়ান্ত গোঁড়া ও চরমপন্থীদের সামনে প্রবৃত্তির অনুসরণ ঔদ্ধত্যের শীর্ষে আরোহণ ও শরীয়ত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করে এবং বিজ্ঞ আলেমদের থেকে বিমুখ করে রাখে, যাতে বিদ্বানগণ তাদের সঠিক জ্ঞান ও সুপথ প্রদর্শন করতে না পারেন। আর চরমপন্থীরা যেন তাদের সীমালঙ্ঘন ও

২৫০. আল-কুর'আন, ৩ : ৩

ভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে। সুতরাং চরমপন্থা উত্থানের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণ অন্যতম প্রধান কারণ। প্রবৃত্তির অনুসারীকে বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ অর্থাৎ, "আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথ ভ্রষ্ট আর কে?।"[২৫১] প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদানপূর্বক মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ অর্থাৎ, "বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করোনা এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করোনা, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথ ভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।"[২৫২]

৬.২৯ যথার্থ ইসলামি পরিবেশের অনুপস্থিতি

সমাজে বা দেশে ইসলামি পরিবেশ না থাকলে ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে চরম আঘাত লাগে। ফলে তারা সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামী পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে চরমপন্থা ও গোঁড়ামির উদ্ভব হয়। সুতরাং মুসলিম দেশে যখন ইসলামী পরিবেশের পরিবর্তে অনৈসলামিক পরিবেশ গড়ে ওঠে, ইসলামের পৃষ্ঠ-পোষকতার বদলে ফ্যাসিবাদ, মার্ক্সবাদ, সেক্যুলারিজম, সোসালিজম ইত্যাদি লালন করা হয় তখন সেখানে গোঁড়ামি সৃষ্টি হয়। তাছাড়া মুসলিম দেশের শাসকগণ যখন কুরআন সুন্নাহর বিধানের বদলে মানব রচিত বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়, ন্যায়-নীতির পরিবর্তে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়, ধর্মীয় শাসনের পরিবর্তে ধর্ম নিরপেক্ষ শাসনকে প্রাধান্য দেয়, তখনি মুসলিমগণের বিপর্যয় ঘটতে শুরু করে।

৬.৩০ ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা

ইসলাম প্রচারে স্বাধীনতা না থাকা বা ইসলামী দাওয়াত দানে প্রতিবন্ধকতা আরেকটি কারণ। ইসলাম শুধু ব্যক্তির জন্য নয়, বরং সমষ্টির জন্য। একক ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজের সমস্ত লোককে বাঁচার জন্য আহ্বান করে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

২৫১. আল-কুর'আন, ২৮ : ৫০
২৫২. আল-কুর'আন, ৫ : ৭৭

অর্থাৎ, "মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর।"[২৫৩]

তাই ইসলাম কেবল নিজেকে সৎ হিসেবে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দেয়না অপরকে সংশোধনেরও তাগিদ দেয়। মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার জন্য প্রত্যেক মুসলিমকে এগিয়ে আসতে হবে যত বাধা বিপত্তি-আসুক, যদিও বর্তমানে ইসলামের প্রচার করতে গেলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

৬.৩১ মুসলিমদের বিশেষ করে মুসলিম রাজা-বাদশাহগণের বিলাসিতায় ডুবে থাকা

মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা এমন কোন খারাপ কাজ নাই যা তারা করছে না। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানরা অত্যাচারী, লোভী, হিংসুক, স্বার্থপর, তোষামোদকারী, অসাধু, স্বেচ্ছাচার, মিথ্যাবাদী, সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল, ভীতু, একনায়ক, ঐক্যমত্যের অভাব, ভ্রাতৃবোধহীন ও মুনাফিক প্রকৃতির। আর তার জন্য বিশ্বে মুসলিমদের এত সমস্যা। বিদেশের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ঐ মুসলিম শাসকরা বদ্ধপরিকর। দুঃখ জনক হলেও সত্য ধনী মুসলিম দেশগুলো মুসলিমদের উপকারের চাইতে ক্ষতিই বেশী করছে। বর্তমান বিশ্বের সর্ব বৃহৎ অস্ত্র আমদানীকারক দেশ সৌদিআরব। সৌদি আরব কাকে মিত্র ও কাকে শত্রু ভাবছে। তবে অমুসলিমদের চাইতেও ইসলামের অপুরনীয় ক্ষতি করছে মুসলিমরা। আজ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের ব্যাপারে ইউরোপ যতটা করছে সে হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যের প্রেট্রোডলার সমৃদ্ধ দেশগুলো কিছুই করছে না। বিশেষ করে ইউরোপে জার্মান শরনার্থীদের প্রতি যে সাহায্য ও সহানুভুতি দেখিয়েছে তা বিরল দৃষ্টান্ত। মুসলিমদের উচিত তাদের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যদিও বিশ্বের সকল অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স এবং তাদের লেজুড় সমর্থক-দালাল বাহিনী। সুতরাং ইসলাম বিরোধীরা মহা আনন্দে হাসবে উল্লাস করবে এটাই স্বাভাবিক। মুসলিমরা সমূলে ধ্বংস না হলেও করুণ পরিণতির স্বীকার হচ্ছে ও মানবেতর জীবন যাপন করছে। এ অবস্থায় পৃথিবীতে সকল অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড বন্ধে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের যথাযোগ্য উদ্যোগ নেয়া উচিত।

৬.৩২ জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ছেড়ে দেয়া

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বর্তমানে যেমন অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামরিক শক্তির চাবিকাঠি, অতীতেও তাই ছিল। মধ্যযুগে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। এক পর্যায়ে মুসলিম অধিকৃত স্পেনের কর্ডোভা এবং ইরাকের বাগদাদ নগরী হয়ে উঠেছিল বিশ্বের

২৫৩. আল-কুর'আন, ৬৬: ৬

জ্ঞানচর্চার প্রধান দুটি কেন্দ্র। কিন্তু তারা বৈজ্ঞানিক উন্নতির এ ধারা বজায় রাখতে পারেনি। এক সময় তারা স্থবির হয়ে পড়ে, বিশেষভাবে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পর। কয়েক শতাব্দীর চেষ্টায় অর্জিত জ্ঞান যেসব হাতে লেখা ছিল। হালাকু খান সেগুলো নষ্ট করে ফেললে জ্ঞানের জগতের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরে আর কখনো সে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়নি।

১৪৯২ সালে কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয়দের রেনেসাঁ (নবজাগরণ) শুরু হয়। তখন থেকে তাঁরা বিজ্ঞানের সকল শাখায় দ্রুত উন্নতি করতে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ছিল উন্নতমানের সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি এবং উন্নততর যুদ্ধাস্ত্র উদ্ভাবন। এর পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সবটাই নিয়ন্ত্রণ করত পশ্চিম এশিয়ার মুসলিমরা। উন্নত জাহাজের বদৌলতে এক সময় তা ইউরোপীয়দের হাতে চলে চায়। ক্রমে তারা সকল ক্ষেত্রে মুসলিমদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। পরবর্তীকালে ইউরোপের কয়েকটি দেশ কর্তৃক বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় উপনিবেশ স্থাপন তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের ফলশ্রুতি। পক্ষান্তরে ক্ষমতার কোন্দল, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা, শাসকদের অপরিণামদর্শিতা ইত্যাদি কারণে মুসলিমদের মূলরাষ্ট্র ক্রমে দুর্বল হতে থাকে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এর বিলুপ্তি ঘটে। সামরিক বিষয় অবহেলার কারণে মুসলিমদের চরম খেসারত দিতে হয়েছে এবং এর জন্য দায়ী বৈজ্ঞানিক অনগ্রসরতা।

বর্তমান যুগে প্রযুক্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক মেরুদন্ড। উন্নতদেশগুলো নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সেগুলোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির অসংখ্য পথ তৈরি করে চলেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান অবহেলা করে মুসলিমরা যেমন মার খেয়েছিল এখনও তেমনি মার খেয়ে যাচ্ছে। মনে হয় মুসলিমরা নিজেদের দক্ষতা সম্বন্ধে আস্থাহীন হয়ে পড়েছে।

৬.৩৩ অন্দর মহল নিয়ে আমোদ প্রমোদে ব্যাস্ত থাকা

পৃথিবীর চাকচিক্য ও সতেজতা, তার শ্যামলতা ও সৌন্দর্য এবং তার আমোদ-প্রমোদ ও আরাম-আয়েশ ক্ষণকালের জন্য। এ সকল বস্তুকে মানুষের মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসা উচিত নয়। বরং সেই মৃত্যুর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকা দরকার, যার পরের জীবন হল চিরস্থায়ী জীবন, যার কোন শেষ নেই। রেনেসাঁর যুগে ইউরোপীয়রা যখন সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছিল তখন কূপমন্ডক মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানরা রাজকীয় ভোগবিলাসে মত্ত ছিল। তাদের অধিকাংশই মদ ও মহিলাতে আসক্ত ছিল। কিন্তু কেন করছে মূলতঃ ক্ষমতা, অর্থ(টাকা), বিলাসিতা ও আনন্দ-ফুর্তি করার জন্য। বর্তমানে এসেও পুরো পৃথিবীতে যেন একই অবস্থা। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানরা ইসলামের সকল দিক নির্দেশনা যেন ভূলেই গেছে। তারা পাশ্চাত্যের সকল সংস্কৃতি গ্রহণ করে তাদের দেশ সমূহে রূপ দান করছে। পাশ্চাত্যের সাথে তাল মিলিয়ে

অন্দর মহল নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে পড়েছে। মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের আরেকটি বিপজ্জনক বিষয় এই যে, তারা শুধু নিজেদের ধর্মের অনুশীলনই ত্যাগ করেন নাই, বরং অমুসলিমদের রীতিনীতি আয়ত্ত করার জন্যও সচেতনভাবে বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। এর অর্থ ইসলামের কল্যাণকর দিক তাদের আকৃষ্ট করে না। বরং বিধর্মীদের অনুসরণ করাকেই তারা জীবনের চরম সার্থকতা মনে করে।

সপ্তম অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর বির্পযয় হতে উত্তরণের উপায়

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের উপনিবেশকামী শক্তিগুলো মুসলিম দেশগুলোর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের সর্বাত্মক চেষ্টায় লিপ্ত। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা অতীতের মতোই মুসলিমদের মধ্যে মাযহাবগত পার্থক্যসহ ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও অন্যান্য পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভেদ বা সংঘাত উসকে দেয়ার চেষ্টা করছে। তাই এই যুগে ইসলামী ঐক্য অতীতের চেয়েও বেশী জরুরী হয়ে পড়েছে। সমগ্র মুসলিম জাহানের বিভিন্ন মত, পথ ও পর্যায়ের নেতৃত্বকে অনুধাবন করতে হবে যে, ইসলাম ও মুসলিমগণ আজ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক, নির্যাতন, অবিচার ও ষড়যন্ত্র শিকার। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে নিজেদের গুণগতভাবে সমৃদ্ধ করতে হবে। হতে হবে ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ। পাশাপাশি একটি শক্তিশালী উম্মাহ গড়ে তুলতে অবশ্যই তাদেরকে শিক্ষা, অর্থনীতি এবং প্রতিরক্ষাকে গড়তে হবে। আদর্শিক বিষয় দেখার পূর্বে এগুলো হলো অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এমন এক জরুরী বিষয় যা ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত। ঐতিহাসিক এ বাস্তবতার অসীম গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুর'আন তথা মহান আল্লাহ ও তাঁর সর্বশেষ রাসূল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) বার বার মুসলিমগণকে সতর্ক করেছেন। বিশ্বনবী (স.)-এ'র পর মুসলিম উম্মাহর সর্বজনমান্য অন্য মহাপুরুষ বা ধর্মীয় নেতারাও ইসলামী ঐক্য ও সহিষ্ণুতার দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একজন সৎ ও আন্তরিক মুসলিম এ কারণেই প্রত্যয়ী হতে পারে যে, ধর্মের মৌল বিষয়ে অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমগণের মধ্যে কোনো ব্যাপক বিরোধ নেই। মুসলিম ধর্মীয় নেতৃত্ব ও ধর্মশাস্ত্র বিশেষজ্ঞগণ সৎ ও নিষ্ঠাবান হলে গৌণ বিষয়াবলীর বিরোধ পরিপূর্ণভাবে দূরীভূত করা সম্ভব না হলেও হ্রাস করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন। নিচে মুসলিম উম্মাহর বির্পযয় হতে উত্তরণের উপায়সমূহ আলোকপাত করা হলো:

৭.১ শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ গঠন

মুসলিম উম্মাহর অবস্থা আজ খুব একটা ভাল নয়। এখন পর্যন্ত আদর্শিক দিক দিয়ে মুসলিমগণের মধ্যে উম্মাহর অবস্থান এবং ইসলাম সম্পর্কে অনেক অজ্ঞতা রয়েছে। এখানে বিদ'আত প্রচলিত আছে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায় শিরক প্রবেশ করছে। সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহ গভীর অজ্ঞতা, অনেক বিদ'আত এবং শিরকে ডুবে আছে। বস্তুগতভাবে বললে অধিকাংশ মুসলিম দেশেই অশিক্ষা ও দারিদ্রতা বিরাজমান। এছাড়া উন্নয়নের দিক থেকেও তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। কিছু দেশ ছাড়া মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনীতি খুব খারাপ, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও খুব দুর্বল।

দুঃখজনকভাবে মুসলিমগণের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন ফিরকা রয়েছে যারা মুসলিমগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত প্রচার-প্রপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়েছেন। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে অসচেতন এসব ব্যক্তিত্ব ও গ্রুপ তাদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ইসলামের শত্রুদের সেবা করে যাচ্ছেন। পাশ্চাত্যের উপনিবেশ কামীরাই যে ইসলামের আসল শত্রু এবং তারা যে মুসলিমগণের ওপর শোষণ ও নির্যাতন চালিয়ে আসছে সে ব্যাপারে এসব ব্যক্তিত্ব ও গ্রুপের যেন কিছুই করণীয় নেই বা এ ব্যাপারে তারা যেন গভীর ঘুমে অচেতন। মুসলিম বিশ্বের আদর্শিক অবস্থা, তাদের বস্তুগত অবস্থা যখন এই, তখন একটি শক্তিশালী উম্মাহ গড়ে তুলার বিকল্প নেই। কারণ মুসলিম উম্মাহ্ এমন একটি জাতি, যারা ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে। মুসলিমগণ যদি ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত না হয়, তবে অমুসলিমগণের শাসনই চলতে থাকবে তাদের ওপর। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তারা বিলীন হয়ে যাবে অমুসলিমগণের মধ্যে। মুসলিম উম্মাহ মানেই ইসলামি আর্দশের বাহক। আর ইসলামের আদর্শ কেবল তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে, যখন মুসলিমগণ হবে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত। বিচ্ছিন্নতা তাদের মধ্যে কেবল ফিতনা আর বিপর্যয়ই সৃষ্টি করবে। বিচ্ছিন্নতার সুযোগে যে কোনো পরাশক্তি মুসলিমদেরকে ফিতনা এবং গুমরাহিতে নিমজ্জিত করে দিতে পারে। আর বিচ্ছিন্নতার কারণে এ ধরণের ফিতনা তারা প্রতিরোধও করতে পারবে না। ইতিহাস স্বাক্ষী, বিচ্ছিন্নতার যুগে মুসলিমদের মধ্যে ফিতনা কিভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল? ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিজয় তখনই সম্ভব, যখন ইসলামি উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে এর জন্যে চালিয়ে যাবে প্রাণান্তকর চেষ্টা ও সংগ্রাম।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণের সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ থাকা অনিবার্য বা ফরয করে দিয়েছেন। তাছাড়া কোনো জাতির অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষার জন্যে সংগঠন ও সংঘবদ্ধতার বিকল্প নেই। জামাতবদ্ধতা স্বয়ং এক বিরাট শক্তি। কোনো সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ জাতিকে সহজে কেউ পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন করতে পাওে না। একতা, সংঘবদ্ধতা, ত্যাগ ও সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যমেই কোনো জাতি হতে পারে বিজয়ী, লাভ করতে পারে সম্মান, সাফল্য ও উন্নতি। যে কোনো শত্রু এমন জাতিকে সমীহ করে চলতে বাধ্য। এমন জাতিকে পর্যদুস্ত করা সহজ কথা নয়। এমনকি তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করারও কেউ থাকে না। সুতরাং, মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি হবে 'হাবলুল্লাহ বা আল্লাহর রশি'। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব আল কুর'আন ও সুন্নাতে রাসূল (স.)-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এ দু'টির পূর্ণ অনুসরণ তাদেরকে করতে হবে। সবাই ভাই ভাই হিসেবে একযোগে দীনের এ ভিত্তিদ্বয়ের আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। সবাই পরস্পরকে এ দুই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সহযোগিতা করবে। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অর্থাৎ, "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[২৫৪]

৭.২ ঈমানই মুসলিম বিশ্বের শক্তি

ইসলাম হল মুসলিম বিশ্বের জাতীয়তা, রাসূলুল্লাহ (স.) হল তার ঈমাম ও নেতা আর ঈমান হল তার শক্তির উৎস ও ভাণ্ডার যার ওপর ভরসা করে সে অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর মুকাবিলা করেছে এবং বিজয়ী হয়েছে। তার শক্তির রহস্য, তার কার্যকর অস্ত্র ও সক্ষম হাতিয়ার কাল যা ছিল, আজ তাই আছে যা নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে, নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে এবং অন্যদের পর্যন্ত নিজের পয়গাম পৌছাতে পারে।

মুসলিম জাহানকে যদি কমুনিজম ও ইয়াহুদিবাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় কিংবা অন্য কোন শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা করতে হয় তাহলে সে সেই সম্পদের ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ করতে পারে না যা ব্রিটেন তাঁকে দেয় কিংবা আমেরিকা তাঁকে খয়রাত করে কিংবা পেট্রোলের বিনিময়ে সে লাভ করে। সে তার শত্রুর মুকাবিলা কেবল সে ঈমান, সে অর্থপূর্ণ শক্তি, সে রুহ তথা প্রাণসত্তা ও স্পিরিটকে সাথে নিয়েই লড়তে পারে যে স্পিরিটের সাথে কখনো তারা একই সঙ্গে রোম এবং পারস্য সরকারকে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং জয় লাভ করেছিল। সে সেই হৃদয় নিয়ে যুদ্ধ করতে পাওে না যে জীবনকে গভীরভাবে ভালবাসে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে। সে শরীর নিয়ে মোকাবিলা করতে পারে না যা আরাম আয়েশ ও বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত। সে বুদ্ধি-বোধ নিয়েও মুকাবিলা করতে পারে না যাতে সন্দেহ ও সংশয়ের ঘুণ লেগেছে এবং যার চিন্তা ও চেতনা কামনা ও বাসনা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষরত। তাকে মনে রাখতে হবে দুর্বল ঈমান, সন্দেহযুক্ত দিল ও ময়দানের সঙ্গ পরিত্যাগকারি শক্তি সাথে নিয়ে আর যা-ই হোক, যুদ্ধের ময়দান কখনো জেতা যায় না। এ সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "মুসলিমগণের নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিবর্গের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, তারা মুসলিম ফৌজ, কৃষক, ব্যবসায়ী ও জনগণের প্রতিটি স্তরে ঈমানের বিজ বপন করুন, চারা রোপণ করুন। তাদের মধ্যে জিহাদি প্রেরণা, জান্নাতের প্রতি আগ্রহ এবং বাহ্যিক ব্যসন-ভূষণ ও সাজসজ্জার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা সৃষ্টি করুন। তাদেরকে প্রবৃত্তি জাত কামনা বাসনা ও জীবনের কাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা, আল্লাহর পথে বিপদ আপদ ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করা এবং হাসিমুখে মৃত্যুকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও মৃত্যুর মুখে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ার সবক দিন।"[২৫৫]

---

২৫৪. আল-কুর'আন, ৩ : ১০৩

২৫৫. *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

৭.৩ মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন, রাষ্ট্র ও প্রশাসন যন্ত্র পরিচালনায় যারা নিয়োজিত আছেন, আর বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ যাঁদের হাতে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও সঠিক ধারণা লাভের তেমন একটা সুযোগ তাদের হয়নি। প্রধানত মুসলিম বিশ্বের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এর জন্য দায়ী। আলেম উলামাগণের সাথে এদের উঠাবসা, মতবিনিময় ও আলাপ-আলোচনার পরিবেশও তেমন নেই। বরং ঔপনিবেশিক আমলে মুসলিম সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মোল্লা ও মিস্টার তৈরির যে সুদূর প্রসারী উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তার অবসানতো হয়নি; বরং উত্তরোত্তর এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক শ্রেণীর আলেমদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব, আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার অক্ষমতা ও আধুনিক শিক্ষিতদের প্রতি সহানুভূতিহীন কটাক্ষ করার প্রবণতা এ বিভেদকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

উম্মাহর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে এ অবস্থার অবসান ঘটাতে উম্মাহর অভিভাবক আলেম সমাজকে অগ্রণী ও উদ্যেগী ভূমিকা পালন করতে হবে। আধুনিক শিক্ষিতদের প্রতিপক্ষ বিবেচনা না করে, তাদেরকে সহায়ক শক্তিতে পরিণত করার বিশেষ উদ্যেগী ভূমিকা নিয়ে আলেম সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। উম্মাহর সমস্যা নিরসনের জন্য আধুনিক শিক্ষিতদের নেতৃত্ব যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি বর্তমান অবস্থায় শুধু আলেম সমাজের পক্ষেও কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ নেই। জাতির মধ্যকার বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে মোল্লা ও মিস্টার এ পার্থক্য মুছে ফেলে আলেম-ওলামা এবং আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে অর্থবহ ঐক্য, সংহতি, সহযোগিতা বর্তমান সময়ের দাবী। কুর'আন হাদীস ভিত্তিক ইসলামের মৌলিক আহ্বানের ক্ষেত্রে জ্ঞানী আধুনিক শিক্ষিতদের আলেম ওলামার সহযোগিতা নেয়ার প্রয়োজন আছে। তেমনি আধুনিক যুগের রাষ্ট্র প্রশাসন ও আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে আলেম সমাজকে আধুনিক শিক্ষিতদের কাছ থেকে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যথেষ্ট জানার ও বুঝার আছে। তাই উপনিবেশবাদী শাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল স্বরূপ সৃষ্ট আধুনিক শিক্ষিত এবং আলেম সমাজের মধ্যে পরস্পর ঘৃণা বোধ ছাড়াও নেতিবাচক মনোভাব পরিহার করে সকলের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে পরস্পরের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণকারী এ শক্তিকে উপেক্ষা করে অথবা এদের মধ্যে ইসলামের সঠিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি না করে ইসলামের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে পারে না।

তাই এ শ্রেণীর সাথে মত-বিনিময় ও যোগাযোগ ইসলামের চিন্তাবিদ ও আলেম সমাজের প্রধান কর্তব্য যা অগ্রাধিকার ভিত্তিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। নিজেদের ঘরের সন্তান উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ যারা রাষ্ট্র যন্ত্রের ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত,

যারা দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতির শক্তি হিসাবে বিবেচিত, ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণার মাত্রাও কোন অংশে কম নয়। সরাসরি আলাপ-আলোচনা হলে ইসলামী শক্তিকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেলে অনেকাংশেই তাদের ভুল ধারণার দূর হবে। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো পরিশ্রমলব্ধ, সময় সাপেক্ষ ও তুলনামূলকভাবে একটু কষ্ট সাধ্যও হতে পারে, কিন্তু এটা মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। আলাপ-আলোচনা ও ব্যক্তিগত সাহচর্যের ফলে সকলের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না আসলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে, বাদ বাকিদের নেতিবাচক মন-মানসিকতার পরিবর্তন না হলেও মাত্রা কমবে এতে সন্দেহ নেই। দা'য়ী হিসেবে দাওয়াতী তালিকায় এ শ্রেণীকে অবশ্যই রাখতে হবে।

এ সম্পর্কে মতিউর রহমান বলেন, "ইসলাম ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ষড়যন্ত্রই ইসলাম কায়েমের পথে প্রধান বাধা। এসব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী শক্তি সমূহের মূলে রয়েছে জায়নবাদী ও ইহুদীবাদী গোষ্ঠী ও তাদের দোসর পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠী। তাদের সর্বশেষ কর্মকাণ্ড তথাকথিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নগ্ন হস্তক্ষেপের মত অবাঞ্চিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও মর্যাদাহানিকর ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে। অপরদিকে বিশ্বায়নের শ্লোগান ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দ্বার রুদ্ধ করা হচ্ছে। বলতে গেলে বিভিন্ন গরীব দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বই অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে ব্যাপক গণসচেতনতার কোন বিকল্প নেই। তাই আধুনিক শিক্ষিত সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির মন-মগজে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করার পাশাপাশি দাতাগোষ্ঠীর দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী শর্ত মেনে নেয়ার অশুভ পরিণাম পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সোচ্চার ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তেমনি সাধারণ জনগণকেও এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। বিভিন্ন মুখী আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের মোকাবেলার জন্যে জনমত একটা বড় বিষয়। তাই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠীর যেসব শর্ত সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধ বিরোধী, আত্ম মর্যাদার পরিপন্থী, দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী, সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে একটা পর্যায়ে সোচ্চার ভূমিকায় আসতে হবে।"[২৫৬]

বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর অযৌক্তিক শর্ত মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিনিধিত্বকারীদের দুর্বল ভূমিকাও একটা বড় কারণ। দেশ ও জাতির প্রতি কমিটমেন্ট এবং বলিষ্ঠ আত্ম প্রত্যয় নিয়ে নিজেদের দেশ ও জাতির স্বার্থের পক্ষে যথাযথ ভূমিকা পালন করলে ঐসব শর্তকে

২৫৬. *মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এক্ষেত্রে দুটি দুর্বলতার কারণে মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণ এটা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

এক. নিজেদের দেশ ও জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যথাযথ কমিটমেন্ট বা অঙ্গীকারের অভাব। নিজের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব মৌলিক চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার অভাব, নিজেদের হীনমন্যতা, দাতাগোষ্ঠী-সাহায্য সংস্থার যেনতেন প্রকার আনুকুল্য পাওয়ার মন-মানসিকতা, ক্ষেত্রভেদে ব্যক্তি স্বার্থের কাছে জাতির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া দুঃখজনক। দাতাগোষ্ঠীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মন-মানসিকতা যা কোন দেশ ও জাতির জন্য কোন অবস্থাই কাম্য হতে পারে না।

দুই. নিজের দেশের স্বার্থের পক্ষে আত্মপ্রত্যয় ও আস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনা ও নেগোসিয়েশনে ভূমিকা পালনে অক্ষমতা। বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যেম তাদের বিবেকের কাছে সঠিক বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারলে তারা মুসলিমদের সমস্যা অনুধাবন করতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করা হচ্ছে কিনা বিষয়টি গভীরভাবে মূল্যায়নের দাবী রাখে।

উপরিউক্ত দুর্বলতা দু'টি কাটিয়ে ওঠার জন্য মুসলিম বিশ্বের সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের গভীরভাবে ভেবে দেখার সাথে সাথে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। এরপরও সমস্যার সমাধান যদি ব্যাহত হয় তাহলে স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়ার অভিশাপ থেকে মুক্তির পথ হিসেবে খোলা থাকবে গণসচেতনতা ও সোচ্চার জনমত।

৭.৪ চরমপন্থার প্রতিকার

প্রতিকার চরমপন্থার কারণ থেকে অবিচ্ছিন্ন। এর কারণগুলো যেমন বিভিন্ন ও জটিল তেমনি এর প্রতিকারগুলোও। বলা বাহুল্য, কোনো যাদু স্পর্শে চরমপন্থার অবসান ঘটানো যাবে না কিংবা তাদেরকে মধ্যপন্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে না। মুসলিম বিশ্বের কাছে চরমপন্থা ও গোঁড়ামি এর মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকসহ এটি একটি অদ্ভূত ধর্মীয় সমস্যা। সুতরাং, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর সবগুলো দিক বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান যুগের অন্তর্গত পরস্পর বিরোধীতা ও অরাজক অবস্থা এবং ইসলাম থেকে মুসলিমদের বিচ্যুতি চরমপন্থা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। অতএব, এ সমাজকেই এর প্রতিকারে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে, ইসলামের প্রতি তাদের আন্তরিক, সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নবায়ন করা। এটা কেবল মৌখিক ঘোষণা, কিছু মনোহর শ্লোগান অথবা সংবিধানে 'ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষণা করে নয়, বরং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ঘনিষ্ট অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব।

চরমপন্থার প্রতিকার অন্বেষণে মুসলিম জাতির কথাবার্তায় আচরণে ভারসাম্য, সুবিবেচনা ও উদার থাকতে হবে। এলোপাথাড়ি অতিশয়োক্তি এ অদ্ভূত সমাধানের সহায়ক হবে না, বরং এই প্রবণতা ত্রাস সৃষ্টি করে। সবচেয়ে বড় কথা, সত্য ও প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত, বিচারের মানদণ্ডকে দোদুল্যমান এবং সুস্থ চিন্তাকে দূষিত করে এ চরমপন্থা। ফলত কোনো বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে যে রায় দেয়া হোক না কেনো, তা অন্যায় কিংবা অন্তত অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

বস্তুবাদ মানুষের চিন্তা ও আচরণকে বিকৃত করে ফেলেছে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়েছে, মানুষ চাঁদেও গেছে, গ্রহান্তরে আধিপত্য বিস্তার করছে। কিন্তু এসব বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি আত্মার উন্নতি হয়নি। ফলে মানুষ আজ মনের সুখ পাচ্ছে না। এক সময় তারা মনে করেছিলো বস্তুগত আরাম-আয়েশ লাভ করতে পারলে মনের শান্তিও পাওয়া যাবে। কিন্তু তাদের সে আশায় গুড়ে বালি! তাদের মধ্যে চরম নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। হিপ্পি জাতীয় নানা গ্রুপ নিত্য নতুন গজাচ্ছে তাদের কাছে আধুনিক সভ্যতা অর্থহীন হয়ে পড়েছে, তারা এখন প্রকৃতিতে ফিরে যেতে চায়। তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে : আমি কে? আমার লক্ষ্য কি? আমি কোথা থেকে এসেছি? এখন থেকে আমাকে কোথায় যেতে হবে? কিন্তু পাশ্চাত্যের কাছে এসব প্রশ্নের জবাব নেই। এ প্রশ্নের জবাব পেতে গিয়ে কেউ চরম বিধর্মী হয়ে গেছে, আবার কেউবা সত্য পথের সন্ধান পেয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সুখের বিষয়, বহু মুসলিম তরুণ সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর ইসলামের মধ্যেই খুঁজে পেয়ে নিজেদের জীবনকে ইকামতে দ্বীনের জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত।

ড. ইউসুফ আল কারজাভী বলেন, "এ পর্যায়ে মুসলিম জাতির কর্তব্য হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত ফিকাহর ভিত্তিতে যুক্তিগ্রাহ্য ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। এ ফিকহ শুধু ছোটখাট বিষয় নয়, বরং অপরিহার্য দিকগুলোর প্রতি মনোযোগ দেবে এবং খণ্ড ও অখণ্ড, শাখা ও মূল, মূর্ত ও বিমূর্ত বিষয়গুলোর যথার্থ রূপভেদ ব্যাখ্যা করবে। শুধু শাখা প্রশাখা নয়, মৌলিক উৎস থেকে এ ফিকাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ ধরণের ফিকাহর বিকাশ সহজ কাজ নয়। মানুষের ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন তথা কোনটি সঠিক, কোনটি ভুল তা বিচারের মানসিকতা গড়ে তোলার জন্যে আন্তরিক প্রয়াস, প্রচণ্ড ধৈর্য এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য দরকার।"[২৫৭]

৭.৫ শ্রেণী বৈষম্য ও অপচয়ের মুকাবিলা

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ও অন্যান্য আরও অনেক কারণে মুসলিমগণের মধ্যে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস, জীবনের অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতি সীমাতিরিক্ত

২৫৭. *ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

গুরুত্ব প্রদান, অপচয়, ফূর্তি, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ, অহংকার ও সাজ-সজ্জার জন্য বাহুল্য খরচের অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে গেছে। এ আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস প্রাচুর্য এবং লাগামহীন খরচের পাশাপাশি সেখানে দারিদ্র্য, অনাহার ও বস্ত্রের অভাবও বিদ্যমান। একজন মানুষ যখন বড় বড় শহরের দিকে চোখ তুলে তাকায় তখন তার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। সে দেখতে পায়, একদিকে সেসব মানুষ যাদের হাজারে বেজার নেই, প্রয়োজনাতিরিক্তি খাদ্য, বস্ত্র কোথায় রাখবে সে চিন্তায় ব্যস্ত, অপরদিকে তার দৃষ্টি এমন সব বেদুঈনের ওপরও পড়ে যাদের ঘরে এক বেলার খাবার নেই, পরনে নেই লজ্জা ঢাকার মত একখণ্ড বস্ত্র। মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতাসিন শাসকগোষ্ঠী যখন বায়ুবেগে ধাবমান মোটর যানে দীর্ঘ সফরে বের হয় ঠিক সে সময়ই হাড্ডিসার একদল শিশু চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় জীর্ণ শীর্ণ বস্ত্র পরিহিত, সেসব শিশু একটি পয়সার জন্য ওদের মোটরের পেছনে দৌড়াচ্ছে।

যতদিন মুসলিম দেশগুলোতে আকাশচুম্বী প্রাসাদ ও সর্বোত্তম মডেলের গাড়ির পাশাপাশি দীনহীন ঝুপড়ি, জীর্ণ-শীর্ণ বস্তি ও সংকীর্ণ পরিসরের অন্ধকারপূর্ণ কুটির চোখে পড়বে, যতদিন অনাহার ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট হাড় লিকলিকে মানুষের সারি একই শহরে দৃষ্টিগোচর হবে ততদিন পুঁজিবাদের জন্য দরজা উন্মুক্ত। হৈ-হাঙ্গামা, লড়াই-ঝগড়া তখন অবধারিতভাবে দেখা দেবেই। কোন প্রচার প্রোপাগান্ডা ও শক্তি প্রয়োগের দ্বারাই তাকে রোখা যাবেনা। সেখানে যদি ইসলামী জীবনাদর্শ তার সৌন্দর্য ও ভারসাম্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে আল্লাহর শাস্তি ও এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেখানে জুলুম ও নিপীড়নের রাজত্ব অবধারিতভাবে কায়েম হবেই।

৭.৬ ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন

ইসলাম এ কথা বলে যে, ধন-সম্পদের মালিক হওয়া ও পদমর্যাদা লাভ করা এবং খোদার প্রিয় পাত্র হওয়া এক জিনিস নয়। এ কথা ঠিক নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর সন্তুষ্ট যাদের মধ্যে এ দুটি পাওয়া যায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বোতভাবে নির্ভরশীল ঈমান ও আমলের ওপরে। একজন ধনসম্পদ ও পদ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও ঈমান ও আমলের বদৌলতে খোদার দৃষ্টিতে সম্মানিত বলে গণ্য এবং তার প্রিয় হতে পারে। অপরদিকে একজন অঢেল ধন-দৌলত ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করার পরেও তার অভিশপ্ত হতে পারে। কারণ দুনিয়াটা মানবের জন্য কর্মক্ষেত্র, প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। এখানে তাঁকে কাজ করে যেতে হবে। যার পূর্ণ প্রতিদান সে লাভ করবে আখিরাতে। এখানে কারো সচ্ছল হওয়া একথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ তার কাজ কর্মে খুশি, এবং এ কারণে সে তার প্রিয় পাত্র। কারো দুঃখ দারিদ্র্য এ কথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট। আব্বাস আলী খান বলেন, "অর্থের প্রাচুর্য হোক অথবা দারিদ্র্য হোক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক উচ্চ

মর্যাদা হোক অথবা অপমান ও লাঞ্ছনা হোক এ দুটি বিষয় বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষকে পরীক্ষা করার খোদায়ী আইনের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়া জীবনে মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করাই তার সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য। সৃষ্ট জগতের সমগ্র ব্যবস্থাপনা এ সত্যের সাক্ষ্য দান করে। যেহেতু এটি ছিল মানব জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়, সে জন্যে কুর'আন মাজীদে বারবার এ কথা স্মরণ করে দিয়েছে। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তাঁকে পরীক্ষা করার খোদায়ী আইনের ওপর বিস্তারিতভাবে ও বিভিন্নরূপে আলোকপাত করা হয়েছে।"[২৫৮]

কিন্তু জাহিলিয়াতের সৃষ্ট মানসিকতা তা মেনে নিতে পারেনি। জাহিলিয়াতের এ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সে মানসিকতা অবিচল থাকে যে, ধন সম্পদ ও পদমর্যাদা এবং খোদার সন্তোষ ও ভালোবাসা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে যতবড় ধন সম্পদ ও পদ মর্যাদার মালিক হবে, সে ততটা খোদার প্রিয় ব্যক্তি হবে। দারিদ্র্য ও পদ মর্যাদাহীনতা খোদার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ারই নিদর্শন। এ দৃষ্টি ভঙ্গির ভিত্তিতে সে সত্যকে সত্যের মাপ কাঠিতে বিচার করার পরিবর্তে ধন সম্পদ ও পদ মর্যাদার মাপকাঠিতে বিচার করবে। রাসূলুল্লাহ (স.) যখন তার নবুওয়াতের ঘোষণা করেন, তখন জাহিলিয়াতের মানস সন্তানেরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলে যে, তার মর্যাদা তাদের স্বরচিত মাপকাঠি অনুযায়ী ছিল না। তারা বারবার এ কথা বলতে থাকে, এমন অসাধারণ মর্যাদার রাসূল (স.) হতে হবে যেন আল্লাহ তা'আলার মহান সম্পর্কের সাথে তা সঙ্গতিশীল হয়। আর এমন অসাধারণ মানুষ যদি না হতো তবে অন্তত পক্ষে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি হতো, কোন কাওমের প্রধান হতো, কোন প্রসিদ্ধ গোত্রের সর্দার হতো এবং দৌলত পদ মর্যাদার মালিক হতো কিন্তু এখানে ব্যাপারখানা অন্য রকম। অতঃপর মক্কা বিজয়ের সে শুভ দিন যে বিপ্লব সংঘটিত করলো, তার ফলে তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রম দূর হয়ে গেল।

বর্তমানে এসে মুসলিম বিশ্বের জন্য জরুরী দিক নির্দেশ হলো, প্রতিটি দেশগুলো তাদের ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হবে। সেখানকার ব্যবসায়ীরা সে সব জিনিসই ব্যবহার করবে যা তাদের মাটিতে উৎপন্ন হয় এবং যেগুলো তাদের শিল্প ও শ্রমের ফসল। জীবনের প্রতিটি শাখা ও বিভাগে তারা পাশ্চাত্য থেকে মুক্ত স্বাধীন হবে। নিজের সব রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, শিল্পজাত সামগ্রী, খাদ্য-বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মেশিনারিজ সামরিক যন্ত্রপাতি কোন জিনিসের জন্য তারা যেন অন্যের কাছে হাত না পাতে এবং কোনভাবেই তাদের করুণা ভিখারী ও অনুগ্রহভোজী না হয়।

---

২৫৮. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৫), পৃ. ৫২

এ মুহূর্তে অবস্থা হলো, মুসলিম জাহান যদি কতগুলো অনিবার্য অবস্থানের দরুন পাশ্চাত্যের সঙ্গে যুদ্ধে নামতেই চায় তাহলে তারা এজন্যই যুদ্ধ করতে পারবে না, তারা তাদের কাছে ঋণী ও তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। যে কলমটি দিয়ে তারা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে সে কলমটিও কোন পাশ্চাত্য দেশেরই তৈরি। যদি তারা মুকাবিলা করতেই চায় তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে সে গুলিটাই ব্যবহার করবে যা পশ্চিমা দেশগুলোর কোন না কোন কারখানাতেই তৈরি। মুসলিম বিশ্বের নিমিত্ত এ এক বিরাট ট্রাজেডি, তারা তাদের সম্পদের বিপুলভাণ্ডার ও শক্তির উৎস থেকে পয়দা লাভ করতে পারে না। জীবনের রক্ত তাদের উপকৃত করার পরিবর্তে তাদেরই শিরা উপশিরা হয়ে অন্যের শরীরে গিয়ে তা পৌঁছে। তাদের সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ জোটে পাশ্চাত্যের এজেন্ট ও তাদের সেনাবাহিনীর অফিসারদের হাতে এবং সরকারের অপরাপর শাখা ও বিভাগ ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "মুসলিম জাহানের জন্য জরুরী হলো, তারা তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হবে। ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সংগঠন, আমদানি-রফতানি, জাতীয় শিল্প, সামরিক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি, সমরাস্ত্র তৈরির ব্যাপার সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে থাকবে। এমন সব লোকের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যারা হুকুমতের দায়িত্ব সামলাতে পারে এবং সরকারি দায়িত্ব পরিপূর্ণ জ্ঞান, বিষয়গত নৈপুণ্য, সততা, আমানতদারী ও কল্যাণ কামনার সঙ্গে সম্পাদন করবেন।"[২৫৯]

পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তাঁকে যথাযথ ব্যবহার করতে পারলেই আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন অসম্ভব কিছু নয়। নিজেদের সম্পদ দিয়ে আত্মনির্ভরশীলতা ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। এর জন্য শুধু প্রয়োজন উদ্যোগ ও পরিকল্পনা এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার। মুসলিম বিশ্বের সম্পদ জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও যথার্থ উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও উন্নত প্রযুক্তির অভাবে মুসলিম বিশ্ব পিছিয়ে আছে।

৭.৭ মুসলিম বিশ্বের পয়গাম

দুনিয়ার জন্য মুসলিম বিশ্বের কাছে এখনও নতুন পয়গাম এবং জীবনের নতুন আহ্বান আছে, আছে দাওয়াত। সে পয়গাম হলো যে বার্তা রাসূলুল্লাহ (স.) চৌদ্দশত বছর আগে তাকে সোপর্দ করেছিলেন। এ এক শক্তিশালী, সুস্পষ্ট ও আলোকজ্জ্বল পয়গাম যার চেয়ে অধিক ইনসাফপূর্ণ, সমুন্নত, শ্রেষ্ঠ ও বরকতময় পয়গাম এ সমগ্র সময় পর্বে আর কারো মুখ থেকে বিশ্ব শুনে নি। এ পয়গামে আজও একটি হরফের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কিংবা কম বেশি করার প্রয়োজন নেই। আজ একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর নিমিত্ত তা তেমনি নতুন, জীবন্ত ও উপযোগী যেমন ছিল খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীর জন্য।

---

২৫৯. *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

নিঃসন্দেহে আজ মানুষকে বিভিন্ন ধর্মের যুলুম নিপীড়ন ও বেইনসাফী থেকে ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারের দিকে টেনে আনার প্রয়োজন রয়েছে। এ উদার ও প্রগতির যুগে এমন অনেক ধর্মের সাক্ষাত মেলে যেসব ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস ও শিক্ষামালা খুবই হাস্যকর যা তার অনুসারীদের নির্বোধ ও চেতনাহীন পশুর মত জোয়ালে বেঁধে রেখেছে এবং তাদেরকে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করার অনুমতি দেয় না।

আজও মুসলিম বিশ্বের পয়গাম এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী ও একমাত্র তারই আনুগত্য এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী রাসূলদের নবুওয়াত ও রিসালাত, বিশেষত শেষ পয়গম্বর ও শ্রেষ্ঠতম রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুওয়াত ও রিসালাতের ওপর ঈমান আনয়ন এবং পরলৌকিক জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত জ্ঞাপন। এ দাওয়াত কবুলের পুরস্কার ও বিনিময় এ, যে অন্ধকারের মধ্যে সে শত শত বছর থেকে হাত-পা ছুঁড়ছে, এ বিশ্ব, সে ঘন ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর দিকে এসে যাবে তাঁরই মত মানুষের দাসত্ব ও গোলামী থেকে মুক্তি পেয়ে এক আল্লাহর বন্দেগী ও গোলামীরূপ মহামূল্যবান নেয়ামত পাবে, বিশ্বাসগত ও রাজনৈতিক ধর্ম সমূহের নিগড় থেকে নিস্কৃত পেয়ে সে প্রকৃতির ধর্ম, স্বভাব-ধর্ম ও শরীয়তে ইলাহীর ন্যায় ও ইনসাফের ছায়াতলে স্থান পাবে।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকটের আজ একটাই সমাধান আর তা হলো বিশ্বের নেতৃত্ব ও জীবনরূপী জাহাজের পরিচালন ভার ঐসব অপরাধী ও মানুষের রক্তে রঞ্জিত খুনিদের হাত থেকে বের করে যারা মানুষের এ কাফেলাকে ডুবিয়ে দেবার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ঐসব আমানতদার, দায়িত্বশীল ও আল্লাহ ভীরু অভিজ্ঞ মানুষগুলোর হাতে তুলে দেয়া যাদেরকে সৃষ্টির আদিতে এ বিশাল কাফেলা পরিচালনার জন্য বানানো হয়েছিল।"[২৬০] কার্যকর ও ফলপ্রসূ বিপ্লব কেবল এ দুনিয়ার পথ প্রদর্শন ও মানুষের নেতৃত্বভার জাহিলিয়াতের শিবির থেকে, যার মধ্যে রয়েছে বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া ও তাদের পদলেহী ও তল্পীবাহী প্রাচ্য ও এশিয়া জাতিগোষ্ঠীসমূহ এবং যার নেতৃতের বাগডোর রয়েছে আয়েশী ও বিলাশী পুঁজিবাদী ধনিক বনিক অপরাধী চক্রের হাতে, স্থানান্তরিত হয়ে সে উম্মাহর হাতে তা আসুক যার নেতৃত্বে রয়েছে মানবতার মহান নির্মাতা রহমতে আলম, সাইয়েদে বনী আদম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাতে এবং যাঁদের এ দুনিয়ার নবতর বিনির্মাণ ও মানবতার নব জাগরণের নিমিত্ত রয়েছেন সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট মূলনীতি ও শিক্ষামালা এবং যাদের ঈমান বর্তমান বিশ্বকে এ সময়কার জাহিলিয়াতের থেকে ঠিক সেভাবে বের করে আনতে পারেন যেভাবে তিনি বের করে এনেছেন চৌদ্দশত বছর আগে।

---

২৬০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২

৭.৮ প্রতিপক্ষের দিন শেষ হয়ে এসেছে

যে দেশে ইসলাম একদিন লাঞ্ছিত পদদলিত হয়েছিল, ইসলামের শেষ আলোক রেখাটুকুও একদা যে দেশের অন্ধকার আকাশের বুকে নিরবে তলিয়ে গিয়েছিল, যে দেশের মানুষের চেহারায় ও চলনে বলনে আল্লামা ইকবাল আজও মুসলিম ও আরবীয়দের স্মৃতিচিহ্ন অধ্যয়ন করতে পেরেছিলেন, ইসলামের সে আগ্রাসী শত্রু স্পেনে আজ আবার নতুন করে ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছে। পঞ্চদশ হিজরী শতকের ইসলামী বিশ্ব এটাই বোধ হয় সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর।

আজ থেকে কয়েক'শো বছর আগের গ্রানাডার শেষ শাসক আবু আবদুল্লাহর পতনের সাথে সাথেই স্পেন থেকে মুসলিমগণের শেষ চিহ্নও মুছে যায়। লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে পাইকারী হারে হত্যা এবং মুসলিম ছেলে ও মেয়েগণকে জোরপূর্বক খ্রিস্টান করার মাধ্যেম সে দেশ থেকে ইসলামকে পুরোপুরি বিদায় দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত স্পেনে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মসজিদ বন্ধ করে দিয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায় সেগুলোকে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে থাকে। এ সঙ্গে সারাদেশ ব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তুফান সৃষ্টি করা হয়।

কিন্তু সম্প্রতি স্পেন সরকার রাজধানী মাদ্রিদে 'ইসলামিক এ্যাসোসিয়েশন অব স্পেন' নামক ইসলামী সংগঠন কায়েম করার অনুমতি দিয়েছেন। এ এ্যাসোসিয়েশন স্পেনে ইসলাম প্রচার, বিভিন্ন শহরে ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ইসলাম বিরোধী অপপ্রচারের জবাব দান, স্থানীয় ও অস্থানীয় মুসলিমগণের সম্পর্ক জোরদার করার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই মাদ্রিদ, বার্সলোনা, গ্রানাডা, কর্ডোভা প্রভৃতি ১৩ টি বড় বড় শহরে ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে অমুসলিমগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এ সঙ্গে নওমুসলিমগণের দ্বীনি জীবন সংগঠনের কাজও।

বিগত অর্থ শতক থেকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। এ আন্দোলনের জন্য সারা বিশ্বে হাজার হাজার মর্দে মুজাহিদ তৈরী হয়েছে। তারা দ্বীনের জন্য অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করতে মোটেই কুণ্ঠিত হননি। কুর'আনের শাশ্বত বাণীকে সত্য প্রমাণ করে তারা আজো প্রাণ দিয়ে যাচ্ছেন।

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দুবার পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি সম্মান জনক রিযিক প্রস্তুত

রেখেছি।"[২৬১] ইসলামী বিশ্বের প্রায় সব দেশেই আজ এ প্রাণ উৎসর্গকারী দল তৈরি হয়ে গেছে। তারা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেই চলেছে। নিজেদের দেশে ইসলামী জীবন বিধান কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হবে না। এ অবস্থায় বিরোধী পক্ষ আজ যতই শক্তিশালী হোক না কেন একদিন তাদের ইস্পাতের তৈরি প্রাসাদও ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য হবে।

এ সঙ্গে আরেকটি বিষয়ও কম প্রণিধানযোগ্য নয়। সম্পর্কে আব্বাস আলী খান বলেন, "ইসলাম তার নিজের দেশে মযলুম হওয়া সত্ত্বেও অন্য দেশে আজ তার প্রভাব বেড়ে চলছে। যে দ্বীন ও জীবন বিধান নিজেকে বিস্তৃত ও প্রসারিত করার ক্ষমতা রাখে তার বিজয়কে আটকে রাখার ক্ষমতা কারোর নেই। প্রতিপক্ষের যুলুম, নির্যাতন ও মারমুখীতার প্রচণ্ডতা বৃদ্ধিই প্রমাণ করে যে, তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে।"[২৬২]

৭.৯ ইসলামের প্রতি হতে হবে নিষ্ঠাবান

ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গত চৌদ্দশত বছরের মধ্যে ইসলাম দুনিয়ার সব দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এর পরিসর বৃদ্ধি হতেই থেকেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.)-র আবির্ভাব কাল থেকে নিয়ে পরবর্তী একশ বছর পর্যন্ত এর গতি ছিল সবচাইতে দ্রুত। এ সময় মনে হচ্ছিল ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্য দুনিয়ার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

অর্থাৎ, "এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।"[২৬৩] ইসলাম একের পর এক এশিয়া ও আফ্রিকার বহুদেশ জয় করে নিয়েছে। হিজরী প্রথম শতকের মুসলিমরা ছিলেন কুর'আনের এ বক্তব্যের প্রতিমূর্তি। তারা নিজেরা ইসলামে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন এবং তার বিধানগুলো নিজেদের জীবনে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতেন। তারা একমাত্র আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে সমর্পণ করেছিলেন। মুসলিমরা যে দেশে প্রবেশ করেছে, তাদের ঈমান, আকীদা, চরিত্র, আচার-ব্যবহার, লেনদেন, কাজকর্মে মুগ্ধ হয়ে অমুসলিমরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আব্বাস আলী খান বলেন, "এখন বিশ্ব মুসলিম সমাজের এক বিরাট অংশ একমুখী হতে সক্ষম হয়েছে। একদিকে ইসলামের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং অন্যদিকে ব্যক্তি জীবন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আজকের বিশ্বের মুসলিমগণকে একটি

---

২৬১. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৩২
২৬২. *ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

২৬৩. আল-কুর'আন, ১১০ : ০২

শক্তিতে পরিণত করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিমগণের সংকল্পের দৃঢ়তা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিতে সক্ষম হচ্ছে। মুসলিমগণ যতই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ইসলামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ততই বিশ্ব মানবতা ইসলামকে নিজের ধর্ম মনে করতে সক্ষম হচ্ছে।"[২৬৪]

৭.১০ জাতিগতভাবে সুবিধাবাদ ত্যাগ করতে হবে

রাসূলুল্লাহ (স.) এর আগেও কোন কোন নবীকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেছিলেন। তারা দীর্ঘকাল আল্লাহর হুকুম ও বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন, সমাজ কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন এবং রাষ্ট্র শক্তির সহায়তায় মানবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি আল্লাহর আনুগত্যের প্রেরণা ও ভাবধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) কেও আল্লাহ তা'য়ালা রাষ্ট্র ক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং নবীর (স.) তিরোধানের পরও খোলাফায়ে রাশেদীন সে কাঠামোয় কোন প্রকার মৌলিক পরিবর্তন না করেই ৩০ বছর পর্যন্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গনকে নবুওয়াতের প্রতিষ্ঠিত পথে সুসজ্জিত করেছেন। খিলাফতে রাশিদার পর এ কাঠামোয় প্রথম মৌলিক পরিবর্তনের আভাস দেখা দিলে প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হয় নবীর (স.) পরিবার থেকেই। হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এ প্রতিবাদকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করার ও কিয়ামত পর্যন্ত একে জীবন্ত রাখার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেন। মোহররম মাসের দশ তারিখ হযরত ইমাম হুসাইনের প্রতিবাদ ও প্রাণ উৎসর্গের স্মৃতি নিয়ে আজো মুসলিমদের সামনে জ্বল জ্বল করেছে। সারা দুনিয়ায় মুসলিমগণ এ মাসটিকে শোকের মাস হিসেবে অনুভব করে আসছে। বিশ্বব্যাপী বিশাল উম্মতে মুসলিমার একি দুর্দিন! কোটি কোটি মানুষের শোক প্রকাশ করার জন্য তো ইমাম হুসাইন শাহাদাত বরণ করেননি। তিনি তো কোটি কোটি মানুষকে জাগাতে চেয়েছিলেন! কোটি কোটি মানুষের শোক প্রকাশ করার মানেই তো তারা বিষয়টির সত্যতা উপলব্ধি করেছেন এবং এর প্রতি নিজেদের সমর্থন জানিয়েছেন! এরপর তো এ বিশাল মানব গোষ্ঠীর চুপ করে বসে থাকা সাজে না।

ইমামের মতামত অর্থাৎ খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত বা নবুওয়াতের ধারায় খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করাই ছিল তাদের দায়িত্ব। ইমামের জন্য শোক প্রকাশ করতে তারা প্রস্তুত। কিন্তু ইমাম যে জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন সে জন্য নিছক শোক প্রকাশ না করে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে তারা প্রস্তুত নন। এটাকে এক ধরনের সুবিধা ছাড়া আর কি বলা যাতে পারে। এ ধরনের সুবিধাবাদী নীতি অবলম্বন করে একটি গোটা মিল্লাত কোন দিন দুনিয়ার বুকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্য বস্তু থেকে তো তারা দূরে থাকবেই উপরন্তু পার্থিব সাফল্য থেকেও তারা বঞ্চিত হবে। কাজেই

২৬৪. *ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

সুবিধাবাদ ত্যাগ করে দ্বীনি ও জাতিগত লক্ষ অর্জনের জন্য মিল্লাতকে আত্মোৎসর্গে ব্রতী হতে হবে।

৭.১১ অনৈসলামিক চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বিগত দু'শো বছরে মুসলিম দেশগুলোয় যে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তা মুসলিম বিশ্বের সবচাইতে বড় ক্ষতি সাধন করেছে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এ ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সর্বত্র একজোটে মুসলিমগণকে তাদের ধর্ম, ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছে যার ফলে মুসলিমগণের মাথায় খুলির মধ্যে গড়ে উঠেছে অমুসলিম মস্তিষ্ক। শিক্ষিত মুসলিম মানেই ইসলাম বিরোধী চিন্তার ধারক, ইসলাম বিরোধী চিন্তার সাথে আপোশকামী, ইসলাম বিরোধী চিন্তার প্রতি অনুরক্ত অথবা কমপক্ষে ইসলাম বিরোধী চিন্তার প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছে। আর শিক্ষিত মুসলিমগণের মধ্যে যারা ইসলামের ওপর এখনো প্রতিষ্ঠিত আছে, তাদের এ মনোভাব ও মনোবলের কারণ এ শিক্ষা নয়, অন্য কিছু।

ইউরোপের ঔপনিবেশিক প্রভুরা ইসলামকে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করেছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে তারা ইসলামের আগমনের পথ রোধ করেছে এবং এ জন্য মার্ক্সবাদের সাহায্য গ্রহণ করেছে। এমন কি ভারতীয় উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসক ইংরেজদের সুযোগ্য নাগরিক ভারতীয় কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত নেহরুও ভারতীয় মুসলিমগণের জন্য ইসলামের তুলনায় মার্ক্সবাদ বেশী ফলপ্রসূ বলে মনে করতেন। পণ্ডিতজী নিজে নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের মধ্যে মার্ক্সবাদের প্রসার পছন্দ করতেন না। কিন্তু মুসলিমগণের রোগের জন্য তিনি এটাকেই সবচেয়ে ভালো প্রতিশেধক মনে করতেন। তার মতে, "কুর'আন ও ইসলামের প্রতি মুসলিমগণের অবিচল ঈমান তাদের ইন্ডিয়ান ডোমিনিয়ানকে গভীরভাবে ভালবাসার পথে একটি বড় বাধা। কুর'আন ও ইসলামের প্রতি মুসলিমগণের ঈমানে চিড় ধরাতে না পারলে তারা "ভারত মাতাকে" গভীরভাবে ভালবাসতে পারবে না। আর তাদের এ ঈমানে চিড় ধরাবার ক্ষমতা একমাত্র সমাজতন্ত্র ও মার্ক্সবাদের করায়ত্ত। পণ্ডিত তাঁর আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।"[২৬৫] তবে এ ক্ষেত্রে যে কাজগুলো করা দরকার তা হলো,

এক. মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। ইসলামী চিন্তার সাথে সংঘর্ষশীল চিন্তা ও ভাবধারা থেকে পাঠ্যপুস্তক গুলো মুক্ত করতে হবে।

---

২৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫

দুই. দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোকে একদিকে ইসলামী ভাবধারা ও মতাদর্শ বিরোধী প্রচারণামুক্ত করতে হবে এবং অন্যদিকে ইতিবাচক প্রচারণার দৃষ্টিতে এ মাধ্যমগুলোকে গড়ে তুলতে হবে।

তিন. অভাব, দারিদ্র্য, দুর্নীতি দূর করার ও চারিত্রিক বিপর্যয়রোধ করার জন্য দেশে ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।

৭.১২ ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ

ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে এমন অগ্রদূত বাহিনী প্রয়োজন যারা এ পথের সমস্ত কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করবেন। এ অগ্রদূত বাহিনীকে অনুধাবন ও বিশ্বাস করতে হবে যে, যারা মানবতাকে মুক্তি দেয়ার জন্য আত্মপ্রকাশ করেছেন তারা আর সব সাধারণ মানুষের মতো নন। বরং তাঁরা হলেন বিশেষ দৃষ্টান্তমূলক দল, যারা বিশ্বাসের পথে, সত্যের পথে, দ্বীনের পথে ও দাওয়াতের পথে সবকিছুকে তুচ্ছ করে সামনে এগিয়ে যাবেন। তাঁদের ভেতর অবশ্যই কিছু গুণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে হবে। এই সম্পর্কে শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (র.) নিম্নোক্ত গুণগুলো"[২৬৬] সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন:

এক. তাঁরা হবেন রব্বানি-আল্লাহভীরু ও আল্লাহর সাধক। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে বলেছেন,

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ

অর্থাৎ, "কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও'–এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।"[২৬৭]

অবশ্যই এ দ্বীনের অগ্রপথিককে রব্বানি হতে হবে। আন্দোলন ও দাওয়াত, পথ ও পদ্ধতি, ধৈর্য ও জ্ঞান ও আমলে-সব ক্ষেত্রেই তিনি হবে রব্বানি। অর্থাৎ, তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হবেন না যে, আল্লাহই সর্বশক্তিমান, তিনি সবকিছুর ওপর শক্তি রাখেন; আল্লাহ

২৬৬. শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (র.), *আগামী দিনের পৃথিবী* (ঢাকা: মাকতাবাতুল ইসলাম, ২০১৬), পৃ. ৭৭

২৬৭. আল-কুর'আন, ৩ : ৭৯

তাআলাই সম্মান ও মর্যাদার উৎস; আল্লাহই তাঁর জন্য যথেষ্ট, তাঁকে রক্ষাকারী, আল্লাহই তাঁকে হেফাযতে রাখবেন ও তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

দুই. দাওয়াতের পথে তাকে পার্থিব উপকার গ্রহণ এবং এর তাৎক্ষণিক ও নিকটতম ফল লাভ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কারণ, যত নবী এসেছেন সবাই ঘোষণা করেছেন:

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ, "আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন।"[২৬৮]

তিন. সত্য ও প্রকৃত জ্ঞান এবং একনিষ্ঠ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর পথের আহ্বানকারীগণের নিজেদের নির্মাণ করা।

চার. সংহত ও ঐক্যবদ্ধ দল গঠন করা: দৃষ্টান্তমূলক মানবশ্রেণী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মনোযোগ প্রদান করা আবশ্যক। কারণ, দৃষ্টান্তমূলক ও অনন্যসাধারণ মানবমণ্ডলীর কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানবজাতির পরিবর্তন ঘটে। মুসলিমদেরকে 'গুণ' ও 'বৈশিষ্ট্য' বিবেচনা করতে হবে, সংখ্যা নয়। ধৈর্যশীল ও সত্যনিষ্ঠ একটি দল, তারা সংখ্যায় ক্ষুদ্র হলেও, অবশ্যই আল্লাহর অনুগ্রহে বিজয় ও সফলতা লাভ করবে।

৭.১৩ নবতর ঈমান

কিন্তু এ মহান দায়িত্ব ও কর্ম সম্পাদনের জন্য মুসলিম বিশ্বকে আত্ম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োজন দেখা দিবে তার নিজের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টির। প্রথম প্রস্তুতি হবে এ, মুসলিম বিশ্ব ইসলামের ওপর নতুন ও জীবন্ত ঈমান আনবে। মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন ধর্ম, নতুন জীবন দর্শন, নতুন পয়গম্বর, নতুন শরীয়ত ও নতুন তালিম বা শিক্ষামালার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। ইসলাম চির শাশ্বত। সেতো সূর্যের মতো, না কখনো পুরনো ছিল আর না সে এখনো পুরনো। রাসূলুল্লাহ (স.)–এর নবুওয়াত চিরস্থায়ী এবং আখেরী নবুওয়াত তার আনীত দ্বীন সুরক্ষিত এবং তার প্রদত্ত শিক্ষামালাও জীবিত ও জীবন্ত। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই, মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন ঈমানের আবশ্যক। নতুন ফেতনা, নতুন শক্তি, নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রেরণা ও নতুন আহ্বান মোকাবেলা কম জোর ঈমান ও কেবল রসম রেওয়াজ ও আচার অভ্যাস দিয়ে করা যাবে না। কোন জরাজীর্ণ ও দশা প্রাপ্ত প্রাসাদ নতুন সাইক্লোন ও নতুন কোন প্লাবনের ধাক্কা সইতে পারে না। অতঃপর যারা এর আহ্বায়ক হবেন, হবেন দাঈ তাদের জন্য অপরিহার্য হলো, তাঁকে তার আহ্বান তথা দাওয়াতের ওপর অটল ও স্থির প্রত্যয় থাকতে হবে। তার ভিতর এমন এক জন মানুষের জোশ থাকবে যিনি

২৬৮. আল-কুর'আন, ২৬ : ১৪৫

কোন নতুন আকীদা-বিশ্বাসের ওপর নতুন ঈমান এনেছেন। এমন এক মানুষের হাসিখুশি ও আনন্দ থাকবে যিনি কোন নতুন ধনভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন কিংবা নতুন দেশ আবিষ্কার করেছেন। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "মুসলিম বিশ্ব যদি মনুষ্য জগতে নবতর রূপ ও নতুন জীবন সৃষ্টি করতে চায় এবং দুনিয়ার বর্তমানের বস্তুবাদিতা এবং সন্দেহ-সংশয় ও অস্থিরতার উপর জয়লাভ করতে চায় তাহলে তাঁকে তার ভিতর নতুন ঈমানী রুহ, জীবন্ত ইয়াকীন ও নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে।"[২৬৯]

৭.১৪ অর্থপূর্ণ প্রস্তুতি

মুসলিম বিশ্বকে এ পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম বিশ্ব তার প্রতিপক্ষের ওপর কেবল সে ক্ষেত্রেই প্রাধান্য ও বিজয় লাভ করতে পারে যখন সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবে, জীবনের প্রতি ভালবাসা যখন তার অন্তর থেকে বেরিয়ে যাবে, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার শেকল থেকে মুক্ত হবে, তার লোকেরা শাহাদাতের প্রতি লোভাতুর হবে, জান্নাতের প্রতি আগ্রহ তার অন্তরের গভীরে দোলা দিতে থাকবে, দুনিয়ার নশ্বর ধন সম্পদ তার দৃষ্টিতে আদৌ কোন গুরুত্ব বহন করবে না, আল্লাহর রাস্তায় দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, বিপদ-আপদ ও বালা মুসিবত হাসি মুখে বরদাশত করবে। বাস্তবে এগুলোই হল আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ ও অপরিচিতের মুকাবিলায় মুমিনের হাতিয়ার আর এটাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত ঘটনা হল, মুমিনের শক্তি, প্রতিপক্ষের উপর বিজয় ও প্রাধান্য লাভের পেছনে মূল রহস্য হল, পারলৌকিক জীবনের প্রতি সুদৃঢ় প্রত্যয় ও আল্লাহর কাছে থেকে বিনিময় ও সওয়াব প্রাপ্তির প্রত্যাশা। যদি মুসলিম বিশ্বের সামনেও সেসব পার্থিব ও জাগতিক উদ্দেশ্য ও বস্তুগত স্বার্থই কাঙ্ক্ষিত হয় এবং সেও যদি কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বস্তুগত উপকরণাদির কেন্দ্রজালে বন্দি হয়ে পড়ে তাহলে ইউরোপের তার বস্তুগত শক্তি, কয়েক শতাব্দির প্রস্তুতি ও বিপুল বিস্তৃত সাজ সরঞ্জামের ভিত্তিতে বিজয় লাভ ও ক্ষমতা অর্জনের অধিকার বেশী থাকবে।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "আজ মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এবং তার দল ও সরকারগুলোকে যা করতে হবে তা হল এই, মুসলিমদের হৃদয় রাজ্যে ঈমানের বীজ দ্বিতীয় বারের মত বপন করতে হবে, বপনের প্রয়াস চালাতে হবে, তাদের ধর্মীয় জোশ-জযবা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা পুনরায় সক্রিয় ও গতিশীল করতে হবে এবং প্রাথমিক যুগে ইসলামের দাওয়াতের মূলনীতি ও কর্মপন্থা মোতাবেক মুসলিমগণকে ঈমানের দাওয়াত দিতে হবে এবং আল্লাহর, তদীয় রাসুল ও পারলৌকিক জীবনের আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি সমগ্র শক্তি দিয়ে পুনর্বার তাবলিগ ও তালকিন করতে হবে, শেখাতে হবে এবং প্রচার

---

২৬৯. *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

চালাতে হবে।"[২৭০] এজন্য সে সব পন্থা কাজে লাগাতে হবে যেসব পন্থা ইসলামের প্রথম দিককার দায়ীগণ গ্রহণ করেছিলেন। অধিকন্তু সে সমস্ত উপায়-উপকরণ ও শক্তি কাজে লাগাতে হবে যা বর্তমান যুগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

৭.১৫ চেতনা বোধের প্রশিক্ষণ

কোন জাতির জন্য সর্বাধিক বিপজ্জনক বিষয় হল, সে জাতি সঠিক জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনাবোধ থেকে মুক্ত। এমন একটি জাতি, যে সর্বপ্রকার যোগ্যতা ও সামর্থ্যের অধিকারী এবং যে ধর্মীয় ও জাগতিক সম্পদ দ্বারা সম্পদশালী, কিন্তু সে ভাল-মন্দ ও পাপ-পুণ্য এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, যে দোস্ত-দুশমন চেনে না, পেছনের অভিজ্ঞতা থেকে ফায়দালাভের সামর্থ্য তার ভিতর নেয়, নেতাদের কর্মকাণ্ডের হিসেব গ্রহণ ও খতিয়ান নেবার এবং জাতীয় অপরাধীদের শাস্তি দেবার তার ভেতর সাহস নেয়, যারা স্বার্থপর নেতাদের মৃদু মোলায়েম ও মিষ্টি কথায় অভিভূত হয়ে যায় এবং প্রতিবার নতুন করে ধোঁকা খাওয়ার ও প্রতারিত হবার জন্য তৈরি থাকে, সে জাতি তার যাবতীয় ধর্মীয় উন্নতি-অগ্রগতি ও পার্থিব সাফল্য সত্ত্বেও আস্থাযোগ্য নয়। মুসলিম দেশগুলো সম্পর্কে যদি একথা বলতে নাও চাইতে হয়, তারা জাগ্রত ও সচেতন নয়, তাদের বোধ বুদ্ধি ও চেতনা বোধ খুবই দুর্বল এবং তারা চেতনার একেবারে প্রাথমিক স্তরে অবস্থান করছে।

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "মুসলিম বিশ্বের এক বিরাট বড় প্রয়োজন এবং তার এক বিরাট বড় খেদমত হলো, উম্মাহর বিভিন্ন শ্রেণী ও জনগণের মাঝে শক্তি চেতনা সৃষ্টি করা এবং সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ভিত্তিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর আধিক্যের দ্বারা এটা বুঝায় না, জাতির মধ্যে চেতনা বোধও বিদ্যমান। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই, সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার দ্বারা চেতনা বোধ ও জাগ্রত করতে বিরাট সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু চেতনাবোধ সৃষ্টি করার জন্য সাধারণভাবে স্থায়ী চেষ্টা-সাধনা ও প্রয়াস চালানো আবশ্যক।"[২৭১]

এ ইসলামি চেতনার একটি দৃষ্টান্ত হল, ইসলামের দাওয়াত ও রাসুলুল্লাহ (স.) এর প্রশিক্ষণ ও সাহচর্য দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের মন-মস্তিস্কে একথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, যুলুম এক নিকৃষ্ট জিনিস এবং তা ধর্মীয় ও নৈতিক অপরাধ যে কারোর জন্যই জায়েয নয় এবং এর ওপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, একজন মুসলিমকে সকলের সঙ্গে ইনসাফ করা উচিত,

---

২৭০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭
২৭১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২২

চাই সে কাছের হোক অথবা দূরের, আপন হোক অথবা পর, দোস্ত অথবা দুশমন পরিচিত অথবা অপরিচিত।

এজন্য মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় খেদমত হলো, তার ভেতর সঠিক ও সহীহ শুদ্ধ চেতনাবোধ সৃষ্টি করা, এমন চেতনা যা কোন রকমের যুলুম ও বেইনসাফি বরদাশত করে না, ধর্ম ও নৈতিকতার বিকৃতি সহ্য করে না, যা সহীহ শুদ্ধ ও ভুল-ভ্রান্তি, কপটতা, দোস্ত-দুশমন তথা শত্রু মিত্র, শান্তিকামী ও অশান্তি সৃষ্টির মধ্যে খুব সহজেই পৃথক করতে পারে, অপরাধী ও অন্যায়কারী যেন তার অসন্তুশ ও ক্রোধের হাত থেকে বাচতে না পারে, এবং অকপট ও নিষ্ঠাবান মানুষ যেন তার উপযুক্ত কদর ও স্বীকৃতি পাওয়া থেকে মাহরুম না হয়। সে যেন তার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যা-সংকট ও বিষয়াদির ক্ষেত্রে একজন বুদ্ধিমান ও পূর্ণবয়স্ক মানুষের মত গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতে পারে এবং ফয়সালা করার সামর্থ্য রাখে। যতদিন এ চেতনাবোধের উন্মেষ না ঘটবে, কোন মুসলিম দেশ ও জাতির কর্ম প্রেরণা, কাজের সামর্থ্য ও জগ্যত, ধর্মীয় আবেগ ও মাযহাবি জীবনের প্রদর্শনী ও দৃশ্যাবলী খুব বেশি একটা গুরুত্ব বহন করে না।

৭.১৬ মুসলিম জাতির ঐক্যকে আরো জোরদার

ইসলাম বলে সকল মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

অর্থাৎ, "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।"[২৭২]

যেহেতু সকল মানুষের মূল এক এবং সকলে পরস্পরে একই পরিবারে সদস্যের ন্যায়, সে জন্য বংশ, গোত্র, বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে কেউ উঁচু ও নিচু অথবা কুলীন ও অকুলীন হতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার এ বর্ণ, বংশ, দেশ ও জাতীয়তার ভিত্তিতে কারো ওপরে কারো শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে না। এর কোনটিই গর্ব অহংকারের কোন কারণ হতে পারে না। এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে রাসূলুল্লাহ (স.) সকল মানুষকে আদমের সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২৭২. আল-কুর'আন, ৩ : ১

নবীর এ বিপ্লবী ঘোষণা কোন খেয়ালী মতবাদ অথবা সুবিধাবাদ প্রসূত ছিল না। বরঞ্চ দৃপ্তকণ্ঠে একটি ঈমান ও আকিদার ঘোষণা ছিল। এমন সময়ের ঘোষণা যখন আরব অনারব নির্বিশেষে মানুষকে বর্ণ, বংশ ও গোত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে নিজেদেরকে অপর থেকে অতি উচ্চ ও অভিজাত মনে করত এবং তাদের কাছে অপরের জান মালের কোন মূল্যই ছিল না। বংশীয় আভিজাত্যের গর্বে যারা গর্বিত ছিল, যারা অপরকে দাসানুদাস বানিয়ে রেখে তাদের রক্ত পানি করা শ্রমের বদৌলতে নিজেদের ভাগ্য গড়েছিল তারা এ বিপ্লবী ঘোষণা মেনে নিতে পারে কি করে? কিন্তু জাহিলিয়াতের অন্ধ আবেগে যারা সদা বিভ্রান্ত ছিলো না, যাঁদের মধ্যে সামান্য বিবেক ও বুদ্ধিমত্তা ছিলো, তারা এ বিপ্লবী ঘোষণার মধ্যে উপলব্ধি করলো মানব জাতির ঐক্য এবং মানবতার প্রকৃত মর্যাদা। আর ইসলামই মানবতার এহেন মর্যাদার একমাত্র ধারক ও বাহক।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অনৈক্য ও বিভেদ ভূলে মুসলিম ঐক্যকে জোরদার করা আবশ্যক। সমস্ত বিভেদ সৃষ্টিকারী বিষয়কে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঐক্য ও সংহতিকে জোরদার করতে হবে। এম. এ সাঈদ বলেন, মুসলিম বিশ্বের পতনের অন্যতম কারণ অনৈক্য ও বিভেদ। এর সুযোগ নিচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের দুশমনেরা। অনৈক্য ও বিভেদের কারণে একশ পঁচিশ কোটি মুসলিম ও অর্ধশতাধিক মুসলিম দেশ ঐক্যবদ্ধ কোন ভূমিকা পালন করতে পারছে না।"[২৭৩] যদি মুসলিমগণ সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ হতে পারত তারা আজ এত লাঞ্ছিত, অপমানিত হতো না। তাই মুসলিম বিশ্বের ঐক্য একান্ত প্রয়োজন।

৭.১৭ স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তি পূজার অবকাশ নেই

ইসলামে আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতার কোন সুযোগ কিংবা অবকাশ নেই। তার ভিতর ব্যক্তিগত প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা খান্দানী শ্রেষ্ঠত্ব বিস্তারের ও স্বার্থপরতার পা রাখার জায়গা নেই যা আজ কোন কোন প্রাচ্য জাতিগোষ্ঠী ও মুসলিম দেশের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে সে ব্যাপক বিস্তৃত ও সুসংবদ্ধ স্বার্থপরতারও কোন জায়গা নেই যা আজ ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ায় দেখা যাচ্ছে। ইউরোপে এর রূপ ও আকৃতি একটি পার্টি ও দলের ক্ষমতা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে এবং আমেরিকার পুঁজিবাদের অবয়বের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত আর রাশিয়ার তা সে ছোট্ট দলের আকৃতিতে সামনে এসে হাজির হয় যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাসী। তা অধিকাংশ মানুষের ওপর যবরদস্তি পূর্বক জেঁকে বসে আছে এবং কৃষক, শ্রমিক ও কয়েদীদের সঙ্গে এমন নির্মম, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন আচরণ করে যার উদাহরণ ইতিহাসে মেলা ভার।

---

২৭৩. *আত তারীখুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

এ আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতা তার সকল আকার-আকৃতি নিয়ে নির্মূল ও নিঃশেষ হবেই। আহত মানবতা এর নির্মম প্রতিশোধ নেবেই। দুনিয়ার ভবিষ্যত ইনসাফ পছন্দ, রহম দিল, ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামের সঙ্গে জড়িত। তা স্বার্থপরতা ও আত্মসর্বস্বতা যদি আরও কিছু কালের অবকাশ পেয়েও যায় তাতেও অবস্থার হেরফের হবে না, চাই কি এর লাগাম কিছুটা ঢিলাও দেখতে হয় এবং বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ, গোমরাহী ও সীমালংঘনের মাঝে আরও কিছু দিন অতিবাহিত করার সুযোগ তার মিলেও যায়।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা তা সে ব্যক্তিগত হোক অথবা খান্দানী ও পারিবারিক, দলীয় হোক অথবা শ্রেণীতে, জাতির জীবনে এক অস্বাভাবিক জিনিস যার হাত থেকে জাতিকে প্রথম সুযোগেই মুক্তি পেতে হবে। ইসলামে এর কোন স্থান নেই, স্থান নেই সে সমাজেও যে সমাজ সাবালকত্বে ও ভালমন্দ চেনার বয়সে পৌছে গেছে। মুসলিমগণের জন্য, আরবদের জন্য এবং তাদের নেতৃবন্দ ও শাসকদের জন্য এটাই ভাল হবে, তারা এর থেকে মুক্ত হবে, স্বাধীন হবে এবং তারা এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আর তা এর সাথে ডুবে মরার আগেই।"[২৭৪]

প্রাচ্যেও আজ সংকীর্ণ দৃষ্টির রাজত্ব চলছে। এর বিদায় নেবার পালা এসে গেছে। তার সৌভাগ্য তারকা অস্তমিত হওয়া শুরু হয়ে গেছে। এটা একটা যুগের সমস্যা, যা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ একটা স্কুল অব থটের সমস্যা, যার মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গেছে। যারা এখনও এর আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে বেঁচে রয়েছে তাদের এটা বোঝা দরকার, এ জাহাজ এখন ডুবতে বসেছে!

৭.১৮ জিহাদ ও ইজতিহাদের ঝাণ্ডাকে সমুন্নতকরণ

আধুনিক সমস্যার যথাযত উপলব্ধি এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ আজকের সময়ের দাবি, নিরেট বস্তুতান্ত্রিকতার ক্রোড়ে লালিত এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি এসে আমাদের ওপর চেপে বসেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভ্রান্তি থেকে মানবজাতিকে মুক্তির পথে পরিচালিত করতে হলে মুসলিমদের জিহাদি ও ইজতিহাদি শক্তিকে উজ্জীবিত করতে হবে। যেসব কার্যকরী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বাস্তব প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে পাশ্চাত্য জাতিগুলো বস্তুগত উন্নতি লাভ করেছে ইজতেহাদি শক্তি দ্বারা সেগুলোকে আয়ত্তাধীন করে ইসলামি নীতির আলোকে তা যথাযত প্রয়োগ করতে হবে।

৭.১৯ জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তি ও সামরিক প্রস্তুতি

এক সময়ের জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক বাহক মুসলিম বিশ্বকে পুনরায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অবশ্যই মুসলিমগণের রপ্ত করতে হবে। পশ্চিমা

২৭৪. *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

সাম্রাজ্যবাদের সর্বগ্রাসী থাবা থেকে আত্মরক্ষা এবং মুসলিম বিশ্বের উত্থানের জন্য প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন। এম.এ সাঈদ বলেন, "মুসলিমগণের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে অনীহা রয়েছে। এ মানসিকতা পরিহার করে নিজেদের যাবতীয় সম্পদ কাজে লাগাতে ও আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি মুসলিমগণের অবশ্যই অর্জন করতে হবে।"[২৭৫]

মুসলিম বিশ্বের কাজ এখানেই শেষ হচ্ছে না। যদি তার ইসলামের পয়গাম প্রচারের আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং সে যদি দুনিয়ার নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শনের অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করতে চায় তাহলে তাকে শক্তি ও প্রশিক্ষণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমরশাস্ত্রে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিতে হবে। তাকে জীবনের প্রতিটি শাখায়, প্রতিটি বিভাগে ও নিজের প্রতিটি প্রয়োজনে পাশ্চাত্যের হাত থেকে মুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে এবং তা এ পর্যায়ের হতে হবে, নিজের পরিধানের বস্ত্র ও জীবন ধারণের খাদ্যে সে যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। নিজেদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র যেন সে নিজেই তৈরি করতে পারে। নিজেদের জীবনের যাবতীয় ব্যাপারের এন্তেজাম সে যেন নিজেই করতে পারে এবং তা যেন নিজেদের হাতেই থাকে।

নিজেদের যমিনের বুকে লুকায়িত খনিজ সম্পদ নিজেরাই যেন উত্তোলন করতে পারে এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারে। নিজেদের সরকার নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের লোক দিয়েই যেন পরিচালনা করে। তার চতুর্দিকে বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রগুলোতে তাদেরই সামুদ্রিক জাহাজ ও নৌবহর যেন বিচরণ করে। শত্রুর মুকাবিলা নিজেদের ডকইয়ার্ডে নির্মিত যুদ্ধ জাহাজ, কামান অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে করবে। তাদের আমদানীর চেয়ে রফতানী যেন বেশি হয় এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলোর কাছে ঋণ গ্রহণের জন্য যেন হাত পাততে না হয় আর তাদের কারোর পতাকাতলে যেন না যেতে হয় এবং কোন ব্লক কিংবা শিবিরে যোগ দিতে যেন বাধ্য না হয়।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "যতদিন পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, রাজনীতি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী থাকবে পাশ্চাত্য তাদের রক্ত শোষণ করতে থাকবে, তাদেরই ভূখণ্ডের জীবনী-শক্তি তারা বের করে নেবে, তাদের ব্যবসা-উপকরণ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রতিদিন মুসলিম দেশগুলোর বাজার ও পকেটগুলোতে হানা দিতে থাকবে এবং নিজেদের সরকার চালাতে, গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পূরণ করতে, নিজেদের সেনা বাহিনীকে ট্রেনিং দিতে পাশ্চাত্যের লোকগুলোর দ্বারস্থ হতে থাকবে, সেখানকার বাণিজ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি চাইতে থাকবে, তাদেরকে নিজেদের অভিভাবক,

---

২৭৫. *আত তারীখুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

উস্তাদ, মুরুব্বী, শাসক ও সর্দার মনে করবে, তাদের নির্দেশ ও তাদের মতামত ছাড়া কোন কাজ করবে না ততদিন পর্যন্ত তারা পাশ্চাত্যের মুকাবিলা করা তো দূরের কথা, তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কোথাও বলতে পারবে না।"[২৭৬]

এ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-প্রযুক্তি ছিল জীবনের সে শাখা যে সম্পর্কে মুসলিম বিশ্ব অতীতে অলসতা ও গাফলতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল যার শাস্তি হিসেবে তাকে দীর্ঘ ও অবমাননাকর জীবনের স্বাদ ভোগ করতে হয় এবং তার ওপর পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়া হয় যারা পৃথিবীর বুকে ধ্বংস ও বরবাদী, হত্যা, খুন-খারাবী ও আত্ম-হত্যার রাজত্ব কায়েম করে। এখন আবার এ সময়ও যদি মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প- প্রযুক্তির আবিষ্কার-উদ্ভাবনে ও নিজেদের ব্যাপারগুলোতে স্বাধীনতা সম্পর্কে গাফলতির আশ্রয় নেয়। এবারও যদি তার দ্বারা এ ভুল সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার ভাগ্যে দুর্ভাগ্য লিখে দেয়া হবে এবং মানবতার পরীক্ষার মুদ্দতকাল আরও দীর্ঘ হয়ে যাবে।

৭.২০ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন

মুসলিম উম্মাহর জন্য অন্যতম প্রধান ইস্যু হলো শিক্ষা। এ বিষয়টিকে মুসলিমদের অতন্তে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। Islamization of Knowledge এর লেখক ড. ইসমাইল রাজি আল ফারুকির দৃষ্টিতে শিক্ষা উম্মাহর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। আমেরিকান ডিক্টেটরশীপ, আমেরিকান চ্যালেঞ্জ, পশ্চিমাদের চ্যালেঞ্জ করতে হলে মুসলিম বিশ্বকে একটি ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা দাঁড় করাতে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আমেরিকা ও পশ্চিমাদের চ্যালেঞ্জ, সেটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক যেটিই হোক, এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য মুসলিম বিশ্বের ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা করা দরকার। সভ্যতার দ্বন্দ্বে ইসলাম জয়ী হবে, নামে হোক বা বেনামে হোক, যদি ভালো শিক্ষাব্যবস্থা এবং ভালো শিক্ষিত জনশক্তি থাকে। কিংবা যদি মুসলিম বিশ্ব তা গড়তে পারে, তবেই তা সম্ভবপর হবে বলে আশা করা যায়।

মুসলিম বিশ্বের জন্য জরুরী হলো, শিক্ষা ব্যবস্থা এভাবে নতুন করে ঢেলে সাজানো যা হবে তার রুহ ও তার পয়গামের সঙ্গে সঙ্গতিশীল। মুসলিম বিশ্ব প্রাচীন পৃথিবীর ওপর তার জ্ঞানগত নেতৃত্ব কায়েম করেছিল এবং দুনিয়ার বুদ্ধিবৃত্তি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি (কালচার) র–অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল। সে দুনিয়ার সাহিত্য ও দর্শনের হৃৎপিণ্ডে তার বাসা বানিয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী সভ্য দুনিয়া তার বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করেছে, তার কলম দিয়ে লিখেছে এবং তারই ভাষায় লেখালেখি করেছে, গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে। এরপর ইউরোপের উন্নতি ও উত্থানের যুগ এল। দুনিয়া দ্বিতীয়বার এ শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে

---

২৭৬. *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

আত্মসমর্পণ করল এবং মুসলিম বিশ্বকেও স্বাভাবিকভাবেই এর সামনে মস্তক অবনত করতে হলো যারা দীর্ঘকাল থেকে জ্ঞানগত অধঃপতন ও চিন্তার জগতে জড়তা ও স্থবিরতার শিকার ছিল এবং হীনমন্যতা বোধের কারণে নিজেদের মুক্তি কেবল ইউরোপের অন্ধ অনুকরণের মধ্যেই নিহিত বলে মনে করত। সে এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার যাবতীয় দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও কবুল করে নেয় এবং সে শিক্ষা ব্যবস্থাই আজ মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে জেঁকে বসে আছে।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "বর্তমানে এসে মুসলিম বিশ্ব যদি তার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে চায় এবং যদি মুসলিম বিশ্বের ইচ্ছা থাকে, সে নতুনভাবে আবার গোড়া থেকে তার জীবন শুরু করবে এবং অন্যদের গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করবে, যদি সে বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করতে চায় তাহলে কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বশাসিত ও স্বায়ত্তশাসিত হলেই চলবে না, তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব নিতে হবে এবং এটা খুবই জরুরী আর এ খুব সহজও নয়। এ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখার ও চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপকভাবে বই-পুস্তক রচনা করা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ময়দানে নতুনভাবে কাজ শুরু করা। এ কাজে যারা নেতৃত্ব দেবেন তারা সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে এতটাই ওয়াকিফহাল হবেন এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হবেন যা গবেষণা ও সমালোচনার স্তরে গিয়ে পৌছে এবং এরই সাথে সাথে ইসলামের মূল উৎস থেকে পরিপূর্ণ প্লাবিত ও ইসলামী রূহ তথা প্রাণসত্তা দ্বারা তার দিল দৃষ্টিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হবে।"[২৭৭]

এটা সে অভিযান যার পরিপূর্ণতা কোন দল কিংবা সংগঠনের জন্য কঠিন হবে। এ কাজ ইসলামী হুকমতের, মুসলিমদের সরকারের। এ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য তাকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খলদল ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে হবে এবং এমন সব বিশেষজ্ঞ বাছাই করতে হবে যারা প্রতিটি বিষয়ে অভিজ্ঞ। এমন শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস তৈরি করতে হবে যা একদিকে যেমন কুর'আন-সুন্নাহর অটুট বিধান ও ধর্মের অপরিবর্তনীয় হাকীকত সম্বলিত হবে, অপর দিকে কল্যাণকর সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এসবের বিশ্লেষণ, পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন অংশের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে হবে পরিবেষ্টনকারী। তারা মুসলিম তরুণ ও যুবকদের নিমিত্ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে একেবারে গোড়া থেকে বিন্যস্ত করবেন যা হবে ইসলামের মূলনীতি ও ইসলামী প্রাণসত্তার বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে এমন সব জিনিস থাকবে যা হবে যুবক শ্রেণীর জন্য জরুরী, যা দিয়ে তারা নিজেদের জীবনকে সংগঠিত করতে পারে এবং নিজেদের নিরাপত্তার হেফাজত করতে পারে। তারা পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হবে না, বরং তারা হবে আত্মনির্ভরশীল। তারা বস্তুগত ও মেধার

২৭৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬

যুদ্ধে পাশ্চাত্যের মুকাবিলায় যেন দাঁড়াতে পারে। তারা নিজেদের মাটির তলে লুক্কায়িত খনিজ সম্পদ থেকে যেন উপকৃত হতে পারে এবং নিজেদের দেশের সম্পদ কাজে লাগাতে পারে, ব্যবহারে আনতে পারে। তারা মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতি নতুনভাবে ঢেলে সাজাবেন এবং একে ইসলামী শিক্ষামালার আওতায় এভাবে পরিচালনা করবেন যে, সরকার পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির সংগঠনে ইউরোপের ওপর ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব যেন পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে এবং এর দ্বারা সে সব অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংকটের যেন সমাধান ঘটে যা সমাধান করতে না পেরে ইউরোপ হাল ছেড়ে দিয়ে তার ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছে।

এ আধ্যাত্মিক, শিল্প-প্রযুক্তিগত, সামরিক প্রস্তুতি ও শিক্ষার স্বাধীনতার সাথেই মুসলিম বিশ্বের উত্থান ঘটতে পারে, নিজেদের পয়গাম পৌছাতে পারে এবং পৃথিবীকে সে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে, মুক্তি দিতে পারে যা তার মাথার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। নেতৃত্ব হাসি ও খেল-তামাশার বস্তু নয়। এ খুবই গুরু-গম্ভীর বিষয়। এর জন্য প্রয়োজন সুশৃঙ্খল চেষ্টা-সাধনা, পরিপূর্ণ প্রস্তুতি, বিরাট কুরবানী এবং কঠোর কঠিন ও প্রাণান্তকর সাধনা।

৭.২১ দাওয়াতি কার্যক্রমের প্রসার

ইসলামি জীবন ব্যবস্থা একটি সাময়িক জীবন ব্যবস্থা নয়। ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ের জন্য তা অবতীর্ণ হয়নি। কোন একটি সংকীর্ণ পরিবেশের জন্যও তা প্রেরিত হয়নি। কোন বিশেষ পরিবেশ বা জাতির জন্যও তা নির্দিষ্ট হয়নি। প্রকৃত পক্ষে এটি হচ্ছে গতিশীল মানবজীবনের জন্য একটা মৌলিক বিধান। মানব সভ্যতার সর্বশেষ অধ্যায় পর্যন্ত মানুষ তাঁর জীবনকে যাতে অবতীর্ণ বিধানের আলোকে পরিচালিত করতে পারে এমনই এক বৈশিষ্ট্য দিয়ে ইসলামকে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই ইসলামি আন্দোলনের জন্য আজ এটা বড় কাজ যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গোটা মানবজাতির সামনে ইসলামের সার্বজনীন দাওয়াত তুলে ধরতে হবে। মানব জাতির সামনে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। ইসলাম যে সত্যের ধর্ম তা সবার মাঝে প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক মুসলিমকে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবীরা দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামের বাণীকে পৃথিবীর জনসাধারণের মাঝে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছেন এবং সাধারণ জনগণ এ আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

৭.২২ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করা ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার

বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজন ইসলামের সত্যিকার রূপকে মানবজাতির সামনে প্রস্ফুটিত করা। ইসলাম এবং ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা খেলাফতই যে মুক্তি, কল্যাণ ও অগ্রগতির প্রকৃত পথ

তা বলিষ্ঠভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। কাজ ও বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ইসলামি আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে।

পাশাপাশি চরমপন্থীরা ধর্মীয়ও বিষয়ে অজ্ঞ কিংবা স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী। তদুপরি তাদের জ্ঞান অনুযায়ী দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে তারা অপ্রয়োজনীয় ব্যখ্যা উপস্থাপন করে সাধারণ জনগণের মাঝে তারা ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। যার কারণে সাধারণ জনগণ তাদের কথায় ভুল পথে ধাবিত হয়। সুতরাং, তাঁদের মোকাবেলায় শরয়ী ও ধর্মীয় জ্ঞান ও শিক্ষার ব্যাপক প্রসার আবশ্যক। পাশাপাশি পৃথিবীর সকল মানুষের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য উপস্থাপন করার জন্য কিছু লোককে এগিয়ে আসতে হবে।

৭.২৩ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

মুসলিম বিশ্বকে সকল ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে দ্রুত বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। পশ্চিমা ঋণদাতা দেশ সমূহ এবং বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর শর্তাধীন ঋণ গ্রহণের ফাদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ জন্য মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ করা একান্ত জরুরী। তেল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর উচিত হবে ক্রমান্বয়ে তাঁদের ব্যাংক আমানত পশ্চিমা দেশ গুলো থেকে স্থানান্তর করা। পশ্চিমা এনজিও সমূহ মুসলিম দরিদ্র দেশগুলোতে যে অবাধ বিচরণ করছে তাঁর মোকাবেলায় মুসলিম দেশগুলোর সাহায্য ও সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম বিশ্বকে বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, আমেরিকা নিজেই এখন বিশ্বের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশ। আমেরিকার বর্তমান বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৩০০ বিলিয়ন[২৭৮] ডলার। তাঁর ঘাটতি অর্থনীতিতে শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনা তত সহজ নয়।

৭.২৪ সমাজ ও রাষ্ট্রে ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠা

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ওলামায়ে কেরাম আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। তাদের এ অনুপস্থিতিই চরমপন্থা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। কেননা আলেমগণ তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন না করায় দেশের শাসক হয় স্বৈরাচারী, জনগণের কল্যাণের কোন ইচ্ছা তাদের নিকট প্রাধান্য পায় না, নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কেবল দুনিয়াবি সুযোগ সুবিধা অনুসন্ধান করে, তাদের উদাসীনতায় যুব সমাজ ধ্বংস হয়, জাতি ধাবিত হয় অবক্ষয়ের দিকে। কিন্তু আলেমগণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলে তারা দেশের শাসককে উপদেশ দান করতে পারেন, যুবকদেরকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে ফিরিয়ে

---

২৭৮. *আত তারীখুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

এনে কল্যাণ ও আদর্শের পথে পরিচালনা করতে পারেন। তারা সামাজিক বিপথগামিতা, চরমপন্থাসহ বিভিন্ন সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারেন।

৭.২৫ ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা

ইসলামি সরকার কায়েম করা ছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তাঁর সুফল মানবজাতি পেতে পারে না। কারণ বর্তমানে রাষ্ট্র শক্তিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামি সরকার গঠনের জন্য বিশেষ করে মুসলিম দেশের ইসলামি আন্দোলন সমূহকে রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ইসলামি সরকার গঠন এখন অনেক দেশে সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা না হওয়ায় কিছু দেশে চরমপন্থার উদ্ভব ঘটেছে। এজন্য মুসলিম শাসকদের ওপর ওয়াজিব হল আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ পরিচালনা করা। আর এক্ষেত্রে অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সবই পরিচালিত হতে হবে শরীয়তের আলোকে। শরিয়ত পরিপন্থী বিষয়গুলোকে সুকৌশলে পরিহার করতে হবে।

৭.২৬ চরমপন্থীদের সাথে সংলাপ ও বাস্তবতার বিশ্লেষণ

আলোচনা পর্যালোচনা ও যুক্তিপূর্ণ বিতর্কের মাধ্যমে মানুষকে ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথে আনা যায়। নবী করীম (সা.) তার যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেছিলেন। সাহাবীগণের যুগেও চরমপন্থীদের সাথে আলোচনার এ ধারা অব্যাহত ছিল। যেমন হযরত আলী (রা.) প্রথমে খারিজীদের সাথে আলোচনা করেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)ও তাদের সাথে আলোচনা করেছিলেন, যার ফলে তখন প্রায় ২০০০ লোক পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে। আর এ ধরনের আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে চরমপন্থা দমন করা যায়।

মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয় সম্পর্কে অনেক মানুষ অজ্ঞাত থাকে। অনেক লেখক, বিদ্ধান ও রাজনীতিক চরমপন্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে বিভিন্ন চরমপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। এমনকি ধর্ম-কর্ম পালনকেও অনেকে চরমপন্থা বলে আখ্যায়িত করে। এজন্য চরমপন্থার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে সকলের নিকট তা সুস্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন। যাতে করে তার মন্দ দিক সম্পর্কে সবাই সম্যক অবহিত হতে পারে। সাথে সাথে তা থেকে বিরত থাকার জন্যও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। কেননা বাস্তব অবস্থা না জানার কারণে অনেক মানুষ এটাকে ভালো মনে করে তার সাথে জড়িয়ে পড়ে। গোঁড়ামি ও চরমপন্থা উদ্ভবের কারণ কিছু জায়গায় যেহেতু বুদ্ধিভিত্তিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও

রাজনৈতিক, সেহেতু তা প্রতিকারের জন্যও ঐ সবগুলো দিকগুলো বিবেচনা করে ইসলামের আলোকে তার সমাধান করতে হবে।

৭.২৭ প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ

মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক ভূমিকা পালনের ও জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্যে বুদ্ধিমত্তার অনিবার্য প্রয়োজন। আর এ বুদ্ধিমত্তা হতে হবে সুষ্ঠ ও সঠিক চিন্তাপ্রসূত। ইসলামে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে এই যে, মানুষের দৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে নিবদ্ধ হয়ে থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ওপর। মানুষ যেন এমন কোন আচরণ না করে যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চিন্তা থেকে গাফেল ও বিমুখ করে রাখে এবং যা তার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বার বার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

অর্থাৎ, "হজ্বে কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্বের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েয নয়। না অশোভন কোন কাজ করা, না ঝাগড়া-বিবাদ করা হজ্বের সে সময় জায়েয নয়। আর তোমরা যা কিছু সৎকাজ কর, আল্লাহ তো জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়।"[২৭৯]

ভয় তাঁকে এজন্য কর যাতে তিনি অসন্তুষ্ট না হন। তিনি যেন কখনও অসন্তুষ্ট না হন–একথাটি হরহামেশা মনে রাখা এবং আপন আচরণ দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট রাখাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে।"[২৮০] বুদ্ধিবিবেকহ আসমান ও যমীনের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে যখন কেউ সঠিক চিন্তাভাবনা করে এবং সে সাথে যার মনে খোদার ইয়াদ জাগ্রত থাকে, সৃষ্টিজগতের নিদর্শনাবলী জন্তু-জানোয়ারের মত দেখে না বরঞ্চ চিন্তা-গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ

২৭৯. আল-কুর'আন, ২ : ১৯৭
২৮০. আল-কুর'আন, ৩ : ১৯০

করে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করে যে, এ গোটা সৃষ্টিরাজ্য একটা বিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অধীন।

প্রতিটি কাজের জন্যে আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার নিকটে জবাবদিহি করতে হবে, এ তীব্র অনুভূতি মনে সদা জাগ্রত থাকলে আল্লাহর অসন্তুষ্টিভাজন কাজ ও আচরণ থেকে বাঁচা যায়। এটাকেই বুদ্ধিমত্তা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বুদ্ধিমত্তার পরিপূর্ণ ধারণাই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। মৃত্যুর পরের জীবনের জন্যে কাজ করার অর্থ হলো, দ্বীন ও ঈমানের দাবী যদি এই হয় যে, দুনিয়ার নগদ প্রাপ্য-স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখান করতে হবে তাহলে এ দাবী অবশ্যই পূরণ করতে হবে এবং খোদার সন্তুষ্টি জান-মাল ও আরাম আয়েশ কুরবানী করার দাবী করলে তা দ্বিধাহীন চিত্তেই করতে হবে। প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য সকলের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক মুসলিমকে প্রকৃত বুদ্ধিমান হতে হবে কারণ প্রকৃত বুদ্ধির প্রয়োগ ছাড়া ইসলামের পথে মানুষকে আহ্বান করা কঠিন হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে কারীমের মধ্যে হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থাৎ, "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।"[২৮১]

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমকে বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ইসলামের পথে সাধারণ মানুষকে আহ্বান করার ইচ্ছা ও অভিলাষ থাকতে হবে।

৭.২৮ নিজস্ব তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা ও বিশুদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের প্রচার ও প্রসার

মুসলিমগণের নিজেদের তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। নিজেদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে নিজেদেরকে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। তাই শত্রুদের সার্বিক পরিস্থিতি মুসলিমগণের জানা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্ব মিডিয়ার দিক থেকে অত্যন্ত পিছিয়ে রয়েছে। তাই এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। মুসলিম বিশ্বের নিজস্ব শক্তিশালী ও মান সম্পন্ন মিডিয়া নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। যদি মুসলিমগণ এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে তাহলে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন থেকে ঈমানও আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না।

---

২৮১. আল-কুর'আন, ১৬ : ১২৫

পাশাপাশি চরমপন্থীরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব বহির্ভূত এবং শরীয়তের আক্বীদার বিপরীতে ভিন্ন আক্বীদা পোষণ করে। আর তারা তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা সমাজে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট। এজন্য তাদের মোকাবেলায় বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রসার ও প্রচার জরুরী। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ মসজিদ ও মক্তবে বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য তালিকায় এ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। এছাড়া চরমপন্থার হিংস্র ছোবল থেকে সমাজ, দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য আলেমগণকে সমাজের মানুষের আক্বীদা সংশোধনের লক্ষ্যে যথাযথ দাওয়াতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

৭.২৯ ও.আই.সি.কে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদান ও আধুনিক অস্ত্র তৈরীর সামর্থ্য অর্জন

ওআইসিকে কার্যকর ও শক্তিশালি করা এবং উদ্যোগী ভূমিকা পালনের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। যে প্রত্যাশা নিয়ে ওআইসি গঠিত হয়েছিল তা পূরণ হয়নি। যেহেতু পাশ্চাত্য তাঁর স্বার্থের বিনিময়ে কোন মুসলিম দেশ বা শাসককেই আনুকূল্য প্রদর্শন করবে না। তাই শুধু ওআইসি নয়; বরং ওআইসির অধীন বিভিন্ন সংস্থাগুলোকে কার্যকর ও শক্তিশালি করে গড়ে তোলা আজকের বিশ্ব মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য।

পাশাপাশি মুসলিম বিশ্ব অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হতে পারলেই ভারসাম্য সৃষ্টি সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত হবে। তাই মুসলিম বিশ্বকে অবশ্যই সামরিক শক্তি অর্জন করতে হবে। তবে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট থেকে অস্ত্র কিনে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র তৈরিতে মুসলিম বিশ্বকে সামর্থ্য অর্জন করা দরকার। মুসলিম বিশ্বের দুশমনদের হাতে পারমানবিক অস্ত্র থাকবে, আর মুসলমি বিশ্ব অসহায়ের মত অন্যের করুণার ওপর নির্ভর করবে এটা দীর্ঘদিন বিশেষ করে বর্তমান সময়ে এভাবে চলতে দেয়া যায় না। তাই পারমানবিক শক্তি অর্জন করার জন্য মুসলিম দেশসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৭.৩০ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ও সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদ বিরোধী জনমত সৃষ্টি

মুসলিম দেশগুলোতে অস্থিতিশীলতা উন্নয়নের পথে বিরাট বাধা। উন্নয়নের শর্ত স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা। মুসলিম দেশসমূহের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাশ্চাত্যই এখন গণতন্ত্রকে ভয় করছে। মুসলিমগণের জন্য গনতন্ত্র নির্বাচনের প্রক্রিয়া হিসেবে ভয়ের কোন কারণ নেই; বরং গণতন্ত্রের ফসল ইসলামি বিপ্লবের জন্যই সহায়ক হবে।

পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলিমগণের আরও বেশি সচেতন হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদ যে মুসলিম বিশ্বের জন্য বিপদ সে কথা প্রত্যেককে অনুধাবন করানো প্রয়োজন।

৭.৩১ গোটা জীবনে ইসলামের অনুসরণ

ইসলাম দুনিয়াকে এ কথা স্মরণ করে দিয়েছে যে, বিশ্ব স্রষ্টা মানুষকে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নি। বরঞ্চ তার দাসত্ব আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাকে ইসলামের পরিভাষায় ইবাদত-বন্দেগী বলে। এ বন্দেগীর অর্থ গোটা জীবনকে আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত ও মর্জি অনুসারে পরিচালিত করা। এ বন্দেগী শুধু এমন নয় যে, ইবাদতখানায় আল্লাহর কিছু পূজা-অর্চনা এবং সে সাথে কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হবে, তার সমগ্র জীবন যেমন খুশি তেমনভাবে কাটিয়ে দেয়া হবে। এ আংশিক বন্দেগী আল্লাহ তা'আলার সার্বিক ও নিরঙ্কুশ আনুগত্যের অধিকারী হওয়ার মর্ম কথার সাথে সঙ্গতিশীল নয়। আর না এটা তার নাযিল করা দ্বীন ও হেদায়াতনামার সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম যখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খোদা পরস্তির বাস্তব প্রতিফলন দাবী করলো এবং মানুষের সকল চিন্তা-চেতনা ও কর্মের ওপর সত্য ও সততার বন্ধন আরোপ করতে লাগলো তখন জাহিলিয়াতের ধারক-বাহকগণ বিস্ময় প্রকাশ করে বিদ্রূপবান ছুড়তে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিপ্লবী ঘোষণা এ ছিল যে, ইসলাম মানব জাতির জন্য এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও মুহূর্তে নিজেদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন করে দিতে হবে। সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতি গড়ে উঠবে মানুষের স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ তা'আলার নিরঙ্কুশ আনুগত্যের অধীনে। জাহিলিয়াতের অন্ধ পূজারীগণ এ কথা মেনে নিতে পারেনি। ইবলিশ শয়তানেরও এটা মনঃপূত হতে পারে না। কারণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সে মানুষের আনুগত্য লাভের প্রত্যাশী। যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য অস্বীকার করা হবে, সেসব ক্ষেত্রে শয়তানের আনুগত্য ব্যতীত উপায় থাকবে না। অথবা আল্লাহর স্থলে অন্য কারো আনুগত্য করতে হবে। আর গায়রুল্লাহর আনুগত্যকে সবচেয়ে বড় পাপ (শিরক) বলা হয়েছে। জাহিলিয়াত মানুষকে শিরক থেকে বেঁচে থাকতে দেয় না। এ কারণে প্রত্যেক মুসলিমকে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন ধারণ করে ইসলামের সুশীল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

৭.৩২ অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া

পাশ্চাত্য শাসনের অধীন থেকে মুক্ত হওয়ার অনেক উপায়ের মধ্যে একটি হলো অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া। বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল না হওয়া। আজকের

দিনে আমেরিকান এ শাসন থেকে বাঁচার একটি উপায় হলো কোনো দেশকে বিদেশী সাহায্য থেকে মুক্ত হওয়া। যারা অর্থনীতি সম্পর্কে কমবেশি ধারণা রাখেন তাঁরাও জানেন মুসলিমদের দেশগুলোতে অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তার দিক হলো বিদেশি সাহায্য। যদি কোন দেশ বিদেশি সাহায্য থেকে মুক্ত হতে পারে তাহলে তারা পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকেও মুক্তি পেতে পারে। সুতরাং মুসলিম বিশ্বকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে হবে এবং পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

৭.৩৩ ইসলামি চিন্তাবিদ, প্রশাসক ও নাগরিকদের মধ্যকার দূরত্ব প্রশমন

দেশের বিভিন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ ও শাসকদের মাঝে দূরত্ব রয়েছে। সেরূপ নাগরিকরাও শাসকবর্গ থেকে দূরে অবস্থান করছে। তারা অনেক ক্ষেত্রে শাসকগণের নিকট যাওয়ারও সুযোগ পায় না। বিভিন্ন সমস্যায় নেতৃবৃন্দ, দেশের আলেমগণের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন অনুভব করে না এবং ওলামায়ে কেরামও শরীয়ত সিদ্ধ কোন সুপরামর্শ দেয়ার সুযোগ পান না। তেমনি জনগণ তাদের সুযোগ সুবিধা চাওয়া পাওয়া ও সমস্যাবলি সম্পর্কে শাসকদের সাথে মতবিনিময়ের সুযোগ পায় না। এ সকল দূরত্ব দূরীভূত করা গেলে সকলের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি হবে, পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব সৃষ্টি হবে। ফলে সকল সমস্যা সহজেই সমাধান করা সম্ভব হবে।

৭.৩৪ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধ্বংস ও বিলুপ্তি এবং স্বকীয় সংস্কৃতির বিকাশ

পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসের মুখে পড়েছে। কারণ, তা একটি ডানায় ভর করে উড়তে চেয়েছে। সেটি হলো বস্তুগত ডানা। মানুষের স্বভাব-চরিত্র থেকে সে অন্ধ সেজেছে। তাই সে এক পায়ে দাঁড়াতে পারে নি। ম্যাকনিল বলেন, "পাশ্চাত্য সভ্যতা তাঁর জীবনের মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এটাকে কেবল বন্য পশুর যা-কিছু নৈতিক তার সবকিছু ধ্বংস করে হিংস্রতা ও দুর্বৃত্তির চূড়ান্ত সীমায় পৌছে যাওয়ার সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। যে পশুর আক্রমণ-অত্যাচার, পূর্ববর্তীদের উত্তরাধিকার এবং মহান ও পবিত্র সবকিছুর ওপর, চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে। সে তার থাবা বিস্তার করে সভ্যতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, অন্ত্র-আঁতড়ি ছিঁড়ে বের করে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে, দুই চোয়ালের মাঝে রেখে তীব্র ক্রোধ ও ক্রূর হিংস্রতায় চিবিয়ে ফেলেছে।"[২৮২] পশ্চিমা সমাজে আত্মাশূন্যতা, জীবনরিক্ততা, মানুষের সামনে বড় কোনো লক্ষ্যের অস্তিত্বহীনতা, সে ইলাহকে অস্বীকার করা, সঙ্কট ও দুঃখকালে যার কাছে সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়, এ সবকিছু পশ্চিমা বিশ্বকে ঠেলে দিয়েছে দুর্ভাগ্য লাঞ্ছিত পরিণাম এবং হাহাকারপূর্ণ ও দুদৈরব বিড়ম্বিত অন্তিমতায়। দুর্দশা, বিচূর্ণ অভ্যন্তরে স্নায়বিক উত্তেজনা, আতঙ্ক, যুদ্ধের চিন্তা-হন্তারক বিভীষিকা-প্রেত হয়ে উঠেছে

২৮২. *আগামী দিনের পৃথিবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

তাঁদের ভাগ্যলিপি। এটা তো আসলে জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে এলকোহল তারপর মাদকে আশ্রয় নেয়া। সবশেষে এ নৈরাশ্যপূর্ণ সর্বস্বান্ত জীবনের পরিণতি দাঁড়িয়েছে আত্মহত্যা। অসহায় আত্মহত্যা তো আত্মিক যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পারার প্রকাশ্য ঘোষণা। জীবনের কাছে পরাজয় শিকার করে আত্মহত্যারই পথ বেছে নিয়েছিলেন জ্যাকব ম্যারিনো, আরনেশট হেমিংওয়ে, নিটশে এবং আরো অনেকে।[২৮৩]

বস্তুবাদী বিশ্বে মানুষের ভয়াবহ উৎপাদন তাঁকে যে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে, এ থেকে বাঁচতে হলে স্রষ্টার বিধি-বিধানের প্রয়োজন। পশ্চিমাদের হাতে চর্চিত ভয়ঙ্কর শক্তি-প্রতিযোগিতার শান্তি-রোধনী প্রয়োজন। এ শান্তি-রোধনী হতে পারে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, আখেরাতের হিসাবের প্রতি ভীতি এবং আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ। আত্মিক ধনী তিনিই, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসই যার প্রয়োজন মেটায়; যিনি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করেন।

এম. এ সাঈদ বলেন, "পশ্চিমা পর্ণগ্রাফিক জীবন বিমুখ সাহিত্য শিল্পের মোকাবেলায় আজ মুসলিমদের স্বকিয়তাভিত্তিক সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান যুগে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি আদর্শ প্রসারের অত্যন্ত বড় হাতিয়ার। তাই মুসলিম বিশেব্ এ হাতিয়ারটি কাজে লাগাতে হবে। সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির ময়দানে অগ্রসর হতে না পারলে নিজেদের স্বকিয়তার সাবলিল বিকাশ অসম্ভব। তাই এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।"[২৮৪]

৭.৩৫ মুসলিম উম্মাহর সংকট উত্তরণে আরো কিছু পদক্ষেপ

মুসলিম উম্মাহর সংকট উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে সামীম মোহাম্মদ আফজাল বলেন,

১. ইসলামের সুমহান সৌন্দর্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী যথাযথভাবে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। ইসলাম যে সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে, সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই তা তুলে ধরতে হবে।

২. মদীনা সনদের শিক্ষার আলোকে সহাবস্থানের ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে।

৩. হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়কালে মহানবী (স.) পরমত সহিষ্ণুতার যে অসামান্য আদর্শ মানবজাতির সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে গেছেন তা যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে।

---

২৮৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪
২৮৪. *আত তারীখুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

৪. মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত ও সংঘর্ষের অবসানকল্পে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে

৫. ইসলামের নামে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তারা কাদের প্ররোচনায় কাজ করছে এবং কাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে, মুসলিম যুবসমাজের কাছে তা যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে।

৬. মুসলিম উম্মাহর সম্ভাবনাময় যুব সমাজের যথোপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. যুদ্ধ ও সংঘাতের মাধ্যেম কারা লাভবান হচ্ছে এবং এর পরিণতিতে মুসলিম উম্মাহর কি ক্ষতি হচ্ছে তা যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে।[২৮৫]

৭.৩৬. মুসলিম তরুণদের প্রতি উপদেশ

ড. ইউসূফ আল কারজাভী মুসলিম উম্মাহর সংকট উত্তরণে মুসলিম তরুণদের প্রতি কিছু উপদেশ"[২৮৬] ব্যক্ত করেছেন,

প্রথমত: মুসলিম সমাজ পূর্ব ও পশ্চিমের কাছ থেকে ধার করা মতবাদ দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতিসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এখন মুসলিম বিশ্ব ইসলামের অনিবার্য সমাধানে বিশ্বাস করে অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহর বাস্তবায়ন চায়। অতএব এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, মুসলিম তরুণদের সাহস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয়ত: মুসলিম তরুণদের মধ্যে যে গোঁড়ামি রয়েছে তা হিংসা ও হুমকি দিয়ে পরিশুদ্ধ করা যাবে না। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি এদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় মুসলিমগণের কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে তাদের সাথে মেলামেশা করে তাদের মন-মানসিকতা উপলব্ধি করা এবং বুদ্ধিভিত্তিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে উদ্যোগী হওয়া।

---

২৮৫. *মুসলিম উম্মাহর সংকট : উত্তরণের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২৮৬. *ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আজকের মুসলিম জাতি প্রকাশ্যেই তাদের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তারা মুনাফিকীর জীবন বেছে নিয়েছে। তারা সত্যিকার মুসলিমদের সাথেও নয়, আবার পুরাপুরি ইসলামের শত্রুদের সাথেও নয়, বরং এর মাঝামাঝি একটা পথ বাছাই করেছে, যার চিন্তা-চেতনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য একেবারে অস্পষ্ট। তারা আজ দ্বীন ইসলামকে পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেও কোন অগ্রগতি বা সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিণতিতে শুধু পিছিয়ে পড়েছে। এটাই হল প্রকৃত বিপর্যয়। যে ব্যক্তি নিজের আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছে, হোক তা সামাজিক আবহাওয়ার প্রতিকূল, তার আদর্শের পতাকা শত প্রতিবন্ধকতায়ও সমুন্নত রেখেছে। সেই পারে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কুরবানী করতে, ত্যাগ স্বীকার করতে। আর যে ব্যক্তি নিজের আদর্শে অটল নয়, সামাজিক আবহাওয়ায় যার আদর্শ বারবার বদলে যায় সে কিছুই করতে পারে না। পারে শুধু নিজের সাথে প্রতারণা করতে। এটাও মানসিক বিপর্যয়।

কিন্তু, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহর সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ থাকা অনিবার্য-ফরয করে দিয়েছেন। তাছাড়া কোনো জাতির অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষার জন্যে সংগঠন ও সংঘবদ্ধতার বিকল্প নেই। জামাতবদ্ধতা স্বয়ং এক বিরাট শক্তি। কোনো সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ জাতিকে সহজে কেউ পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। একতা, সংঘবদ্ধতা, ত্যাগ ও সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যমেই কোনো জাতি হতে পারে বিজয়ী, লাভ করতে পারে সম্মান, সাফল্য ও উন্নতি। যে কোনো শত্রু এমন জাতিকে সমীহ করে চলতে বাধ্য। এমন জাতিকে পর্যদুস্ত করা সহজ কথা নয়। এমনকি তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করারও কেউ থাকে না। এমতাবস্থায়, মুসলিম জাতিকে সহীহ ঈমানের তারবিয়্যাত ও প্রশিক্ষণ নিতে হবে। কারণ বিপর্যয় উত্তরণের এ দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার প্রথম পদক্ষেপই হলো বিশুদ্ধ ঈমানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ। কাজেই আবাল-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ তথা সর্বস্তরের মুসলিমদের খালেস দ্বীনের পূর্ণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ঈমানের এমন স্তরে পৌঁছতে হবে, যে স্তরে পৌঁছে তারা আল্লাহ ছাড়া অপর কোন শক্তিকে ভয় করবে না। ঈমান কোন বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গির নাম নয়, যা কেবল চিন্তার জগতে সীমাবদ্ধ থাকে। এজন্য বিশুদ্ধ ঈমান আক্বীদাকে প্রকৃত অর্থে অন্তরে স্থাপন করতে হবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তার বাস্তবায়ন ও প্রতিফলন ঘটাতে হবে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এক শ্রেণীর লোকের কাছে ঈমান শুদ্ধকরণ ও তা কর্মজীবনে বাস্তবায়নের কোন গুরুত্ব নেই। অধিকন্তু সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, কমুনিজমসহ সকল ইসলাম-বিরোধী অপশক্তি ও ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে সহীহ আক্বীদা বিশ্বাসই পারে কথা বলার শক্তি ও সাহস যোগাতে, চিন্তা ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে এবং সর্ব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র ফুটিয়ে তুলতে। মুসলিমগণ যখন সঠিক আক্বীদা শিক্ষা লাভ করবে তখন বস্তুর শুভাশুভের ধারণাকে ভিত্তিহীন

Dhaka University Institutional Repository

বলে জ্ঞান করবে। তারা আরও বুঝবে যে, এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে জাহেলী যুগের মানুষদের কতই না বিপর্যস্ত জীবন যাপন করতে হয়েছে, তখন মুসলিমগণ শুভাশুভের এ অমূলক ধারণাকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে। বস্তুতঃ এতদ্বিষয়ে যখন মুসলিমগণের বোধ ও বিশ্বাস বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তাঁরা বাস্তবিকভাবেই প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী হবে এবং তাঁদের জীবনে এক ক্রিয়াশীল নব অধ্যায়ের সূচনা হবে।

পাশাপাশি, জাতির মেরুদন্ড যুব সমাজকে উন্নত চরিত্র, উচ্চাকাঙ্খা ও বীরত্বের দীক্ষা দিতে হবে। গাফলতীর ঘুম ভেঙ্গে যুবকদেরকে ইসলামী পুনর্জাগরণের সব চেতনায় উজ্জীবিত করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীদেরকে উচুঁ মনোবল ও বীরত্বের শিক্ষা দিতেন। সে সঙ্গে যে সকল কাজের দ্বারা হীনমন্যতা দূরিভূত হয়ে মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায়, সে সব কাজে তিনি উৎসাহ প্রদান করতেন। সুতরাং, মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি হবে 'হাবলুল্লাহ বা আল্লাহর রশি'। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব আল কুর'আন ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (স.) কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এ দু'টির পূর্ণ অনুসরণ তাদেরকে করতে হবে। সবাই ভাই ভাই হিসেবে একযোগে দীনের এ ভিত্তিদ্বয়ের আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। সবাই পরস্পরকে এ দুই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সহযোগিতা করবে। কোনো জাতির কাছে যদি শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ ও নিখুঁত জীবন-ব্যবস্থা বর্তমান থাকে এবং সে জীবন-ব্যবস্থা যদি প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যেই অস্তিত্ব লাভ করে থাকে, তবে সে জাতির জন্যে সংগঠন ও সংঘবদ্ধতার গুরুত্ব আরো অনেক অনেক বেশি। সংগঠিত হওয়া ছাড়া সাধন করা যেতে পারে না কোনো বিপ্লবই। সংঘবদ্ধতা ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে না। ঐক্যের পথে এগিয়ে যাওয়া হবে মুসলিম বিশ্বের শান্তি, অগ্রগতির প্রধান হাতিয়ার।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দু'টি কারণে মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি হলো ধর্মজ্ঞানের অভাব, অপরটি অনৈক্য। অনৈক্য শুধু তাদের জাগতিক দুর্দশার জন্য দায়ী নয়, ধর্মীয় অধঃপতনেরও কারণ। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, বর্তমানের তথাকথিত এই মুসলিমরা একথা বুঝতে অক্ষম যে পৃথিবীতে তারা যে কত অবহেলিত ও অপমানিত। তারা যে নিজেদের লোক দ্বারা চরমভাবে শোষিত ও প্রতারিত এ বোধশক্তিও তাদের নেই। জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে মুসলিমরা এখন চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মুসলিমদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাদের সার্বিক অধঃপতনের মূল কারণ ধর্ম বিসর্জন, অন্যান্য কারণ আনুষঙ্গিক। এই অবস্থায় এখনও মুসলিম বিশ্ব যদি ধর্মকে আঁকড়ে না ধরে তাহলে সংখ্যায় মুসলিমগণ প্রতিদিন বাড়তে থাকলেও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এদের অধঃপতন কেউ ঠেকাতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্য ছাড়া কোনজাতি কোন ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে-মানব ইতিহাসে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই। সুতরাং এ অবস্থায় মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঈমানের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি মুসলিম দেশ সমূহে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন, জাতিগত সুবিধাবোধ ত্যাগ, অনৈসলামিক চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, অর্থপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ, চেতনা বোধের প্রশিক্ষণ, শিল্প প্রযুক্তি ও সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রচার-প্রসার নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে মুসলিম জাতি আবারো তাদের হারানো দিন ফিরে পাবে। পৃথিবীতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে পারবে। বিশ্বের প্রতিটি মানুষ কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে তাদের জীবন পরিচালনা করে এক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত নিশ্চিত করতে পারবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. Reuven Firestone Jihād, *The Origin of Holy War in Islam* (New York: Oxford University Press, 1999)

২. ড. ইব্রাহিম মাদকুর, *আল মুজামুল ওয়াসীত* (ঢাকা: আল মাকতাবা আল ইসলামিয়া, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৩)

৩. ড. মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ, *The First Written Constitution in the world* (লাহোর: আশরাফ পাবলিকেশন্স, ১৯৭৫)

৪. আবদুল রশিদ মতিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৫),

৫. Abdul Hameed Siddiqu, *The Life of Muhammad: Arabia Before Islam* (Sale's Translation: 1896)

৬. Alfred J. Butler, *Arabs' conquest of Egypt and last thirty years of the Roman Dominion* (Egypt: E World Inc, 1992)

৭. Justin Bieber, *Britannica Online for Kids* (http:kids.britannica.com/eb/art-151049, 6 Aug. 2016)

৮. Edward Gibbon, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire* (London: W. Strahan and T. Cadel, 3rd edition 1776)

৯. The Life of Muhammad, *Arabia Before Islam (Sale's Translation)*

১০. J.M. Roberts, *History of the World* (The United States: The Amazon Book Review, Vol. vii. 1907)

১১. Robert Brifoult, *The Making of Humanity* (New York: The Modern Library, 1931)

১২. Alfred J. Butler, *The Arabs' Conquest of Egypt and the last thirty years of the Roman Dominion* (New York: Oxford University press, Second Edition. 1978)

১৩. J.M. Roberts, *History of the World* (The United States: The Amazon Book Review, Vol. vii. 1907)

১৪. আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী, *তাফসীরে তাবারী শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩)

১৫. Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India* (Delhi: Oxford University Press, 2003)

১৬. Tor Andrae, Mohammed: *The man and his faith*, 1936, translated by Theophil Menzel, 1960

১৭. ইবনে সায়্যিদা, *কিতাবুল মুখাসসাস আল-খুমুর* (বৈরত: দারু ইয়াহিয়াতুরাছুল আরাবী, ১৪ তম সংস্করণ, ২০১০)

১৮. হিজর ইবনে খালিদ, *দিওয়ান আল-হামাসা* (বৈরত: দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ, ১৯৯৮)

১৯. শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (র.), *আগামী দিনের পৃথিবী* (ঢাকা: মাকতাবাতুল ইসলাম, ২০১৬)

২০. Robert Brifault, *The making of Humanity* (London: G.Allen & Unwin ltd, 2001)

২১. Philip Khuri Hitti, *History of the Arabs* (London: Palgrave Macmillan, Revised: 10th Edition 2002)

২২. হাফেয ইমামুদ্দীন ইবনে কাসীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ* (দামেস্ক: দারু আলিমিল কুতুব, ১৯৯৬)

২৩. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *আস-সহীহ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৩)

২৪. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৫)

২৫. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *আস-সহীহ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪)

২৬. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আসইয়াশ আস সিজিস্তানী, *আস-সুনান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৫)

২৭. মুহাম্মদ আসাদ, Islam at the crossroads, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১)

২৮. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো? (ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০১২)

২৯. স্যার টমাস আর্নল্ড, *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭)

৩০. ফিলিপ কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস* (কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯)

৩১. মোহাম্মদ আবূ তাহের বর্ধমানী, *অধঃপতনের অতল তলে* (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন, ২০১৬)

৩২. নূরূল হোসেন খন্দকার, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩)

৩৩. মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, ৯ম-১০ম শ্রেণী* (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৩)

৩৪. Abdul HameedSiddiqui, *The Islamic concept of History* (Kualalampur: Islamic Book Trust, 1981)

৩৫. ড. ইউসুফ আল কারজাভী, *ইসলামী পুনর্জাগরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০১৪)

৩৬. ডঃ মরিস বুকাইলি, রূপান্তর: আখতার উল আলম, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান* (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১৯৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, *দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম* (ঢাকা: জ্ঞানবিতরনী প্রকাশনী, ২০১৫)

৩৮. হাশিম বিন আব্দুল হাকিম, *শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের কাছে ঋণী* (ঢাকা: আফরোজা প্রকাশনী, ২০১৫)

৩৯. শাহ আব্দুল হান্নান, *মুসলিম বিশ্ব সমসাময়িক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ* (ঢাকা: বুকমাস্টার প্রকাশনী, ২০১৬)

৪০. Muhammad Qasim Zaman, *Princeton Readings in Islamist Thought* (London: Princeton University Press, 2009)

৪১. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *তারীখে দাওয়াত ও আযীমত* (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৭)

৪২. Stanley Lane-Poole, *Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem* (London: G. P. Putnam's Sons, 1906)

৪৩. ইয়াকুত আল-হামাবী, *মু'জামুল বুলদান* (বৈরুত: দারু সাদির প্রকাশনী, ১৯৫৭)

৪৪. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *মুসলিম উম্মাহর সংকট উত্তরণের উপায়* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৫)

৪৫. Baron Carra de Vaux, *Islamic thinkers* (Paris: G. Beauchesne, 1909)

৪৬. মতিউর রহমান, *মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য* (ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২)

৪৭. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান (ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০১৫)

৪৮. এম এ সাঈদ, *আত তারীখুল ইসলামী ওয়া তারীখু ইলমিল হাদীস* (ঢাকা: আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স, ২০১৪)